মহাভারতচিন্তা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৭২

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : দুলালচন্দ্র ঘোষ
নিউ লোকনাথ প্রেস
৮এ, কাশীবোস লেন কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : অজয় গুপ্ত

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

এই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য গ্রন্থ পাঠেই বোঝা যাবে। কিন্তু, মহাভারতের চরিত্রাদি সম্পর্কে এই লেখকের মূল্যনিরূপণের সঙ্গে অনেকের মতানৈক্য ঘটবার সম্ভাবনা থাকলেও নিরাসক্ত ঐকান্তিক পর্যবেক্ষণের ফলে যা পরিস্ফুট হয়েছে তাকেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বুদ্ধি নামক বৃত্তিটি খুব সহজে সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, কেননা সে বিবেচনা দ্বারা বিচার না করে কোনও সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে না। তাই, এই পুস্তকটি স্তুতিনিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠাবান পাঠক-সমাজের কাছেই বিনয় সহকারে উপস্থিত করা গেল।

গ্রন্থটি অনেক আগেই প্রকাশিত হত; কিন্তু নানা বাধা বিপত্তির ফলে দেরি হয়েছে। নবপত্র প্রকাশনের শ্রীযুক্ত প্রসূন বসু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমস্ত বাধা অপসারিত করে পুস্তকটি প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থটি সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই দুই বন্ধুর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ছাপার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

২।৭এ, বনমালী সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৫
১৯ চৈত্র ১৩৭১

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

(এক)

মহাভারতের আখ্যায়িকা বা উপদেশ, এমনকি উক্তি সম্বন্ধে জনগণের বিশ্বাস দৃঢ় মূল। মহাভারতই ধর্ম, মহাভারত জিজ্ঞাসার অতীত,—এই ধারণাই চিরকাল চলে আসছে। মহাভারতের বর্ণিত বিষয় বা মতবাদসমূহ তর্কের অতীত,—আজন্ম এটাই ভারতবাসীকে বুঝতে শেখানো হয়েছে। মহাভারত বিচিত্র গ্রন্থ, এর কাহিনীসমূহ চিত্তাকর্ষক এবং উপদেশাদি মহৎ। তথাপি মহাভারত ইতিহাস এবং গল্পের সংমিশ্রণ। মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু যে ঐতিহাসিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ সেই সুপ্রাচীন যুগে একটা বিষয়কে নিয়েই আখ্যায়িকা গড়ে উঠত, একেবারে উপন্যাসের আইডিয়া তখন লেখকদের মাথায় আসত না। কিন্তু, ওরিজিনাল বা একেবারে আদিকালের মহাভারত কাহিনীর ওপর প্রচণ্ডভাবে রঙ চড়ানো হয়েছে; বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে এমনভাবে বহু ঘটনা সন্নিবেশ করা হয়েছে যে আদি-মহাভারত বহুলাংশেই পালটে গেছে এবং সেই অনুসারে তার ভ্যালু-ও পালটে গেছে। সম্ভবতঃ এটি বুদ্ধ পরবর্তী-কালেই সংঘটিত হয়েছে, কারণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যধারার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনেকে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মহাভারতে ক্ষয়িষ্ণু যাগযজ্ঞের প্রবর্তনকারী ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং বাসুদেব কৃষ্ণের সমর্থক একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায় মহাভারতে কৃষ্ণের মহিমাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরে, আরও

অনেক কিছু যুক্ত হয়। আজ আমরা যা পাচ্ছি তা এই গড়ে তোলা মহাভারত, যার মূল্য এবং নীতিবোধ প্রাচীনতম আদর্শের অনুবর্তী নয়। মহাভারতের আজকের আখ্যানভাগ আলোচনা করলেই এগুলি পরিস্ফুট হবে। অনেকের মনে এই সমস্যাদির কথা যে না জেগেছে তা নয়, কিন্তু নানা কারণে সামগ্রিকভাবে এই বিষয়গুলি তাঁরা এড়িয়ে গেছেন। এই মূল্যায়ণের যুগে আমাদের কাছে এই মহাগ্রন্থের আনুপূর্বিক বিচার প্রয়োজন ; অন্ততঃ প্রকৃতপক্ষে এর আখ্যানভাগ যথাযথ ইতিহাস হলে কি রকম হত, সেটা পর্যালোচনা করা সমীচীন এবং কর্তব্য বলেই আমাদের অনেকের মনে হবে।

মহাভারত কুরুপাণ্ডবের জীবনের উপাখ্যান। অতএব, খুব গোড়ায় না গিয়ে মহারাজ শান্তনু থেকে আরম্ভ করাই ভালো এবং পাণ্ডবদের হিমাচল প্রয়ানে সমাপ্ত করাই বিধেয়। ইন্দ্রের কাহিনী যেমন ঋগ্বেদের প্রধান বিষয়বস্তু সেইরকম দুর্যোধনাদি কৌরব এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবের ইতিবৃত্তই মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ। অপর সমস্তই এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেছে মাত্র; এগুলি সবই প্রাসঙ্গিক কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

শান্তনু কুরুবংশীয় মহারাজ প্রতীপের পুত্র। এঁদের রাজধানী বহুকাল থেকে হস্তিনাপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতীপ তপোনুষ্ঠানের জন্য গিয়েছিলেন ভাগীরথীর উৎসস্থলে। সেখানে একটি তরুণী তাঁকে কামনা করলেন। এই তরুণীর নাম গঙ্গা। সম্ভবতঃ তিনি গঙ্গা-তীরবর্তী কোনও উপজাতীয় বংশের কন্যা ছিলেন ;—এই কারণেই তাঁর নাম গঙ্গা হয়ে থাকবে। অথবা নদী ব্যতিরেকেও গঙ্গা নাম হতে পারে। তিব্বতী ভাষায় গঙ্গা শব্দের অর্থ সুখকর স্থান। গঙ্গা নামটি আদি তিব্বতী থেকেও এসে থাকতে পারে। যে কোনো কারণেই হোক মহারাজ প্রতীপ সেই কন্যাকে তাঁর পুত্র শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। শান্তনু এই কন্যাকে বিবাহ করে সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু এই নারীটির প্রবৃত্তি গৃহবধূর মত ছিলনা। শান্তনুর কয়েকটি পুত্রই মাতার অনাদরে শৈশবে বিনষ্ট হয়। অবশেষে শেষজাত

পুত্রটিকে শান্তনু নিজের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। এর নাম হল দেবব্রত অথবা মাতৃনামে তাঁর পরিচয় হল গাঙ্গেয়। পুত্রের ব্যাপারে যে বচসা হয়, তাতে গঙ্গা অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যান। দেবব্রত পিতৃগৃহেই শিক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি বসিষ্ঠের কাছে বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন বা জামদগ্ন্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন এসব সত্য হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই ঋষিরা মহাভারতের যুগের বহু পূর্বেই গত হয়েছিলেন। পুরাণকারগণ আখ্যায়িকার গুরুত্ব বাড়াবার উদ্দেশ্যে এইভাবে বহু ব্যক্তিকে কুরুকুলের সমসাময়িক করে তুলেছিলেন, যারা বহু পূর্বেই গত হয়েছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তির উপস্থিতি আমাদের ঐতিহাসিক বিশ্বাসের ওপর মাত্রাতিরিক্ত দাবী করেছে বা আঘাত করেছে বললে অত্যুক্তি হয়না। প্রকৃতপক্ষে কুরুপাণ্ডবের এই পর্যায়ের জীবিতকাল যখন চলমান তার বহুপূর্বেই দেব সভ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে। দেবজাতীয় ব্যক্তিবর্গ বা বৈদিক ঋষি পর্যায়ের ব্রাহ্মণগণ মর্ত্যবাসীদের সঙ্গে এর বহু পূর্বকাল থেকেই মিলে মিশে এক হয়ে গেছেন। অতএব দেবব্রত যথা নিয়মে রাজন্যদের প্রচলিত বিধি অনুসারে অধ্যয়ন ও শস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন।

কুমার দেবব্রত যখন তরুণ তখন একটি ঘটনা ঘটল। পিতা মহারাজ শান্তনু প্রৌঢ় বয়সে আবার প্রেমে পড়লেন। একদা যমুনা নদীর তীরে অরণ্য প্রদেশে একাকী পরিভ্রমণ কালে তিনি একটি লাবণ্যবতী কন্যাকে খেয়া নৌকো বেয়ে লোকদের পারাপার করতে দেখলেন। কন্যাটি কালো হলেও অসাধারণ লাবণ্যময়ী ; নাম সত্যবতী। এঁর কাহিনীও চিত্তাকর্ষক।

উপরিচর বসু নামক এক রাজা হিমাচল প্রদেশ পরিভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। সেখানে শুক্তিমতী নদীতীরে গিরিকা নামে এক পার্বত্যদেশীয়া কন্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। কিন্তু, তাকে নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কিছুকালের মধ্যেই যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলে অদ্রিকা নামে আর একটি ধীবর কন্যার প্রতি আবার আসক্ত হলেন। ফলে, এঁর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

পুত্রটি মৎস্যরাজ নামে পরিচিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ রাজার সন্তান হিসাবে তিনি অন্ততঃ রাজকীয় উপাধিটি অর্জন করেছিলেন। কন্যার নাম হল সত্যবতী (বা মৎস্যগন্ধা অথবা কালী) ; কিন্তু তাঁকে পালন করেন দাসরাজ নামক এক বর্ধিষ্ণু ধীবর। এইভাবে মহারাজ বসু তাঁর দায়িত্বভার লাঘব করেছিলেন।

সত্যবতীর আচরণ বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ ধীবর-শ্রেণীর মতই ছিল। বালিকা বয়সে তাঁর নীতিজ্ঞান যে প্রখর ছিল এমন মনে হয় না। পরাশর নামক এক ব্রাহ্মণকে তিনি কুমারী অবস্থায় দেহদান করেন। এই শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে এটি কোনোকালেই দোষণীয় বলে ধরা হয় না, কেউ কিছু মনেও করেনি। এই মিলনেব ফলে যে সন্তান হয়, তিনিই নাকি ইতিহাসবিশ্রুত বেদ বিভাগকর্তা ব্যাসদেব। পুত্রবতী হওয়া সত্বেও মৎস্যগন্ধা ধীবরকন্যার ন্যায় মৎস্যতরী বহন করতেন।

রাজা শান্তনু এসব জেনেও দাসরাজের কাছে কন্যাটিকে প্রার্থনা করলেন। কিন্তু, দাসরাজ চতুর ব্যক্তি। আত্মজ কন্যা না হলেও তাকে তিনি কন্যার মতই লালন পালন করেছিলেন। তিনি মহারাজ শান্তনুর কাছে এমন একটি প্রস্তাব করলেন যা এক বিষম সমস্যার সৃষ্টি করল। তিনি বললেন,—"আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি যদি এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হবে, আপনার অবর্তমানে সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়।" অর্থাৎ, বাস্তবে সত্যবতীর সন্তান রাজা হলে দাসরাজকে আর দাসরাজ থাকতে হবে না, তাঁর ভাগ্য ফিরে যাবে। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল এইটাই। অবশ্য পালিতকন্যার ভবিষ্যৎও তিনি চিন্তা করেছিলেন। মহারাজ শান্তনু তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তি। এরকম অঙ্গীকার করতে তিনি সহসা সম্মত হলেন না। কিন্তু কিভাবে সমস্যাটীর সমাধান করা যায় সেটি চিন্তা করবার জন্য সময় নিলেন।

দু এক দিনের মধ্যেই দেবব্রত বুঝতে পারলেন পিতা কোনো একটি সমস্যায় চিন্তাকুল হয়ে আছেন এবং চিন্তাটা যে কী সেটাও তিনি খোঁজ খবর নিয়ে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। একদিন তিনি

সোজাসুজি পিতাকে প্রশ্ন করলেন—"আপনাকে নানাভাবে ব্যাকুল মনে হচ্ছে, আপনি যেন শূণ্যহৃদয়ে অবস্থান করছেন;—আপনার কি হয়েছে বলুন আমি প্রতিকার করব।" উত্তরে শান্তনু ধার্মিকতার কপট উপদেশ আরম্ভ করলেন; তিনি বললেন,—"পুত্র ধর্মবাদীরা বলেন, যাঁর এক পুত্র তিনি অপুত্র মধ্যেই পরিগণিত। তুমি অবশ্য অমিত বলশালী, কিন্তু তোমার কিছু হলে আমার তো আর কিছুই থাকবে না—এটাই এখন আমার প্রচণ্ড দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" এতদিন পরে এক পুত্র নিয়ে মহারাজের সমস্যাটি দেবব্রতের কাছে ঠিক.প্রহেলিকার মত মনে হয়নি, কারণ তিনি পূর্বেই বৃদ্ধ অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হয়েছিলেন এবং পিতার দ্বিতীয় বিবাহজনিত মিলনে যে সন্তান-সন্ততি অবশ্যম্ভাবী সেটিও তাঁর পক্ষে বোঝা কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে.উত্তীর্ণ কৈশোর পুত্রের কাছে এই প্রেমজনিত দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে তাঁর পিতা সঙ্কোচ বোধ করছেন। যযাতির ছেলেদের মতন হলে তিনি পিতার দুর্বলতাকে ক্ষমা করতেন না; কিন্তু তাঁর স্বভাবটা ছিল কোমল এবং উদার; পিতাকে সুখী করবার জন্যে তিনি নিজের বৃহত্তম স্বার্থকে বিসর্জন দিতেও ইতস্ততঃ করলেন না। অচিরে তিনি রাজানুচরদের নিয়ে দাসরাজের কাছে উপস্থিত হলেন এবং সোজাসুজি পিতার জন্যে তাঁর পালিত কন্যাকে প্রার্থনা করলেন। ধীবর পরিকল্পনামতই অগ্রসর হলেন। তিনি বললেন,—"কুমার মহর্ষি পরাশর আমার কন্যার জন্য কাতর হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রার্থনায় আমি সম্মত হইনি এবং সেই কৃষ্ণাঙ্গ ঋষিকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু, এক্ষেত্রে বাধা দেওয়া শক্ত। তবে, পরিণয় সম্পন্ন হলে তার ফল শুভ না হবারই সম্ভাবনা। এইটা যত ভাবছি ততই আমার দ্বিধা হচ্ছে।" ধীবরের উক্তির প্রথম ভাগ যথার্থ ছিল না, কারণ পরাশর গোপনে সত্যবতীর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন এবং তাতে তিনি আদৌ বাধা পাননি। এ ছাড়া অতিশয় প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ হওয়াতে ধীবরকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতেন না, ইচ্ছে হলে

জোর করেই সত্যবতীকে নিয়ে যেতে পারতেন : কিন্তু তিনি তা করেন নি কারণ এই জাতীয় রমণীকে তিনি ভোগবাঞ্ছা পূরণের উপকরণ ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। দ্বৈপায়ন নিশ্চিত-ভাবেই অবিবাহিতা মাতার তত্ত্বাবধানে দাসরাজের সম্পূর্ণ জ্ঞাত-সারেই মানুষ হয়েছিলেন। বাল্যাবস্থা অতিক্রম করবার পরই সম্ভবতঃ জন্মদাতার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি মাতাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন এবং সত্যবতী যাতে শীঘ্র বানপ্রস্থ অবলম্বন করেণ সেবিষয়েও তিনি তৎপরতা অবলম্বন করেছিলেন। ধীবরের উক্তির দ্বিতীয় ভাগটি তাৎপর্যপূর্ণ কেননা দাসরাজ ইঙ্গিত করলেন যে সত্যবতীর পুত্র হলে সিংহাসন নিয়ে একটা বৈরতার সৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব। অর্থাৎ, একটা ভেদনীতির অবতারণা করে দেবব্রতকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার চক্রান্ত করতে যে তিনি সমর্থ সেকথা প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন। দেবব্রত অবশ্য তাতে ভীত বোধ করেননি কারণ তিনি জানতেন এসব চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য ; তথাপি পিতৃপ্রণয় যাতে সফল হয় সেবিষয়েই তিনি সচেষ্ট হলেন। তিনি সর্বসমক্ষে অনায়াসে প্রতিজ্ঞা করলেন যে সত্যবতীর গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করবেন তিনিই বাজত্বে অভিষিক্ত হবেন। ধীবর তখন পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ করলেন। তিনি বললেন—"আপনার মহত্বের তুলনা নেই ; কিন্তু সমস্যা এতেও মিটবে বলে মনে হয়না ; কারণ আপনার সন্তান যে সিংহাসন দাবী করবে না এমন কোনো প্রমাণ নেই। সেক্ষেত্রে সত্যবতী ও তার সন্তানের বিপদ অনিবার্য হয়ে উঠবে।" দেবব্রত তখন আবার প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি সম্পুর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করবেন, তাহলেই আর সত্যবতীর সন্তান নিয়ে কোনো গোলযোগের সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। ভবিতব্যের কাছে মানুষের কোনো হাত নেই, সেটা সেদিনকার পিতৃভক্ত পুরুষ বা পালিতকন্যার হিতাকাঙ্ক্ষী ধীবর এতটুকুও আন্দাজ কবতে পারেননি। পরন্তু, এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য লোকে তাঁকে ভীষ্ম বলে সম্বোধন করায় দেবব্রত বোধ করি

পরম আস্বাদর অনুভব করেছিলেন।

পিতৃভক্তির যে আদর্শ দেবব্রত ভীষ্ম স্থাপন করলেন তাকে প্রশংসনীয় বললে অসঙ্গত হবে। তখনকার দিনে বহুবিবাহ বা তুচ্ছকুল-জাত কন্যাকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রথা ছিল; মহারাজ শান্তনু ইচ্ছে করলেই সেটি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। ধীবর বংশে লালিত ধীবর মাতার গর্ভজাত এক কন্যা, যিনি কন্যাবস্থায় পুত্রবতী হয়েছিলেন, তার প্রতি তিনি অনুরক্ত হলেন এবং সে অনুরাগ এত প্রগাঢ় যে তাকে বিবাহ করে পুত্রোৎপাদনেও তাঁর অপ্রবৃত্তি হয়নি। কিন্তু, ব্যাপারটা যে হস্তিনার সম্রাটের পক্ষে একান্ত লজ্জাকর, সেই জ্ঞানটুকু তাঁর ছিল; তাই প্রকারান্তরে তাঁর ইচ্ছাটা বহু সঙ্কোচের সঙ্গে পুত্রের গোচর করেছিলেন। দেবব্রত পিতার জন্যে ধীবরকন্যাকে প্রার্থনা করেছিলেন। এটাও খুব একটা বড় দোষের কথা নয়, কিন্তু সিংহাসনের ওপর নিজের দাবীকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন কেন? কেনই বা তিনি নিজের জীবনকে অকারণে বঞ্চিত করলেন? তাঁর উচিত ছিল ধীবরকে প্রবল উচ্চাকাঙ্খা থেকে কৌশলে নিবৃত্ত করা, তা সম্ভব না হলে রাজশক্তি প্রয়োগ করে কন্যাদানে বাধ্য করা। তা না করে, তিনি পিতার দুর্বলতায় ইন্ধন যোগালেন এবং স্বীয় নির্বুদ্ধিতার ফল তাঁকে সারা জীবন ধরে ভোগ করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তিনি রাজা হলে মহাভারতের এই বিরাট ট্র্যাজেডিও সংঘটিত হত না, তবে মহাভরতের মত মহাকাব্য থেকে আমরা হয়তো বঞ্চিত হতুম। যে কুলক্ষয়ী সংগ্রাম তাঁর বংশকে এবং যদুবংশকে বিশীর্ণ করে ফেলেছিল তার জন্যে ভীষ্মের এই যুক্তিহীন আত্মত্যাগই মূলতঃ দায়ী। ভীরু নীতিভ্রষ্ট শান্তনু পুত্রকে সাধুবাদ প্রদান করে বর দিলেন—"স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হবেনা।" কিন্তু হায়,—কথায় যেমন চিঁড়ে ভেজে না তেমনি শান্তনুর বরও কার্যে পরিণত হয়নি। ভীষ্ম অতিবার্ধক্যে কুরুক্ষেত্রে শোচনীয় ভাবে নিহত হয়েছিলেন; যুদ্ধ করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিলনা। অথবা, এই ঘটনার অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সেইটাই সম্ভব এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ

পর্যন্ত তাঁর বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা খুব কষ্ট কল্পিত।

অতঃপর বিবাহ নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হল। ধীবরপালিতা কন্যা রাজ অন্তঃপুরে রাজমহিষীরূপে অধিষ্ঠিতা হলেন। অবশ্য তাঁর দেহে রাজরক্ত ছিল বৈকি, কারণ তাঁর জন্মদাতা ছিলেন রাজন্যবর্গের মধ্যে একজন সুবিদিত রাজা উপরিচর বসু। যথারীতি তাঁর দুটি পুত্রসন্তান হল ; জ্যেষ্ঠের নাম চিত্রাঙ্গদ এবং কনিষ্ঠের নাম বিচিত্রবীর্য। মহারাজ শান্তনু এদের কতকটা মানুষ করতে পেরেছিলেন মাত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র যখন তরুণ তখনই তাঁর তিরোধান ঘটল।

ভীষ্ম সত্যবতীর মত নিয়ে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। চিত্রাঙ্গদের রাজ্যলিপ্সা ছিল প্রবল। তিনি রাজা হয়েই একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকলেন এবং ভীষ্ম তাঁকে কিছুমাত্র সংযত করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। অবশেষে কুরুক্ষেত্রে এক গন্ধর্বরাজের হাতে তিনি নিহত হলেন। এই গন্ধর্বের নামও ছিল চিত্রাঙ্গদ। গন্ধর্বেরা ছিলেন এক সুপ্রাচীন জাতি। হিমাচলে দেবসভ্যতা স্থাপিত হবার পূর্ব থেকেই এঁরা একটি সুসভ্য স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বহুদিক থেকে এরা ছিলেন দেবতাজাতীয়দের চেয়েও অগ্রসর। এঁরা সাধারণতঃ অপ্সরাজাতীয়া রমণীদের বিবাহ করতেন। ক্রমে, স্বর্গলোকে দেবশাসনের সময় এঁরা দেবজন বলে পরিচিত হন। রাজা বিশ্বাবসু বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। হিমাচলে দেবশাসনের অন্তিমভাগে গন্ধর্বেরা স্বাধীন রাজ্যাদি গঠন করে হিমাচলের বিভিন্ন পার্বত্যপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাঁদের অনেকে মর্ত্যদেশেও বসতি স্থাপন করেছিলেন, এমনকি মর্ত্যবসিদের সঙ্গে মিশেও গিয়েছিলেন। কৌরবদের যুগেও এই জাতির কিছু কিছু অস্তিত্ব ছিল, যদিও তাঁরা পুরাকালের খাঁটি গন্ধর্ব ছিলেন না।

অপুত্রক মহারাজ চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর রাণী সত্যবতীর নির্দেশে ভীষ্ম কিছুকাল রাজ্যের শাসনকার্য দেখাশোনা করেছিলেন, কিন্তু

অল্পদিনের মধ্যেই বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হল। তারপর তাঁর বিবাহের খোঁজখবর চলতে লাগল। ভীষ্ম জানতে পারলেন কাশীরাজের তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হবেন। এঁদের নাম যথাক্রমে,-অম্বা, অম্বিকা, এবং অম্বালিকা। ভীষ্ম বারাণসীতে গিয়ে এই তিন কন্যাকেই হরণ করে আনেন। সেখানে ছোটখাটো যুদ্ধ যে না হয়েছিল এমন নয়, বিশেষ করে অম্বার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী শাল্বরাজা তাঁর অবস্থা বেশ শোচনীয় করে এনেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনজনকেই তিনি হস্তিনাপুরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে এই তিনটি কন্যারই যখন বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে তখন কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা দৃঢ়ভাবে জানালেন যে তিনি শাল্বরাজের প্রতি আসক্তা এবং কিছু মেলামেশাও তাঁদের মধ্যে এর পূর্বে ঘটেছে। অতএব, তিনি এই বিবাহের যোগ্যপাত্রী কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয় হয়ে দেখা দিল। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ পরামর্শ করে স্থির করলেন যে অম্বাকে স্বেচ্ছানুরূপ কাজ করবার অনুমতি দেওয়াই উচিত। অম্বা আর হস্তিনাপুরে রইলেননা, তাঁর কনিষ্ঠা দুই সহোদরার সঙ্গে মহারাজ বিচিত্রবীর্যের বিবাহ সম্পাদিত হল। এই তরুণ রাজার কামপ্রবৃত্তি ছিল দুর্বার। মহাভারত জানাচ্ছেন যে এই দুই কামিনীর সঙ্গে সাতবৎসর নিরন্তর বিহার করবার পর নিঃসন্তান অবস্থায় যৌবনকালেই তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন এবং কিছুতেই তাঁকে বাঁচানো গেলনা। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও ভীষ্ম রাজ্যশাসনের হাল ধরেছিলেন বলে বিচিত্রবীর্য এই পরিমাণে কামের সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ভীষ্ম তাঁকেও এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি থেকে সংযত করবার চেষ্টা করেননি। ওদিকে দুর্ভাগিনী অম্বার আশাও সফল হলনা। তাঁর পূর্বপ্রাণয়ী শাল্বরাজ তাঁকে পুনর্বার গ্রহণ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁকে আত্মঘাতিনী হতে হয়েছিল।

কন্যাদানের পূর্বে দাসরাজ যে আশা পোষণ করেছিলেন তা এইভাবে বিলুপ্ত হল। সত্যবতীর দুই পুত্রের মধ্যে একজন নিঃসন্তান অবস্থায় যুদ্ধে নিহত হলেন, অপরজনও অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ দিলেন

কামিনী সহবাসের আতিশয্যে। দুর্ভাগিনী সত্যবতী করুণভাবে ভীষ্মের কাছে এসে আবেদন করলেন—"আমার মৃত স্বামীকে জলপিণ্ড প্রদান করবার মত একমাত্র তুমিই বর্তমানে। আমার পুত্রবধূরা পুত্রার্থিনী হয়েছেন, তুমি তাদের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর।" কিন্তু ভীষ্ম তাঁর পূর্বপ্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হলেন না, তিনি ব্রহ্মচর্যরক্ষায় অটল রইলেন। তাঁর বক্তব্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সত্যভঙ্গ একান্তভাবে নিন্দনীয়; কোনো প্ররোচনাতেই তা ঘটতে পারেনা। তিনি অনেক বাগ্‌বিস্তারের পর বিমাতাকে পরামর্শ দিলেন কোনো গুণবান ব্রাহ্মণকে ধনপ্রদানপূর্বক সন্তুষ্ট করে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করা হোক। এই ধরণের উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে, সেযুগে ব্রাহ্মণগণ আমন্ত্রিত হয়ে কামিনীসম্ভোগ তো করতেনই উপরন্তু পুত্রোৎপাদনের জন্য প্রচুর অর্থও লাভ করতেন। ব্রাহ্মণদের এই বৃত্তি কিন্তু সে যুগেও অনেকের কাছে নিন্দিত হয়েছে এবং তাঁরা একাজকে গর্হিত বিবেচনা করেছেন। আরো একটি প্রশ্ন এ সম্পর্কে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই যে নিয়োগের দ্বারা সন্তান, এ হয়তো বৈধ হতে পারে, কিন্তু রাজারাজড়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অমাত্যবর্গ এবং প্রজাদের কাছে এর প্রমাণ দিতে হত। কার্যতঃ সেটি কিভাবে করা হত সেটি জানা যায় না। মহাভারতে এমনভাবে এসব ব্যাপার বলা হয়েছে যেন এগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং সকলেই মেনে নেবেন। তৎকালীন প্রজারা মূর্খ ছিলেন না, তাঁদের কাছে নিশ্চিতভাবে বিধিনিয়ম অনুসারে ঈদৃশ নিয়োগসিদ্ধ পুত্রের অধিকার প্রমাণ করতে হত। মহাভারতে নিয়োগ-প্রথা অনুসারে পুত্রের জন্ম ও অধিকার প্রকৃত বিধিসম্মতভাবে প্রমাণ করা হয়েছে এমন একটি উদাহরণও নেই। এই কারণে লৌকিক নীতি এই গ্রন্থে ভীষণভাবে অবহেলিত হয়েছে, যার একটি বিষময় ফল হচ্ছে কুরুবংশের কুলক্ষয়ী সংগ্রাম।

যাই হোক, বুদ্ধিমতী সত্যবতী তথাকথিত ব্রাহ্মণদের ওপর আস্থা স্থাপন করেননি; তিনি প্রাক্‌বিবাহের পুত্র ব্যাসকেই আমন্ত্রণ করে আনলেন। দ্বৈপায়ন তাঁর মায়ের মহৎ উদ্দেশ্য পূর্বেই আন্দাজ

করেছিলেন ; অতএব বেশ খুশী হয়েই বললেন,—"ভগবতি, আমি আপনার অভিপ্রেত কার্যসাধনের জন্যে প্রস্তুত ; অনুমতি করুন কি প্রিয় কার্য করতে হবে।" মাতা সত্যবতী সেই প্রিয় কার্যটি অত্যন্ত প্রিয়ভাষায় ব্যক্ত করলেন এবং ব্যাসদেবও সম্মত হতে বিলম্ব করলেন না। তবে, তিনি একটি ঋষিসুলভ চাল চাললেন। তিনি বললেন—"দেবীদের কিন্তু এক বৎসর ধরে ব্রত পালন করে পবিত্র হতে হবে, নইলে আমাকে স্পর্শ করা যাবে না।" সত্যবতী এই কপট সাধুতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন,—"পুত্র, তুমি কি বুঝতে পারছ না জনপদ দীর্ঘকাল অরাজক থাকলে প্রজাপালন করা দুরূহ হয়ে উঠবে এবং দেশের দুর্গতি ঘনিয়ে আসবে। কেবলমাত্র ভারগ্রহণ করে অরাজক রাজ্যকে কেউ চালাতে পারে না। অতএব, তুমি অবিলম্বে এদের গর্ভাধান কর।" ব্যাসদেব মাতৃবাক্যের ওপর আর কথা বলতে সাহস করলেন না ; কিন্তু যেভাবে রমণী সহবাস করলেন তা রতিক্রিয়ার উপযুক্ত বিধি নয়। নারীসম্ভোগে তাঁর দ্বিধা ছিল না, কিন্তু দুই সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে তিনি যেভাবে মিলিত হলেন তা যথেষ্ট অপমানকর এবং আপত্তিকর। অম্বিকা শুচিতা সহকারে রমণীয় বেশভূষা সম্পাদন করে যখন তাঁর জন্যে শয়নাগারে প্রতীক্ষা করছিলেন তখন "ভগবান" ব্যাস এলেন তাঁর বিকটমূর্তি, ভয়ানক বেশ এবং দুর্গন্ধযুক্ত দেহ নিয়ে। এটি হচ্ছে সেকালকার ঋষিদের স্বভাবের একটি নিদর্শন। এঁরা প্রায়ই দেখতে কুৎসিৎ হতেন এবং শরীরের পরিচর্যাকে বাহুল্য মনে করতেন। এইরকম মূর্তিমান অপবিত্রতার মধ্যে কি করে যে তাঁরা পরম পবিত্র ভগবৎকৃপা লাভ করতেন তা একমাত্র পুরাণকারগণই জানেন। ফলে অম্বিকার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করল সে হল অন্ধ এবং অম্বালিকার গর্ভস্থ সন্তান জন্মাল পাণ্ডুবর্ণ দেহ নিয়ে। এঁরাই হলেন যথাক্রমে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং ভবিষ্যৎ কৌরব সম্রাট মহারাজ পাণ্ডু। এর মধ্যে সত্যবতী একটু কৃত্রিমতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি গর্ভাধানের আগে অম্বিকাকে শয্যায় রেখে বলেছিলেন যে নিশীথকালে তাঁর এক দেবর আসবেন এবং অম্বিকা যেন তাঁর জন্য অপ্রমত্তভাবে অপেক্ষা

করেন। অম্বিকা ধরে নিয়েছিলেন ভীষ্মই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং তিনি তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলেন ; এমন সময় দুর্ভাগ্যক্রমে যিনি উদিত হলেন তিনি ভীষ্ম বা অপর কোনো কৌরব রাজপুরুষ নন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর মূর্তি ব্যাসদেব। পরে অম্বালিকাও এই সংবাদে গভীর বিষাদযুক্তা হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সত্যবতী অতিশয় মর্মাহত হয়েছিলেন। তথাপি জ্যেষ্ঠা বধূ অম্বিকা পুনর্বার যথাসময়ে ঋতুমতী হলে আবার দ্বৈপায়নকে আহবান করা হল, কিন্তু মহিষী অম্বিকা দ্বিতীয়বার অপমান বরণ করলেন না ;—প্রতিশোধ নেবার জন্যে এক দাসীকে সুসজ্জিতা করে পাঠিয়ে দিলেন ঋষির কাছে। মহামতি ব্যাসদেব সেই অপ্সরোপমা দাসীকে দেখেই মোহিত হয়ে গেলেন এবং তিনি যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তা জেনেও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে দ্বিধাবোধ করলেন না। এই দাসীর গর্ভে যিনি জন্মেছিলেন তিনিই মহাভারতের পরম ধার্মিক, স্বনামধন্য বিদুর। এই ব্যক্তি, যিনি ব্যাসের ঔরসে দাসী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র বলে স্বীকার করা হল এবং তিনিই হলেন ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর ভ্রাতা। এইভাবে প্রবঞ্চিত ব্যাসদেবও অম্বিকার প্রতি পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন এবং মাতা সত্যবতীকে সে কথা জানিয়েও গেলেন। কিন্তু মুনিবর হয়তো তখনও ভাবতে পারেননি যে এই দাসী গর্ভজাত পুত্রটি ভবিষ্যতে কুরুপাণ্ডবের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং এই হেয় জন্ম তার চিত্তবৃত্তিকে কতখানি বিদ্বেষপূর্ণ করে তুলবে। যথার্থ কুরু সম্রাট দুর্যোধন বিদুরকে প্রবল ভাবে ঘৃণা করতেন, এবং ব্যাসদেবও মহারাণী অম্বিকার পৌত্র দুর্যোধনের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি, করেছিলেন পাণ্ডবদের। আসলে ব্যাসের কপট এবং অভব্য আচরণের ফলে এইখান থেকেই একটি বিরোধের বীজ রোপিত হয়ে রইল। কিন্তু আদি কুরুবংশে এখান থেকে একটা ছেদ পড়ল ; আসলে এটি হয়ে দাঁড়ালো ব্যাসদেবের স্থাপিত বংশ।

এই তথাকথিত তিন ভাই রাজকীয় মর্যাদায় মানুষ হতে

লাগলেন। দাসী পুত্র বলে বিদুরকে একটু দূরে রাখা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মানুষ তিনি হয়েছিলেন রাজপুত্রের সমপর্যায়েই। পাণ্ডু ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন; অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র দৈহিক বল চর্চ্চায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করলেন এবং বিদুর নাকি ধর্মালোচনায় তথা রাজনীতিতে অগ্রণী হয়েছিলেন। দাসীপুত্র হলেও ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের অনুরূপ বেদপাঠে তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়নি। এবার প্রশ্ন উঠল সিংহাসনের অধিকারী কাকে করা উচিত। যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন সেহেতু তাঁর দাবী অগ্রাহ্য হল। বিদুর পারশব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শূদ্র সঞ্জাত; তাঁকেও রাজপদ প্রদান করা গেল না; অতএব পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হলেন।

এইখানেই একটি সাংঘাতিক ভ্রমের সূচনা হল। রাজ্য—বিধায়কগণ সিংহাসনের ওপর পরবর্তী অধিকার সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেননা। পাণ্ডু কেবলমাত্র দৈবক্রমেই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসাবেই তাঁকে রাজপদে নিযুক্ত করা কর্তব্য ছিল যাতে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতে পারেন। সেইরূপ কোনো নীতি নির্ধারণ না করাতেই ভবিষ্যৎ গোলযোগের সম্ভাবনা প্রবলভাবেই রয়ে গেল। এইখানেও ভীষ্ম তাঁর দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত থেকে গেলেন। রাজপ্রাসাদের যে চক্রান্তে ধৃতরাষ্ট্র বঞ্চিতভাগ্য হয়ে পড়লেন, ভীষ্ম সেই চক্রান্তেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

পরবর্তী পর্যায় এঁদের বিবাহ। এর ভার নিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ রাজপুরুষ ভীষ্ম নিজে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ স্থির করবার পূর্বে তিনি পরামর্শ করেছিলেন পারশব সর্বকনিষ্ঠ বিদুরের সঙ্গে। বিদুর এবিষয়ে তাঁর কোনও মতামত প্রদান করেননি। গান্ধাররাজ প্রথমটা অন্ধত্বের জন্যে বিবাহের অনুকূলে মনোভাব প্রদর্শন করেননি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি ও সদ্‌বৃত্ত জামাতার অভিলাষে ধৃতরাষ্ট্রকেই কন্যাদান করা স্থির করলেন। গান্ধারের যুবরাজ পিতৃ আজ্ঞায় ভগ্নীকে হস্তিনায় নিয়ে

এলেন এবং সেখানে ভীষ্মের অনুমতিক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র কিন্তু এই বিবাহকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। তিনি এই বিবাহকে একটি রাজনীতিক চাপ বলেই মনে করেছিলেন এবং এর যে সাংঘাতিক প্রতিশোধ তিনি নিয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। গান্ধারীও যে নৈরাশ্যজনক মনোভাব পোষণ করেননি, এমন হতে পারে না, কেননা কোনো তরুণীই অন্ধস্বামী কামনা করে না, তথাপি তিনি ভাগ্যকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিলনা। সমগ্র মহাভারতে শকুনির সঙ্গে গান্ধারীর নিভৃতে বা প্রকাশ্যে কোনো আলাপ আলোচনা হয়েছে, এমন ঘটনা নেই। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ গান্ধারী ভ্রাতার কার্যকলাপ গূঢ় ভাবে সমর্থন করলেও সেটি অত্যন্ত সন্তর্পণে নিজের অন্তঃ-করণে পাষণ করতেন এবং শকুনিও এরকম সংশয়ের কোনো অবকাশ রাখেননি। অবশ্য সব ব্যাপারেই গান্ধারী যে তাঁর ভ্রাতাকে সমর্থন করেছিলেন এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু কুরুসভায় একান্ত দৃষ্টিকটু-ভাবে বিপর্যয় না ঘটলে তিনি শকুনির কূটনীতির ওপর হয়তো আদৌ হস্তক্ষেপ করতেননা। সাধারণ ভাবে তিনি ভ্রাতার কোনো কাজেই বাধা প্রদান করেননি।

কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহের একটু ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা কুন্তীকে নিয়ে। ইনি ছিলেন যদুবংশীয় নৃপতি শূরের প্রথমকন্যা। এঁর আসল নাম পৃথা। এঁর ভাই ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণের পিতা বসুদেব। রাজা শূর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তাঁর পিতৃস্বসার পুত্র নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে তিনি তাঁর প্রথমকন্যাকে প্রদান করবেন। সেই অনুযায়ী প্রথম কন্যাটিকে তিনি কুন্তিভোজের হাতেই সমর্পণ করলেন। কুন্তিভোজের পালিতা বলে শূরদুহিতা পৃথা কুন্তী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এঁর প্রথম জীবনে একটি অঘটন ঘটেছিল; ইনি কন্যা অবস্থায় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। মহাভারতের উপাখ্যানে কর্ণ সূর্যপুত্র; কিন্তু এটি উপাখ্যানমাত্র,—এই রূপকথা ছেড়ে দিলে কর্ণের উৎপত্তি নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। কথিত আছে

দুর্বাসা রাজগৃহে ব্রাহ্মণসেবায় নিযুক্তা কুন্তীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি "মহামন্ত্র" প্রদান করেছিলেন যার প্রভাবে যে কোনো দেবতার সহযোগে তাঁর গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হতে পারত। কুন্তী কৌতূহলবশতঃ সেই মন্ত্রদ্বারা সূর্যদেবকে আহ্বান করেন। তখন সূর্য কুন্তীর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সহবাসের ফলে কর্ণের জন্ম হয়। এটিও কাহিনী বিশেষ। কুন্তী যে কার সহযোগে এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন তা অনুমান করা শক্ত, তবে সম্ভবতঃ তিনি যে সব ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা করতেন তাঁদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি এই সন্তানের জন্মদাতা ছিলেন। পৌরাণিক রীতি অনুসারে কর্ণ যে সূর্যের পুত্র, এটি একটি দৈববাণী সহকারে প্রচার করার পক্ষে বাধা ছিল, কারণ অনূঢ়া কন্যাকে কারুর ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা যেতনা। এই ভাবে পঞ্চপাণ্ডবের দৈবজন্মকে ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল। অতএব, রাজগৃহের এই কলঙ্ককে গোপন রাখা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। যাই হোক, পুত্রটি সম্ভবতঃ রাজগৃহেই পালিত হয়েছিল কিছুকাল; তারপর যখন দেখা গেল মায়ের সাহায্য ছাড়াই সে বাঁচতে পারে তখনই তাকে "যশস্বী রাধাভর্তা" অধিরথ সূতের কাছে দান করা হয়, কারণ রাজপরিবারে তাকে আর রাখাটা ঠিক হতনা। সূত অধিরথ এবং তদীয় পত্নী রাধা কর্ণকে পিতামাতার মতই মানুষ করেছিলেন। কুন্তী যে তাঁর ধাত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করে শিশুপুত্রকে গোপনে এক মঞ্জুষার মধ্যে রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এবং দীর্ঘপথ অতিক্রম করবার পর অধিরথ তাকে উদ্ধার করে স্বীয় পত্নীর কাছে পালন করবার জন্য দিয়েছিলেন—এ কাহিনী কদাচ সম্ভব হতে পারে না। তবে ধাত্রীর উল্লেখে কুন্তী যে দীর্ঘদিন যথা নিয়মে গর্ভ ধারণ করে এই সন্তান প্রসব করেছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। কেন যে এত লোক থাকতে কর্ণ এই সূতজাতীয় অধিরথের হাতে পড়লেন এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে কুন্তী চেয়েছিলেন এই পুত্র এমন জায়গায় সমর্পিত হোক যেখান থেকে তার পক্ষে ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীতে প্রবেশ করা কোন ক্রমেই

সম্ভব না হয়। কিন্তু সেই অঘটনই শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল। এরও একটা কারণ আছে। অধিরথ জাতিতে সূত হলেও আদৌ দরিদ্র সারথি পর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সখা ছিলেন এবং ভাগীরথীর তীরবর্তী অঙ্গরাজ্যের চম্পা নগরী ছিল তাঁর বাসস্থান। এই নগরীটিকেই সূতরাজ্য বলা হত এবং তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে অধিরথের গৃহে পালিত হলেও কর্ণের বিদ্যা ও শস্ত্র শিক্ষার জন্য অর্থানুকূল্যের অভাব হয় নি। এ বিষয়ে কর্ণের নিজের উদ্যম অবশ্যই যথেষ্ট ছিল। কালক্রমে কর্ণের শস্ত্রশিক্ষার কথা কুন্তীরও কর্ণগোচর হয়েছিল এবং সেই কারণেই অস্ত্র পরীক্ষায় কর্ণের উপস্থিতিতে তিনি যৎপরোনাস্তি শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং যে ভয় তিনি অন্তরে পোষণ করে এসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ভাগ্য কর্ণ যথাসময়ে তাঁর মাতৃ পরিচয় পেয়েছিলেন কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে মাকে দেখেন নি। পরবর্তীকালে নিষ্করুণ মাতার নির্মম প্রত্যাখ্যানে তিনি এত বিদ্বেষযুক্ত হয়েছিলেন যে মার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো অভিপ্রায়ই তিনি পোষণ করতেন না। তথাপি জীবনে একবার গর্ভধারিণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল এবং সেও উক্ত নারীর স্বার্থে। অধিরথকেই তিনি পিতা বলে স্বীকার করে এসেছিলেন। কুন্তী কর্ণের সব সংবাদই রাখতেন, কিন্তু ছেলে যখন বড় হয়ে উঠল তখন এমন একটা লজ্জা তাঁকে আচ্ছন্ন করল যে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার দুর্বার আগ্রহও তাঁকে দমন করতে হল। অধিরথ কর্ণের নাম রেখেছিলেন বসুষেণ। "কর্ণ" নামটি তিনি অর্জন করেছিলেন কি উপায়ে সে সম্বন্ধে কাহিনী এই যে তিনি সহজাত কবচ শরীর ভেদ করে যাচমান ইন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন বলে এই আখ্যাটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁকে বৈকর্তনও বলা হত। কিন্তু, এও তো কাহিনী। কর্ণ নামকরণের নির্ভরযোগ্য ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। বসুষেণ যখন শৈশব অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন তখন কুন্তীর সাড়ম্বরে বিবাহ হয়ে গেল স্বয়ম্বর প্রথায়।

রাজা কুন্তিভোজ নিজেই স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছিলেন। তিনি জানতেন সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে গেলে কুন্তীর কন্যাবস্থায় পুত্র প্রসবের কথাটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে। অতএব এইটাই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা বলে মনে হল। কুন্তী মহারাজ পাণ্ডুর গলায় মালা দিলেন, কারণ তাহলে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতির সম্রাজ্ঞী হবেন। এ বিবাহে কোনো গোলমাল হয়নি। বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে হোলো। ভীষ্ম কিন্তু আগেই বিদুরের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছিলেন যে মদ্ররাজের কন্যাকেই কৌরবের ঘরে আনবেন। এর মধ্যে কুন্তীর স্বয়ম্বরটা ঘটে গেল যেন দৈব-প্রভাবেই। এই বিয়ের পরেই তিনি মদ্ররাজ শল্যের কাছে নিজে গিয়ে তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহের প্রস্তাব করলেন। মদ্ররাজ রাজি হলেন: কিন্তু কুলধর্ম অনুযায়ী শুল্কগ্রহণপূর্বক কন্যাদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করলেন। ভীষ্মের তাতে অমত ছিল না। তিনি মহারাজ শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শুল্ক স্বরূপ প্রদান করলেন। মাদ্রীকে স্বয়ং ভীষ্ম হস্তিনায় নিয়ে এসে পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। পাণ্ডু কুন্তীর চেয়ে মাদ্রীকে অনেক বেশী ভালোবাসতেন।

এই বিবাহের কি এমন বিশেষ কারণ ঘটেছিল বলা শক্ত, তবে অনুমান করা যায় কুরুরাজ্যের উত্তর সীমান্তে দুর্দ্ধর্ষ মদ্ররাজ্যকে বৈবাহিক সুত্রে বশীভূত করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পাণ্ডু রাজা হয়ে কিছুটা যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন। তিনি নাকি কাশী, মগধ, মিথিলা থেকে সুহ্ম, পুণ্ড্রদেশ পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তবে এতটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না, অল্পস্বল্প কিছুটা সত্য হতে পারে। তথাকথিত যুদ্ধবিগ্রহের পরে তিনি দক্ষিণ হিমাচলের অরণ্য প্রদেশে বেড়াতে গেলেন দুই পত্নীকে নিয়ে। এই সময় বিদুরের বিয়ে হল তাঁরই মতন একজন পারশবী কন্যার সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন রাজা দেবকের ঔরসজাত কন্যা। এঁর গর্ভে বিদুরের একাধিক পুত্রও জন্মগ্রহণ করেছিল; কিন্তু পুরাণকার তাঁদের কোনো প্রাধান্য দেননি।

দেবকের কন্যা হিসাবে বিদুরের পত্নী ছিলেন কৃষ্ণের মাতা দেবকীর ভগ্নীস্থানীয়া এবং সম্পর্কে কৃষ্ণের মাসী। এই কারণেই কৃষ্ণেরও তাঁর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাঁর পিসী কুন্তীও হস্তিনায় অবস্থান-কালে বিদুরের গৃহে বাস করতে ভালোবাসতেন। বিদুরকে তিনি হয়তো অকপটে নিজের জীবনের এমন ঘটনাও ব্যক্ত করেছিলেন যা অপর কেউ জানতেন না।

এই সময়ে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ভধারণ করলেন। এইখানে মহাভারত একটি অসমর্থনযোগ্য কাহিনীর অবতারণা করেছেন। গান্ধারী নাকি দুই বৎসরকাল গর্ভধারণের পরেও সন্তান প্রসব করতে পারেন নি। অবশেষে নানা অলৌকিক ঘটনায় তাঁর শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই অবসরে নাকি গান্ধারীর পূর্বেই কুন্তীর বিবাহের পর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী এখানে সর্বতোভাবে অবাস্তব বলে মনে হয়। স্বাভাবিকভাবেই গর্ভধারণের নির্দিষ্টকাল পরেই গান্ধারীকে সন্তান প্রসব করতে হয়েছিল এবং তাহলে নিঃসন্দেহে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বড় ছিলেন। কেবলমাত্র পাণ্ডুপুত্রকে জ্যেষ্ঠ করবার জন্যেই এই কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, তা না হলে যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনের দাবীদার করা যায় না। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রও আর একটি অবিশ্বাস্য কাহিনী। তাঁর কিছু সংখ্যক ছেলে এবং একটি মেয়ে হয়েছিল, এইটিই কেবলমাত্র সত্য ঘটনা হতে পারে। কুন্তী এবং গান্ধারীর প্রসব নিয়ে একটি গোলযোগের সৃষ্টি করা হয়েছিল। আসলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হস্তিনায় হয়নি, হয়েছিল হিমাচলের গিরিপ্রদেশে। অতএব, প্রভাবশালী পাণ্ডুপক্ষীয়েরা যদি এ খবর প্রচার করে থাকেন যে কুন্তীই আগে সন্তান প্রসব করেছেন, তাহলে তার যাথার্থ্যকে প্রতিপন্ন করবার আবশ্যকতা ছিল। যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর ঔরসজাত সন্তান ছিলেন না, সেদিক দিয়েও তাঁর দাবী অগ্রগণ্য না হবারই কথা এবং পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণদের উক্তিই একমাত্র প্রমাণ। সব দিক বিচার করে কার সন্তান যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তোলা কেন হয়নি তা

বোঝা যায় না। পরবর্তীকালে বা সময়বিশেষে অনেক সূক্ষ্মভাবে বহু নীতির প্রশ্ন মহাভারতে আলোচিত হয়েছে অথচ এই প্রশ্নটি আদৌ আলোচিত হয়নি। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সব কিছু শুনেই অবধারণ করতেন, অন্যভাবে কিছু উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না ;—এইটাই তাঁর জীবনের সব দুঃখের মূলীভূত কারণ ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদের একদল প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁরাই পাণ্ডুকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এখনও তাঁরা সর্বতোভাবে পাণ্ডু-পুত্রদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শারীরিক অসামর্থ্যহেতু পাণ্ডু তাঁর ব্যক্তিগত অধিকারেই রাজা হয়েছিলেন ; তাঁর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজা হবার দাবী না থাকারই কথা। তার উপর এইপুত্র তাঁর ঔরসজাত পুত্র নয় এবং এর জন্মকে নিয়ে একটি রহস্যের আবরণ ছিল। অতএব, এ সম্বন্ধে একটি উত্তম অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। দোলাচলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র একে প্রকৃতিতে দুর্বল ছিলেন তার উপর প্রাসাদের ষড়যন্ত্রে তিনি ভীত ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়নি। তাঁর পিতামহী সত্যবতীর এ প্রশ্নটির মীমাংসা করে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অজ্ঞাতকারণে বহু বিষয়ে তিনি নিজে সিদ্ধান্তগ্রহণ করলেও এবিষয়ে তিনি নিবৃত্ত থেকে গেছেন। কিছু পরের বর্ণিত বৃত্তান্ত থেকে দেখা যাবে রাজা পাণ্ডু যুধিষ্ঠিরের জন্মগ্রহণের আগেই রাজ্য পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে রাজ্যভার স্বতই ধৃতরাষ্ট্রের ওপরেই এসে পড়ে এবং তাঁর পুত্রের রাজা হওয়াটাই সঙ্গত বলে মনে হয়। পাণ্ডু পুত্র উৎপাদন করেছিলেন পরলোকের ঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য ; অতএব নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে যে রাজ্যত্যাগী রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে তার পক্ষে সিংহাসনের অধিকার ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত পুত্র দুর্যোধন অপেক্ষা কি করে অধিক হতে পারে, সেটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা না হলেও ধৃতরাষ্ট্রকেই লোকে মহারাজ বলে স্বীকার করত এবং পাণ্ডুর দীর্ঘ প্রবাসকালে রাজত্বের ভার মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই বহন করেছিলেন।

যাই হোক, যুধিষ্ঠির যে বড় সে কথা মেনে নিয়েও ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম-সমেত কুরু জ্যেষ্ঠদের এক সভায় জিজ্ঞাসা করলেন—"মহাশয়েরা সকলেই উপস্থিত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য পেলেও আমার কিছু বক্তব্য নেই, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যে আমার এই জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাগী হবে কিনা? আপনারা কি বিবেচনা করেন বলুন।" এর উত্তরে বিদুর বললেন—"আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মাবামাত্র নানারকম দুর্নিমিত্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, অতএব—একে আপনি পরিত্যাগ করুন, নইলে কুরুকুল ধ্বংস হয়ে যাবে।" সভাস্থ আর কেউ কোনও উক্তি করলেন না। অতএব ধৃতরাষ্ট্র নিরস্ত হলেন। কিন্তু, এর চেয়ে বড় মর্মান্তিক অবিচার আর কখনও ঘটেনি। প্রথমতঃ বিদুরের কোনও অভিমত প্রদান করবার মত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না, বলবার হলে ভীষ্ম কিছু বলতে পারতেন। দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত দুর্নিমিত্ত ঘটতে দেখা গেলেই কি বিধিনিয়ম অন্যরকম হয়ে যায়? প্রাকৃতিক ব্যাপার যাই ঘটুক না না কেন, দাবী দাবীই ;—দুর্যোধনের দাবী যেভাবে অগ্রাহ্য হল, তা অতিশয় শোচনীয়। এই প্রথম ঘটনা, যখন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু-পন্থীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। তৃতীয়তঃ, পিতা কর্তৃক পুত্রকে পরিত্যাগ করবার উপদেশ যিনি সামনা-সামনি দিতে পারেন, সেই বিদুরকে আর যাই হোক, ধর্মজ্ঞ বা ন্যায়নিষ্ঠ বললে সত্যের মহা অপলাপ ঘটবে।

পাণ্ডুর বনবিহার কালে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। তিনি একদিন একলা গভীর বনে ভ্রমণ করছিলেন এমন সময় দেখলেন এক মৃগযূথপতি সেখানে মৃগীর সঙ্গে সঙ্গমে আসক্ত রয়েছে। মৃগদম্পতী এত প্রমত্ত ছিল যে নিকটে কোনও মানুষের সঞ্চরণের কথা জানতে পারেনি। পাণ্ডু এই সুযোগে তাদের উপর পর পর পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। মৃগটি প্রায় তৎক্ষণাৎ মারা গেল। উত্তেজনার মুহূর্তে মৈথুনাসক্ত মৃগকে হত্যা করবার পর একটা তীব্র অনুশোচনা তাঁর অন্তরকে দগ্ধ করতে লাগল। তিনিও নিজে নিভৃত অরণ্যে দুই মহিষীর সঙ্গে কামাচারেই লিপ্ত ছিলেন

বহুকাল ধরে এবং সহজেই কল্পনা করতে পারলেন, তাঁর ক্ষেত্রে এরকমটা ঘটলে সেটা কতখানি নৃশংসতার পরিচায়ক হত। দুর্বার কামপরায়ণতার দৃষ্টান্ত তাঁর পিতৃপরিচয়ে পরিজ্ঞাত বিচিত্রবীর্যও রেখে গিয়েছিলেন। অতিরিক্ত রমণীসঙ্গের ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আর— এই প্রকার ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অপর এক কামজ সন্তান ব্যাসের ঔরসে তাঁর জন্ম হয়েছিল। নিজের উপর তাঁর কেমন যেন একটা ঘৃণার অভ্যুদয় হল। তিনি স্থির করলেন যে এর পর মোক্ষধর্ম আচরণ করবেন এবং প্রায় সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করবেন। তিনি নিজের যাবতীয় অলঙ্কারাদি ব্রাহ্মণদের দান করে তাঁদের হস্তিনায় ফিরে যেতে বললেন এবং এই নির্দেশ দিলেন যে তাঁরা যেন যথাস্থানে নিবেদন করেন যে মহারাজ পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, আর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবেননা। নিজের দুই স্ত্রীকেও তিনি হস্তিনায় ফিরে যাবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু, তাঁরা স্বামীকে পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত হলেননা। অতএব, দুই পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যত্যাগী পাণ্ডু বহুদিন ধরে হিমাচলের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করে কাল কাটাতে লাগলেন।

মহাভারতপুরাণে মৃগরূপধারী ঋষিপুত্রের সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে তা গল্পমাত্র। পুরাণকারেরা এই ভাবেই ভবিতব্য রচনা করতেন; কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মৃগবধের ট্র্যাজেডির ফলেই পাণ্ডু স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করেছিলেন।

এইবার পাণ্ডুর মনে হল তিনি অপুত্রক এবং পরলোকের ঋণ থেকে তাঁকে মুক্ত হতে হবে। তিনি সেখানকার তাপসদের জিজ্ঞাসা করলেন,—ব্যাসদেব যেমন বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে তাঁকে উৎপাদন করেছিলেন, সেইরকম তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অপত্য উৎপাদনের কোনও উপায় আছে কিনা। তাপসগণ কেবল এইটুকু বললেন যে, তাঁর সন্তানসম্ভাবনা সুনিশ্চিত; অতএব তিনি যেন পুত্রলাভে প্রযত্ন করেন। রাজা কুন্তীকে নিভৃতে ডেকে বললেন—যদিচ তিনি নিজে পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হবেননা তথাপি পুত্র উৎপাদনের জন্য তুল্যজাতি অথবা

অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতির কোনও পুরুষকে নিযুক্ত করতে তিনি আগ্রহ পোষণ করেন। অতএব কুন্তী যেন তাঁর নিয়োগানুসারে কোনও তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বীর্যে শীঘ্র অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হন। কুন্তী প্রথমটা নিয়োগকার্যে স্বীকৃত হলেননা এবং স্বামীর সহবাসই বিশেষ-ভাবে কামনা করলেন; কিন্তু পাণ্ডু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কুন্তী কেবল আপৎকাল বিবেচনা করেই নিয়োগের দ্বারা সন্তান উৎপাদনে রাজী হলেন। মাদ্রীও এতে আপত্তি করলেন না। তাঁরা কোন কোন পুরুষের নিয়োগে পর পর পাঁচটি পুত্রের জননী হয়েছিলেন, সেবিষয়ে আলোকপাত করা মহাভারতের কোনও উল্লেখ থেকে সম্ভব নয়। পুরাণ বলছেন, কুন্তী মহর্ষি দুর্বাসাকে সেবায় সন্তুষ্ট করে এমন একটি আকর্ষণী মন্ত্র বর পেয়েছিলেন, যা উচ্চারণ করলেই তাঁর অভীষ্ট যে কোনও দেবতা তাঁর বশবর্তী হতেন। এই মন্ত্রেই তিনি অনূঢ়া অবস্থায় সূর্যের ঔরসে কর্ণকে উৎপাদন করেছিলেন। বিবাহিত জীবনে তিনি এই মন্ত্রদ্বারাই ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের ঔরসে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে লাভ করেন। কুন্তীর পুত্রলাভের পর মাদ্রী পুত্রলাভে উৎসুক হন; কিন্তু আকর্ষণী মন্ত্রের জন্য তিনি সপত্নী কুন্তীকে অনুরোধ করতে দ্বিধা করতে লাগলেন, পাছে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। তিনি স্বামীর শরণাপন্ন হলেন। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে যে কোনও দেবতাকে আহবান করতে বললেন। চতুর মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করায় একসঙ্গে দুটি পুত্র লাভ করলেন। এঁরাই কনিষ্ঠতম পাণ্ডব নকুল ও সহদেব। সপত্নীজনিত ঈর্ষায় কুন্তী দ্বিতীয়বার গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য কোনও দেবতাকে আহবান করতে রাজী হলেননা। এই পঞ্চপুত্র উৎপাদিত হবার পর পাণ্ডু একদিন মাদ্রীর সঙ্গে একাকী থাকবার সময় অকস্মাৎ কামাকুল হয়ে তাঁর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলেন; ঋষিকুমাররূপী মৃগ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে মৈথুনে প্রবৃত্ত হবামাত্র তাঁরও মৃত্যু ঘটবে এবং সেই শাপ অনুসারে সেই মুহূর্তেই তাঁর মৃত্যু হল। এই কাহিনী যে কাল্পনিক এটা বলাই

বাহুল্য। কিন্তু, দেবতাদের নিয়োগে পঞ্চপুত্রের উৎপাদনও সমান-ভাবেই অলীক ও অসম্ভব। আসলে, পাণ্ডবপক্ষে সমস্ত দৈবঘটনাকে একত্রিত করা হয়েছে, যাতে তাঁদের দিয়ে চমকপ্রদ অলৌকিক কার্যাবলী করিয়ে নেওয়া যায়। অপরদিকে কৌরব পক্ষে সেরকম কিছুই ঘটানো হয়নি, যাতে তাঁরা প্রতিপদেই হীন প্রতিপন্ন হতে থাকেন। মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ অলৌকিক ঘটনার সমারোহ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এইসব অবিশ্বাস্য ব্যাপার থেকে যেসব আদর্শবাদ বিস্তার করা হয়েছে তাদের সমর্থনে যেমন যুক্তির অভাব তেমনি চিন্তারও প্রবল অভাব দেখা গেছে।

প্রকৃতপক্ষে, বহুদিন থেকেই পাণ্ডু নিজেকে ক্ষয় করে আনছিলেন এবং অবশেষে মৃত্যু ছাড়া আর তাঁর গতি ছিলনা। তিনি শতশৃঙ্গ পর্বতে পঞ্চপুত্র লাভের পর মৃত্যু কামনাই করেছিলেন এবং মৃত্যু তাঁকে মুক্তিই দিয়ে গেল। মাদ্রীও স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঘাতী হলেন। সেই অরণ্য অঞ্চলে কুন্তী একান্ত ভয়াবহ জীবন যাপন করতে লাগলেন। পাণ্ডু বহু বৎসর প্রবাসে কাটিয়েছিলেন। পাঁচটি পুত্রের জন্ম হতেই তো অন্ততঃ দশ, পোনেরো বৎসর লেগে যাবার কথা। তার পরে তারা ধীরে ধীরে বালক হয়ে উঠেছিল। এতদিন পর্যন্ত হস্তিনা অরাজক অবস্থায় ছিল। অবশ্য, শাসন, শৃঙ্খলা যথাযথ রক্ষিত হয়েছিল; কিন্তু রাজরূপে কেহই হস্তিনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হননি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রবাসী পাণ্ডুর জীবনে যে কি ঘটে চলেছিল, তার সংবাদটুকুও হস্তিনায় তার আত্মীয়বর্গ রাখেননি। তাঁর প্রথম পুত্রের জন্মসংবাদ অবশ্য নিশ্চয়ই তাঁরা পেয়েছিলেন, তার প্রমাণ আগেই দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর যখন মৃত্যু হোলো, তখন শতশৃঙ্গ পর্বতের ব্রাহ্মণগণ তাঁদের দেহ বিধিসম্মতভাবে সেখানেই দগ্ধ করলেন না। তাঁরা বিচার করে দেখলেন, এই রাজা তাঁদের শরণাগত হলেও, পারলৌকিক কার্যটা হস্তিনাতে করাই সঙ্গত, কেননা, শবদেহ দর্শন করলে,—এটা প্রমাণ হবে যে রাজা পাণ্ডু ও রাজ্ঞী মাদ্রী যথার্থ ই

পরলোকগমন করেছেন। এটি রাজকীয় মৃত্যু ; অতএব প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। তাঁরা পঞ্চবালকের জন্মের আলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করে, তাদের সঙ্গে দুটি মৃত কলেবর হস্তিনায় এনে সর্বসমক্ষে ভীষ্মের হাতে সমর্পণ করলেন। সেখানে ভীষ্ম ছাড়া, দুর্যোধনাদি রাজপুত্রগণ, সোমদত্ত, বাহলীক, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সত্যবতী এবং পাণ্ডুজননী অম্বালিকা ও অন্যান্য রাজপত্নীরা উপস্থিত ছিলেন। মৃতদেহদুটি রক্ষিত হবার পর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে প্রেতকার্য সমাধা করতে আদেশ দিলেন। বিদুর সব আয়োজন প্রস্তুত করে গঙ্গাতীরে এক পবিত্র প্রদেশে সৎকারের অভিযান শুরু করলেন ;---তার সঙ্গে রইলেন ভীমসেন। হস্তিনার সমগ্র রাজপুরুষ ও বহু অধিবাসী শবের অনুগমন করলেন। বালক পাণ্ডবেরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহসহ শিবিকাবাহিদের সঙ্গে চললেন। বিধবা কুন্তী এবং পুত্রহারা রাজমাতা অম্বালিকাও প্রেতকার্যে উপস্থিত ছিলেন। দাহকার্য সমাপ্ত হলে হস্তিনার নগরবাসিরা দশদিন পর্যন্ত শোকপালন করলেন। যথা সময়ে পাণ্ডু ও তাঁর পত্নীর শ্রাদ্ধকার্যও সমাপ্ত হয়ে গেল।

পাণ্ডুরাজত্বের এইভাবে অবসান ঘটলে রাজপরিবারে প্রায় প্রকাশ্যেই গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়ে গেল। রাজমাতা সত্যবতী অল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারলেন যে অতঃপর আত্মসম্মান বজায় রেখে চলা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে। ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র উভয়ের দুর্বলতাই তিনি জানতেন এবং বিদুরের কুটিলতাও তাঁর অবিদিত ছিলনা। চারদিক থেকে একটা দুর্নীতি রাজপরিবারকে কলুষিত করছে,—তাও তিনি প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁর পক্ষে এইবার সংসার পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। পুত্র ব্যাসদেবও তাঁকে সেই পরামর্শই প্রদান করলেন। তখন তিনি প্রাণাধিক প্রিয় দুই পুত্রবধূকে ডেকে সব কথাই আলোচনা করে বললেন—তাঁদের পক্ষেও এর পর রাজ অন্তঃপুরে নানা ব্যাপারে জড়িত না থেকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই উচিত পন্থা হবে। অম্বিকা এবং অম্বালিকা পাণ্ডুর প্রস্থানের পর থেকে রাজ পরিবারের দূষিত

আবহাওয়া লক্ষ্য করছিলেন; তাঁদেরও আর সংসারে থাকবার বাসনা ছিলনা। তাঁরাও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন; অল্পকালের মধ্যেই একদিন রাজমাতা দেবী সত্যবতী দুই পুত্রবধূকে নিয়ে ভীষ্মের কাছে বিদায় গ্রহণ করে নীরবে বনে প্রস্থান করলেন। সেইখানেই তাঁদের বাকি জীবন অতিবাহিত হল। দুর্বলচিত্ত ভীষ্ম যদি এঁদের অনুগমন করতেন তাহলে সেটা তাঁর পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকর হত; কিন্তু সে সাহসও তাঁর ছিলনা। তিনি কেবলমাত্র মহাদেবীদের মহাযাত্রার দর্শক হয়ে রইলেন,—একটি কথাও বললেন না। মহাভারতও এই বনগামিনীদের সম্পর্কে আর একটি কথাও বলেননি।

সত্যবতীকে মহাভারত একান্ত সাধারণভাবে স্থাপিত করলেও এই দৃঢ়চিত্ত মহিলার যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত। মহারাজ শান্তনুর পরিবারে প্রবেশ করবার পর রাণী সত্যবতী দৃঢ়হাতে সমস্ত শাসনভারই গ্রহণ করেছিলেন এবং দুটি পুত্রের শোকভারও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু, কখনই তিনি ভেঙে পড়েননি। ভীষ্মকে বা ব্যাসদেবকে সব ব্যাপারে স্মরণ করলেও আসলে সমস্ত ঘটনার নায়িকা ছিলেন তিনিই। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় পাণ্ডুরাজের দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্বেও হস্তিনার সমাজ জীবন বা শাসন ব্যবস্থায় এতটুকু বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়নি। তাঁর নিজের পুত্র ব্যাসকেও তিনি পুত্রবধূদের নিয়োগসংক্রান্ত অসাফল্যের পর থেকে আদৌ সুনজরে দেখেননি। ইচ্ছাপূর্বক কুৎসিৎ আকার ধারণ করে তাঁর পুত্রবধূদের ধর্ষণ করাকে তিনি নিয়োগবিধির চরম অপমান বলে গণ্য করেছিলেন; এবং এইরকম কাজকে প্রত্যক্ষভাবে মাতার প্রতি অপমান বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের উপর তাঁর এই পুত্রের প্রভাব এবং চক্রান্ত প্রবণতার কথা স্মরণ করে তাঁকেও তিনি পরিহার করে চলতেন। বোধ করি তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই পুত্র তাঁর পরিবারের পক্ষে হিতকারী হবেন না। কিন্তু, তিনি তাঁকেও কোনও কারণে ক্ষুব্ধ বোধ করতে দেননি। অপর পক্ষে, ধীবর পালিতা মাতার প্রতি ব্যাস যে আদৌ শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন না, সেটা তাঁর ব্যবহারেও বেশ

বোঝা যায়, কারণ মহাভারতে ব্যাস এবং সত্যবতীর মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠতার আভাসটুকু পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ভীষ্মকেও তিনি চিনতেন। যে ব্যক্তি প্রৌঢ় কামাসক্ত পিতার অযৌক্তিক প্রণয়ে প্রশ্রয় দেয় এবং নিজের সিংহাসনের দাবীকে পরিত্যাগ করে,—সে যে কোনও বিষয়েই আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, তা সত্যবতী ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু, তিনি কখনো তা প্রকাশ করেননি। তবে তাঁর জন্যই যে ভীষ্মের এই আত্মত্যাগ, তাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন। অতএব, এই দুর্বলপ্রকৃতির পুরুষকে যথোচিত সম্মান প্রদান করেও তিনি নিজে সমস্ত পরিস্থিতির সমাধান করতেন এবং উপায়ও নির্ধারণ করতেন। মহাভারতের সমস্ত উল্লেখে দেখা যায়, যখনই যে কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তখনই দেবী সত্যবতী প্রধানতঃ ভীষ্মের সঙ্গে এবং কদাচিৎ ব্যাসদেবের সঙ্গে, আলোচনা করেছেন। কিন্তু, সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেছেন এবং তাকে কার্যকরও করেছেন নিজের প্রচেষ্টায়। কেবলমাত্র তিনি যখন দেখলেন কৌরবসভা বিদুর প্রভৃতিকে নিয়ে যে পরিণতির দিকে চলছে, তাকে রোধ করা তাঁর অসাধ্য, তখন তিনি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে এতটুকু দ্বিধা করলেন না। এই মহীয়সী মহিলা এইভাবে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত রেখে যথোচিত সম্মান সহকারে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মহাভারতের ইতিহাসে তাঁর মত আর একটি নারীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে না।

এর পরে আরম্ভ হচ্ছে কুরুপাণ্ডবের বাল্য কাহিনী। বালকদের বেদোক্ত সংস্কার সম্পন্ন হল; সেই সঙ্গে চলল শরীরচর্চা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা। এরই মধ্যে কিন্তু রাজপুরীতে দুটি প্রচ্ছন্ন শিবির স্থাপিত হয়ে গেছে। একদল আর এক দলকে সন্দেহের চোখে দেখে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। অবস্থাটা যখন এইরকম, তখন একদিন গঙ্গাতীরে রাজপুত্রদের জলবিহারের পরিকল্পনা হল। সেখানে বড় বড় তাঁবু পড়ল, উদ্যান ভবন গড়ে উঠল, নানারকম ভোজ্যদ্রব্য পাঠানো হল,—রীতিমত একটি বড়দরের পিকনিকের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে উঠল।

পাণ্ডবেরা এবং কৌরবেরা কেউ এলেন হাতিতে, কেউ এলেন রথে। লোকজনে গঙ্গাতীর গিসগিস্ করতে লাগল। বোধ হয়, তাঁরা বেশ কয়েকদিন এইস্থানে আমোদ-প্রমোদে কাটিয়েছিলেন, নইলে এত আড়ম্বর এবং ঘরবাড়ি তৈরি হত না। রাজকুমারেরা একত্রে আহার করতেন। তখন বেশ মজা করে এ ওর মুখে মিষ্টান্ন প্রদান করতেন। হাসি খুশি, নানান ফুর্তিতে দিন কেটে যেত। অবশেষে প্রমোদের শেষ দিনে একটি ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠল। সেদিনও সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছে, সবাই মিলে মিষ্টান্ন গ্রহণ করছে; দুর্যোধন ভীমের কাছে উঠে গিয়ে সকৌতুকে তার মুখে একটা মিষ্টান্ন পুরে দিল। ভীমসেন পরম আনন্দে সেই মিষ্টান্নের সবটাই গলধঃকরণ করল। কিন্তু, তাতে ছিল তীব্র বিষ—যে বিষের ক্রিয়ায় ঘুম আসে এবং সে ঘুম আর ভাঙে না। এখানে মনে সন্দেহ জাগে, বালক দুর্যোধন কি সত্যিই জানত যে ওই মিষ্টান্নে তীব্র বিষ মেশানো আছে এবং বালকের বিদ্বেষ কি এতটা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠেছিল যে, সে বিষ প্রয়োগে নিঃসঙ্কোচে হত্যায় প্রণোদিত হয়েছিল? বোধ করি তার পক্ষে এতটা সম্ভব ছিল না। অন্য কেউ তার হাতে ওই বিষাক্ত মিষ্টান্নটি তুলে দিয়েছিল ভীমকে দেবার উদ্দেশ্যে এবং দুর্যোধন নিঃসন্দেহেই কেবল কৌতুকের বশেই সেটি ভীমের মুখে নিক্ষেপ করেছিল। যাই হোক, ব্যাপারটা ঘটানো হয়েছিল তার হাত দিয়েই। খাওয়া দাওয়ার পর যে যেখানে পারল গড়িয়ে নিল। দুর্যোধন ভীমকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে একটা নিভৃত জায়গায় শুয়ে পড়ল। এখানেও সে অপরের নির্দেশ পালন করেছিল বলে মনে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিষের ক্রিয়া দেখা দিল। ভীম মরণ ঘুমে 'অচেতন হয়ে পড়ল। ওদিকে রাজকুমারদের বিশ্রাম শেষ হতেই সবাইকার যাবার তাড়া পড়ে গেল। সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে, সবার অগোচরে ভীমকে হাত পা বেঁধে যারা একেবারে গঙ্গায় ফেলে দিতে চেষ্টা করেছিল, তারাই ছিল এই চক্রান্তের নায়ক। কিন্তু সম্ভবতঃ, সেখানকার নাগ জাতীয় কিছু

অধিবাসী হঠাৎ এসে পড়ায়, সেটা সার্থক হতে পারেনি। এই নাগ জাতীয় লোকেরা সর্পবিদ্যা জানত এবং বিষবিদ্যাও তাদের অধিগত ছিল। অগত্যা অচেতন ভীমকে ঝোপের আড়ালে ফেলে রেখেই তারা গোপনে সরে পড়ল। মহাভারতে আছে,—দুর্যোধন নিজে এই কাজটি করেছিল। সবদিক ভেবে দেখলে এটিও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। যদি চ দুর্যোধন ভীমের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল তথাপি সে তখন বালক মাত্র, সে কখনই একটি পাকা অপরাধী হয়ে ওঠেনি এবং এমন চাতুর্যও অর্জন করেনি, যে আর একটি সমান স্বাস্থ্যবান ছেলেকে সে নিপুণভাবে কাঁধে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে গঙ্গায় ফেলে দিতে সক্ষম হবে। আসলে এটাও চক্রান্তকারীদেরই কাজ, যারা পাণ্ডবদের রাজত্ব লাভকে সমর্থন করত না। সমস্ত ষড়যন্ত্রটা তারাই পরিকল্পনা করেছিল এবং কাজেও পরিণত করতে চেষ্টা করেছিল।

যাই হোক, রাজকুমারগণ তো মহাসমারোহে হস্তিনায় ফিরে এলেন, কিন্তু কোথায় ভীমসেন ? তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না! ব্যাপারটা কিন্তু গোপনে রাখা হল। কুন্তী শুধু বিদুরের কাছে এসে জানালেন যে সবাইকার মাঝখান থেকে ভীম নিখোঁজ হয়েছে। তিনি স্পষ্টই বিদুরকে বললেন যে—দুর্যোধন ভীমকে দেখতে পাবে না, এর মূলে নিশ্চয়ই তার কোনও যড়যন্ত্র রয়েছে। বিদুর কুন্তীকে এ নিয়ে কোনও গোলমাল করতে বারণ করলেন, কেননা তাহলে অনর্থ দেখা দিতে পারে। তাঁরা চুপি চুপি ভীমের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

ওদিকে নাগজাতীয় লোকেরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। রাজ-পুত্রেরা চলে যেতেই তারা ঝোপ থেকে ভীমকে বের করে আনল। তাদের ঐকান্তিক চিকিৎসায় আটদিনের দিন ভীম সুস্থ হয়ে উঠল; তারপর গোপনে হস্তিনায় এসে সবাইকার সঙ্গে মিলিত হল।

পুরাণকার বলেছেন অচেতন ভীম জলমগ্ন হয়ে একেবারে নাগলোকে চলে গিয়েছিল। সেখানে সে সুস্থ হয়ে উঠলে নাগরাজ

বাসুকি তাকে প্রচুর অমৃত পান করিয়ে দেহে বল সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু এটা পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। বোধ করি নাগলোক বলতে এখানে নাগ জাতীয় এক সম্প্রদায় বোঝাচ্ছে যারা এই রকম নদীর ধারে বনাঞ্চলে বাস করত। ভীম হত্যার ষড়যন্ত্রটি বেশ বুঝে শুনেই করা হয়েছিল। ভীমকে সর্ব প্রথম হত্যার জন্য বেছে নেবার কারণ এই যে, সেই ছিল সবচেয়ে বলশালী। তাকে সরালে পাণ্ডবেরা বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়ত, তখন অন্যদের শেষ করতে বেশী বেগ পেতে হত না। যাই হোক, ভীম সুস্থ হয়ে ফিরে এসে, সব ব্যাপার মা-ভাইদের কাছে বর্ণনা করল এবং তারপর থেকে পাণ্ডবেরা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে লাগল। এইখানে কৌশলী কৌরবদের প্রথম ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটল।

পাণ্ডব এবং কৌরবেরা প্রথম ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল কৃপ নামক এক ব্রাহ্মণের কাছে। ইনি ছিলেন শরদ্বান নামক এক ঋষির সন্তান। ঋষি ধনুর্বিদ্যার চর্চা করেছিলেন বিশেষভাবে। তাঁর এক কন্যাও ছিল—কৃপী। কৃপ ও কৃপী উভয়েই মহারাজ শান্তনুর আশ্রয়ে মানুষ হয়েছিলেন। পিতা শরদ্বান নিজেই কৃপকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কৃপ যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম হলেও ভীষ্ম ছেলেদের জন্য আরও ভাল একজন গুরু চাইছিলেন। এইবার রাজকুলে প্রবেশ করলেন স্বনামধন্য দ্রোণাচার্য, যিনি কেবল কুমারদের শিক্ষকই ছিলেন না, ভীষ্ম বিদুরের মত মন্ত্রণাদাতাও ছিলেন। মহাভারতের ইতিহাসে ইনি অসমান্য প্রভাব রেখে গেছেন। দ্রোণ ছিলেন ভরদ্বাজ নামক এক ব্রাহ্মণের সন্তান। ইনিও কিছুটা বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেই ধনুর্বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন অগ্নিবেশ নামক এক ব্রাহ্মণ।

দ্রোণ এবং পাঞ্চালরাজ পৃষতের পুত্র দ্রুপদ (যজ্ঞসেন) এক সঙ্গেই মানুষ হচ্ছিলেন, কারণ রাজা পৃষত ছিলেন দ্রোণের পিতৃসখা। এঁরা এক সঙ্গেই খেলাধুলো করতেন। দ্রোণ বড় হয়ে কৃপের ভগ্নী কৃপীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র পুত্র হয়েছিল।

ইনিই মহাভারতের অগ্রগণ্যবীর অশ্বত্থামা। পিতার মৃত্যুর পর দ্রোণ অত্যন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে পৈতৃক আশ্রমে বাস করছিলেন। একদিন শিশু অশ্বত্থামা ধনী সন্তানদের দুধ খেতে দেখে বায়না ধরল, তাকেও দুধ দিতে হবে ; কিন্তু অতি দরিদ্র দ্রোণের দুধ দেবার সঙ্গতিটুকুও ছিল না। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রইলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, সেই ধনী সন্তানেরা খানিকটা চালের গুঁড়ো জল দিয়ে মিশিয়ে অশ্বত্থামার হাতে দিয়ে বললে—“এই নে,—দুধ খা”। অশ্বত্থামা তাই খেয়ে পরমানন্দে নৃত্য করতে লাগল। এই উপহাস দ্রোণের অন্তরে কঠিন আঘাত করল। তিনি স্মরণ করলেন,—তাঁর বাল্যবন্ধু দ্রুপদ বলেছিলেন, তিনি রাজা হলে দ্রোণকে ভোগ এবং সম্পত্তি প্রদান করবেন। সেই কথার ওপর নির্ভর করে তিনি দ্রুপদের কাছে এসে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন। কিন্তু, দ্রুপদ তাঁকে কঠিন তিরস্কার করে বললেন যে, বাল্যাবস্থায় অনেকেই নির্বোধের মত অনেক কথা বলে থাকে, তা বলে, পরবর্তীকালে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। অতএব, দ্রোণকে তিনি একরাত্রির মত ভোজন প্রদান করতে পারেন এর বেশী আর কিছু দিতে পারেন না। অপমানিত দ্রোণ নিদারুণ ক্রোধ নিয়ে ফিরে এলেন। দুরন্ত প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জেগে রইল।

তারপরে তিনি কৌশলক্রমে ভীষ্মের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ভীষ্ম তাঁর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার কথা আগে থেকেই শুনেছিলেন। তাঁকে তিনি আনন্দের সঙ্গেই রাজপুত্রদের গুরুরূপে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ভীষ্মকে দিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে রাজপুত্রগণ উত্তমরূপে অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে তিনি তাদের দিয়ে দ্রুপদকে পরাজিত করিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। শিক্ষাদানের জন্য দ্রোণ প্রচুর অর্থ পারিশ্রমিক পেতে লাগলেন এবং সুন্দর একটি বাড়িও তাঁকে বাস করবার জন্য দেওয়া হল। এর সঙ্গে ছিল প্রচুর উৎকৃষ্ট জমি যাতে উত্তম কৃষিকার্য সম্পন্ন করা যেত। দ্রোণ শুধু ধনুর্বিদ্যাই নয়, গদাযুদ্ধ, অসিচর্যা, তোমর, প্রাস এবং শক্তি প্রভৃতির

প্রয়োগ ও সঙ্কীর্ণ যুদ্ধের কৌশল,—সবই নিপুণভাবে শেখাতে লাগলেন।

মহাভারত বলছেন, কর্ণও মাঝে মাঝে দ্রোণের কাছে আসতেন, কিন্তু বোধ করি দ্রোণ তাঁকে কোনও শিক্ষাই প্রদান করেন নি। কর্ণ শুধু তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী লক্ষ্য করে যেতেন মাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কর্ণ বহুকাল থেকেই পাণ্ডব ও কৌরবদের পরিচিত ছিলেন এবং এঁরাও তাঁর শৌর্যবীর্যের পরিচয় সম্বন্ধে অনেকদিন থেকেই অবগত ছিলেন। এ বিষয়ে কুন্তীর কি কোনও হাত ছিল? তিনিই কি সূত অধিরথকে গোপনে উপদেশ দিয়েছিলেন যে কর্ণ যেন দ্রোণের শিষ্যত্ব গ্রহণেরও চেষ্টা করেন? কিন্তু অধিরথ নিজেও ধৃতরাষ্ট্রের সখা ছিলেন। সেই সুযোগে কর্ণকে তিনি নিজেও কৌরবদের শিক্ষাগুরুর কাছে পাঠাতে পারতেন। অধিরথ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, যদিচ সূত হবার দরুণ তাঁকে একটু দূরে দূরেই থাকতে হত। বোধ করি অধিরথ ধৃতরাষ্ট্রের কাছেও কর্ণ সম্বন্ধে কিছু বলে থাকলে তাকে রাধা গর্ভজাত পুত্র বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি যে অপর কেনও রমণীর পুত্র তা কদাচ ব্যক্ত করেননি। পিতা অধিরথ ধৃতরাষ্ট্রের সখা ছিলেন বলেই বোধ হয় কর্ণও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের অধিক পছন্দ করতেন। সূত জাতীয় অধিরথ কদাচ কর্ণকে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনে উৎসাহিত করতেন না এবং কুন্তী তো পুত্রকে হীনকুলে উৎসর্গ করেছিলেন যাতে সে কোনোপ্রকারে অস্ত্রবিদ্যার প্রতি আসক্ত না হয়।

যাই হোক, কর্ণ অপর গুরুর সহায়তায় নিজেকে সুযোগ্য করে তুলেছিলেন; দ্রোণের কাছ থেকে নেবার তাঁর বিশেষ কিছুই ছিলনা। গোড়া থেকেই দ্রোণ কর্ণের প্রতি একটা বিরূপতা পোষণ করতেন। কর্ণও তাঁর কাছে নত হননি, এবং তিনিও তাঁকে পছন্দ করতেন না। অর্জুনের প্রতি যে আচার্যের বিশেষ কৃপা আছে তাও তিনি জানতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই চতুর ব্রাহ্মণ অর্থলোভী এবং উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও কাজ করেন না; তাই তিনিও তাঁর মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের

পরিমাপ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। নিষাদ বংশীয় একলব্য যে দ্রোণের কাছেই পূর্বে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; তা না হলে তিনি ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের রীতিনীতি কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারতেন না। সে বোধ হয় সেই সময়ে, যখন দ্রোণ একান্তই দরিদ্র ছিলেন এবং প্রকৃতই ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করতেন। কিন্তু, যখন তিনি কৌরবদের অস্ত্রগুরু হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন তখন একলব্যকে শিষ্য বলে স্বীকার করাটা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করলেন না, কারণ তিনি ছিলেন অস্ত্র প্রয়োগে অর্জুন অপেক্ষা সমধিক পারদর্শী। তাঁকে স্বীকার করলে রাজন্যবর্গ অসন্তুষ্ট হতে পারেন, তাই তিনি শিষ্য একলব্যকে একেবারে অস্বীকার করলেন। ব্যাপারটা একলব্যের বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি। গুরু যাতে নিন্দিত হন, সেই চেষ্টা একলব্য করলেন না। কিন্তু, তাঁর অঙ্গুষ্ঠ ছেদনের বৃত্তান্ত কতখানি সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ এই চেষ্টায় রক্তপাতে তাঁর মৃত্যু হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। একজন নিষাদরাজ একলব্য পরে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান। ইনি এবং সেই ব্যক্তি এক হওয়াই সম্ভব। বোধ হয়, দ্রোণ একলব্যকে কোনও কূট উপায়ে কৌরবদের সংশ্রব থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। তাঁর এই রকম কৌশলপরায়ণতার দৃষ্টান্ত আছে এই শিক্ষারই ক্ষেত্রে। স্ফীত পারিশ্রমিক ও সর্বোত্তম রাজদাক্ষিণ্য লাভ করেও তিনি গোপনে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাকে অর্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

বহুদিন শিক্ষাদানের পর রাজকুমারদের কৃতবিদ্য বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হল। এই উপলক্ষ্যে একটা কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করা হল, যাতে সর্বসাধারণ তাদের নৈপুণ্যে আস্থা স্থাপন করতে পারেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য একটি রঙ্গভূমি প্রস্তুত করা হল। অভ্যাগতদের মধ্যে রাজ অন্তঃপুরিকারাও ছিলেন। শুভ্রবেশী আচার্য দ্রোণ পুত্রকে নিয়ে যথোচিত মাঙ্গলিক ক্রিয়াদির পর রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন। রাজকুমারেরা সকলেই স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে

কৃতিত্ব অর্জন করলেন; তবে অর্জুন যে প্রশংসা অনেকখানি বেশী কুড়োলেন তার বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে আছে। এই কৃত্রিম যুদ্ধেই ভীম-দুর্যোধনের বিদ্বেষভাবটা কিছু অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেল এবং ধৃতরাষ্ট্র কাষ্ঠহাসি হেসে পাণ্ডবদের অস্ত্র নৈপুণ্যের প্রশংসা করলেন।

অস্ত্র কৌশল শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় কর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন। তিনি একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই দ্রোণ এবং কৃপাচার্যের প্রতি প্রণামের অভিনয় করলেন। তারপর, তিনি ঠিক অর্জুনের মতই ধনুর্বিদ্যার সব কৌশলই প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হলেন। মহাভারতে কর্ণের অস্ত্র শিক্ষা নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত তা পুরাণের উপযুক্ত কাহিনী মাত্র। পরশুরাম নামক কোনও গুরুর কাছে তিনি যদি অস্ত্র শিক্ষা করে থাকেন, তাহলে তিনি সেই সুপ্রাচীন পরশুরাম হতে পারেন না, কেননা তিনি বহু পূর্ব যুগের লোক। তবে, এটা ঠিক যে তিনি রীতিমত অর্থ ব্যয় করেই অস্ত্র সাধনা করেছিলেন এবং ব্যাপারটা অধিরথের অগোচরে হয়নি, কারণ অর্থ তিনিই ব্যয় করেছিলেন। যে গুরু তাঁকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনিও তাঁকে সূতপুত্র জেনেই শিক্ষা দিয়েছিলেন; কারণ অর্থে সকলকেই বশীভূত করা যায়। কর্ণের শিক্ষা থেকে এটাও জানা যায় যে সেকালে দ্রোণের তুল্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি আরও অনেক ছিলেন, চেষ্টা করলে তাঁদের পাওয়া সুদুর্লভ ছিল না। কিন্তু কর্ণের ক্ষেত্রে এই চেষ্টা কে করেছিলেন সেটা অনুমান করা শক্ত। কর্ণ নিজে এ বিষয়ে কোনও সংবাদ কারুর গোচর করেন নি। দুর্যোধন এবং তার পক্ষ কর্ণকে অতিশয় সমাদর প্রদর্শন করলেন এবং লোকে অজস্র সাধুবাদ প্রদান করতে লাগল। কিন্তু সহসা কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কামনা প্রকাশ করলেন, কেননা অর্জুনের প্রশংসার আতিশয্য তাঁর কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়েছিল। এ নিয়ে অনেক বচসা হল, যার ফলে এরই মধ্যে পাণ্ডব এবং কৌরব দুই পক্ষ ভাগ হয়ে গেছে দেখা গেল। কৌরব

পক্ষ কর্ণের দিকে এবং অপরপক্ষ—দ্রোণ কৃপ এবং ভীষ্ম সমেত অর্জুনের দিকে দাঁড়ালেন। এমন কি মহিলারাও দুই পক্ষে ভাগ হয়ে গেলেন। এই সময় কুন্তীকে নিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় যিনি তার পরিচর্যা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন, তিনি হচ্ছেন- বিদুর। তার আদেশেই পরিচারিকারা কুন্তীর মস্তকে জল সেচন করে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনেন। ঠিক এই সময় বিদুর একজন বিশিষ্ট অন্তঃপুরিকার পরিচর্যায় এগিয়ে এলেন কেন সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়। তিনিই কৌরব পরিবারে কুন্তীর একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং আকারে, ইঙ্গিতে কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত হয়তো তার কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু সেটি সত্য হলে তিনি তখনই কর্ণকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন। তা তিনি করেননি, কারণ তাহলে ভেদনীতি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হত না। অন্তঃপুর-প্রধানা গান্ধারী কেন কুন্তীর সেবায় এগিয়ে এলেন না সেটাও বিবেচ্য। তবে কি সেই মুহূর্তে তিনিও পক্ষপাতিত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি? যাই হোক, কুন্তী সামলে উঠলেন। ওদিকে কৃপাচার্য তৎক্ষণে একটি মোক্ষম চাল চেলেছেন। তিনি কর্ণকে বললেন—"বাপু হে, তুমি যাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছ, তিনি মহারাজ পাণ্ডুর সন্তান এবং রাজপুত্র। তোমার পরিচয় উদ্ঘাটিত করে বল তুমি কোন রাজ বংশের সন্তান, তোমার প্রকৃত পরিচয় না জানলে কোনও রাজকুমার একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না।" কর্ণ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। তিনি কোনও কথা না বলে মাথা নীচু করে রইলেন। তখন দুর্যোধন এগিয়ে এসে বললেন,—যিনি সৎকুলে সমুদ্ভূত, বীর এবং সৈন্য চালনায় সমর্থ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়; তথাপি যদি অর্জুন রাজা ভিন্ন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ না করেন, তাহলে এই মুহূর্তেই তিনি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন এবং দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে সখ্যতা সংস্থাপন করলেন। কর্ণ এই অঙ্গরাজ্যেই

মানুষ হয়েছিলেন ; সুতরাং অধিরথের আশ্রয়ে চম্পা নগরী অনেক আগে থেকেই তাঁর অধিকারে ছিল। এখন তিনি গোটা অঙ্গরাজ্যেরই অধীশ্বর হলেন। কিন্তু রাজা হলেও ক্ষত্রিয় বলে তিনি স্বীকৃত হলেন না, সূত হিসাবেই তাঁর পরিচয় রয়ে গেল।

এখানে ছটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। একটি এই যে, সূতপুত্রকে দুর্যোধন সৎকুলজাত বলে স্বীকার করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথের পুত্রকে তিনি দুস্কুলজাত বলে মনে করেননি। এ ছাড়া যিনি বিধি অনুসারে পুত্র বলে পরিগণিত তিনিই সংকুলজাত। এইটি হচ্ছে পরিচয়ের মাপকাঠি। অপর বিষয়টি হচ্ছে এই যে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করবার কোনও অধিকারই দুর্যোধনের ছিলনা, তিনি সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করলেন, অথচ কেউ তাঁকে বাধা দিল না। এই কাজে যদি কারুর অধিকার থাকত তাহলে তিনি হয় ধৃতরাষ্ট্র নতুবা ভীষ্ম। এই দুজনের কেউই দুর্যোধনকে বাধা দিলেন না। অপরদিকে পাণ্ডুপক্ষীয় বিদুরও একটি কথা বললেন না। এতে এই বোঝা যাচ্ছে যে দুর্যোধনের দিকেই পাল্লা ভারী ছিল এবং তাঁরা এমন প্রভাব স্থাপন করেছিলেন যাতে কেউই পাণ্ডুপক্ষের হয়ে সোচ্চারভাবে কিছু করতে না পারেন। অথচ পাণ্ডুর মৃত্যুকালে কৌরবসভায় পাণ্ডুর প্রভাবই বেশী ছিল এবং সেই কারণেই যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচভাই মর্যাদার সঙ্গে রাজপুত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিভাবে কৌরবেরা ভিতরে ভিতরে অধিকতর প্রভাব সঞ্চয় করলেন তা ঠিক বোঝা যায় না, বোধ করি পাণ্ডুর পরে স্বাভাবিকভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অথবা এও হতে পারে যে পাণ্ডুপুত্রদের রহস্যময় উৎপত্তি বহু প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকেই কুরুদের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। দুর্যোধনকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করাটা বহু প্রজা এবং সামন্ত রাজন্যবর্গের অভিপ্রেত ছিলনা। যার ফলে, আমরা দেখি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অধিকাংশ নরপতি কুরুপক্ষে যোগদান করেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, যে

বিধি অনুসারে হস্তিনায় জাত ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত পুত্রই রাজা হবার উপযুক্ত।

যাই হোক্, কুরুপক্ষের এই দুর্বলতার সুযোগে দুর্যোধন ক্ষমতায় আসার আর একটি সোপান পেয়ে গেলেন তিনি বুঝে নিলেন, এঁরা কেউই, তেমন ক্ষমতালোভী নন এবং এঁদের তুচ্ছ করে রাজ্য অধিকার করতে তাঁকে খুব বেশী বেগ পেতে হবেনা।

কর্ণের অভিষেক যখন শেষ হয়েছে তখন তাঁর পিতা সূত অধিরথ ঘর্মাক্ত কলেবরে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন। একক যুদ্ধের খবরে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন পাছে বিপদ ঘটে। কর্ণ পিতাকে দেখবামাত্র শরাসন পরিত্যাগ করে তাঁকে প্রণাম করলেন। সূত অধিরথ তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করে আলিঙ্গন করলেন। ভীম ব্যাপারটা দেখে কর্ণের প্রতি খুব কঠোর বিদ্রূপ করে বললেন যে যুদ্ধ করার চেয়ে তাঁর পক্ষে বল্গা গ্রহণ করাই উচিত কাজ হবে। এর উত্তর দিলেন দুর্যোধন। তিনি ভীমকে বললেন—প্রিয়দর্শন কর্ণ সর্বসুলক্ষণযুক্ত এবং মহাবীর। ইনি সামান্য ব্যক্তি থেকে উৎপন্ন হতে পারেননা। ইচ্ছা করলে স্বীয় বীর্যে ইনি পৃথিবী অধিকার করতে পারেন। ভীম তার কোনও উত্তর দিতে পারলেননা এবং জনতার এক পক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুর্যোধনের প্রতি সাধুবাদ প্রদান করলেন। দুর্যোধনের উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর মনেও সন্দেহ ছিল যে কর্ণের মত পুরুষের পক্ষে অধিরথের সন্তান হওয়াটা খুবই বিচিত্র ঘটনা। অতএব, কর্ণের জন্ম এবং অস্ত্রশিক্ষার ব্যাপারে সবাইকার মনে একটি সন্দেহ একেবারে গোড়া থেকেই রয়ে গিয়েছিল। এই সব ঘটনার বিশ্লেষণ করলে এইরকমই ধারণা হয়।

এর পরের ঘটনা পাঞ্চাল বিজয়। এটি হচ্ছে গুরুদক্ষিণা। দ্রোণ অনেক আগেই ভীষ্মকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে রাজ-পুত্রেরা পারদর্শী হলে তাদের দিয়ে দ্রুপদের পরাজয় সাধন করতে হবে। পাঞ্চালগণ কৌরবদের খুব নিকটবর্তী ছিলেন কিন্তু তাঁদের তৎকালীন সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না, তাই পাঞ্চালরাজ্য

অধিকার করাটা ভীষ্মের কাছেও শ্রেয় বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু বিনা প্ররোচনায় এই আক্রমণকে সমর্থনযোগ্য কাজ বলা যায় না। তবে, দুর্বল শত্রুকে অধিকার করা রাজধর্ম ; ভীষ্ম সেই নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমটা কৌরবেরা কিন্তু মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি, তারপরে ঘটনা-বিপর্যয়ে দ্রুপদ পরাজিত হয়ে অর্জুনের হাতে বন্দী হলেন। দ্রোণ তাঁর প্রাণবিনাশ করলেন না, কিন্তু দ্রুপদের সেই বাক্য, রাজা না হলে রাজার সখা হওয়া যায় না,—সেটি দ্রোণের অন্তরে বিদ্ধ হয়ে ছিল। অতএব, প্রতিশোধ নেবার ছলে তিনি পাঞ্চালের অধীশ্বর হয়ে রাজা হয়ে বসলেন। দ্রুপদ গঙ্গার উপকূলে মাকন্দী নগরী এবং কম্পিল্যপুরী শাসন করতে লাগলেন এবং দ্রোণ চর্মণ্বতী নদী পর্যন্ত দখল করে নিজেকে সেই রাজ্যাংশের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর রাজধানী হল অহিচ্ছত্র নগরী। দ্রোণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ শুধু রাজা হলেন না, কৌরবদের অভিভাবক হয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেলেন। কিন্তু দ্রোণ কখনও রাজ্য শাসন করেছেন, এমন উল্লেখ বোধ হয় কোথাও নেই। তিনি কৌরবদের সভাতেই আচার্য হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজ্য আসলে কৌরবদের দখলে চলে গিয়েছিল এবং তাঁরাই এর শাসন কার্য নির্বাহ করতেন। অনুরূপভাবে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করলেও তিনি কদাচিৎ উক্ত রাজ্য শাসন করেছেন ; তিনিও হস্তিনার রাজসভাই অলঙ্কৃত করতেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। পাণ্ডব রাজপুত্রেরা এই সময় বলশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা পশ্চিম সীমান্তে যবনরাজ সৌবীরকে পরাজিত করেন এবং হস্তিনার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত কয়েকটি রাজ্যও অধিকার করেন। এতে তাঁরা খুব বিভবশালী বলে পরিগণিত হন। এই অভিযানগুলিতে দেখা যাচ্ছে পাণ্ডবেরা এককভাবে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের উচিত ছিল কৌরবদের সঙ্গে মিলিতভাবে হস্তিনাবাহিনী গঠন করা, কিন্তু সেটা তাঁরা করেননি। ধৃতরাষ্ট্র বা ভীষ্ম

উভয়েই এইরকম ভিন্নভাবে রাজ্যজয়ের চেষ্টায় বাধা প্রদান করেননি ; করলে পরিণাম ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত না। বরাবরই দেখা গেছে, হয় পাণ্ডবগণ এককভাবে, নয় কৌরবগণ এককভাবে কোনও বৃহৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এতে একটুও বাধা প্রদান করছেন না। এতে ভেদনীতিটাই পাকাপোক্ত হয়ে অধিষ্ঠিত হল। যাতে কল্যাণ হয়, এমন একটি কাজও ধৃতরাষ্ট্র বা ভীষ্ম অথবা বিদুর নিজের থেকে করেননি। এর কারণ ধৃতরাষ্ট্র বরাবরই দোলাচলচিত্ত ছিলেন, বিদুর ছিলেন সমগ্র কৌরবদের বিপক্ষে এবং ভীষ্মের কিছু করবার মত দৃঢ়তাই ছিল না।

ততঃপর ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুপুত্রদের শ্রীবৃদ্ধি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল পাণ্ডবদের আর বাড়তে দিলে তাঁর ছেলেদের ভবিষ্যৎ সবদিক দিয়ে অন্ধকার হয়ে যাবে। তিনি তখন কূটনীতিতে সুনিপুণ এক ব্রাহ্মণ কণিক-কে ডেকে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন কি করে পাণ্ডবদের এই উত্থানকে খর্ব করা যায়। কণিক তাঁকে সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়ে বললেন—হৃদয়ে বিরুদ্ধভাব পোষণ করলেও মুখে যেন তিনি সর্বদাই মিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করেন এবং কোনও ভয়াবহ কার্যের অনুষ্ঠান না করেন। ন্যায়ানুগত ব্যবহার করলে তিনি কারুর কাছ থেকেই বিপদে পড়বেন না, অথচ, নির্বিবাদে নিজের কাজ সাধন করতে পারবেন। তিনি নিজে থেকে কোনও পরিকল্পনা না দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্তব্য নির্ধারণ করবার উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হলেন। ওদিকে দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং কর্ণও নিশ্চেষ্ট ছিলেনন।, বিশেষ করে দুর্যোধনের মনে ক্ষোভ ছিল যে কেবলমাত্র জন্মান্ধত্বের জন্যই পিতা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য-লাভ করতে পারেননি। এখন যদি যুধিষ্ঠির পৈত্রিক রাজ্য প্রাপ্ত হন তাহলে পরবর্তীকালে তাঁর বংশই রাজত্ব করে যাবে। তাঁরা পাণ্ডবদের কোনও ছলে রাজধানী থেকে নির্বাসিত করে বারণাবতে পাঠাবার মন্ত্রণার স্বপক্ষে ছিলেন ; অমাত্যবর্গের অধিকাংশ তাদের দিকে ছিলেন ; সুতরাং বিদ্রোহের তেমন আশঙ্কা কুরুবৃদ্ধেরা কেউই

করেন নি। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁদের পক্ষে থাকায় দ্রোণও অপর পক্ষে যেতে পারতেন না। কিন্তু, বিদুর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থেকে এঁরা একটা ভুল করেছিলেন। বিদুর পাণ্ডবদের গুপ্তচর ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কোনও বড় রকমের আশঙ্কা যে তাঁরা কেন করেননি, তা বোঝা যায় না। অমাত্যবর্গের অধিকাংশই যে নীতিভ্রষ্ট ছিলেন এমন অনুমান করাটা ভুল হবে। তবে, তাঁদের মধ্যে যথার্থভাবেই এই ক্ষোভটা ছিল যে ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। অপরপক্ষে, পাণ্ডবগণ তাঁদের স্বমতে আনবার কোনও চেষ্টাই করেননি। পাণ্ডু যতদিন রাজা ছিলেন, ততদিন তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে সমধিক মর্যাদা প্রদান করেছিলেন এবং অমাত্যদের বশীভূত রেখেছিলেন। বলতে গেলে, পাণ্ডুর জীবদ্দশায় অধিকাংশ কাল ধৃতরাষ্ট্রই রাজ্যের ভার বহন করেছিলেন এবং পাণ্ডু নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্রের অধিকার দৈবক্রমে তাঁর উপর বর্তেছে ;—তাই ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বঞ্চিত না করে নিজেই প্রবাসী হয়েছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রেরা নিজেদের বাহুবল সম্বন্ধে এত স্ফীত ধারণার বশবর্তী ছিলেন যে রাজনীতির এই সব দিক তাঁরা বিবেচনাই করেননি।

বারণাবতে পাণ্ডবদের থাকবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে ধৃতরাষ্ট্র একদিন পাণ্ডবদের কাছে উক্ত নগরীর বিশেষ প্রশংসা করে তাঁদের কাছে প্রস্তাব করলেন, তাঁরা না হয় কিছুদিনের জন্য ওই স্থান থেকে আমোদ প্রমোদ করে বেড়িয়ে আসুন। যুধিষ্ঠির হঠাৎ এইরকম প্রস্তাবের পিছনে কোনও অভিপ্রায় আছে, এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাকে অমান্য করতে পারলেন না। তাঁরা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি সকলের সঙ্গে দেখা করে মাতৃসহ বারণাবতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ব্যাপারটা কিন্তু প্রজাদের অজানা রইল না। তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন যে ধৃতরাষ্ট্র কৌশলে পাণ্ডবদের রাজধানী থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। সকলেরই বিশ্বাস হল যে বারণাবতে পাণ্ডবদের নিধন প্রায় অনিবার্য। বিদুর সমস্ত মন্ত্রণার কথাই জানতেন, তিনি

পাণ্ডবদের সঙ্গে সব সময়ই সংযোগ রেখে চলতেন। দুর্যোধন বাকি ষড়দের সঙ্গে মন্ত্রণা করে পুরোচন নামক এক সচিবকে অর্থলোভে বশীভূত করে আগেই বারণাবতে পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি পরম রমণীয় চতুঃশাল (বাংলো) নির্মাণ করেছিলেন; কিন্তু সেটিকে গোপনে সমস্ত দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগ্নেয় করে রাখা হয়েছিল। কথা ছিল, পাণ্ডবগণকে বারণাবতের প্রাসাদে কিছুদিন রাখবার পর, তাঁদের সেই গৃহে কৌশলক্রমে নিয়ে আসা হবে এবং সুযোগ বুঝে তাতে অগ্নি সংযোগ করা হবে। পাণ্ডবগণ প্রাসাদে দশদিন থাকবার পর পুরোচনের কৌশলে সেই জতুগৃহে কিছুদিন বাস করবার জন্য এলেন। এই গৃহের নাম দেওয়া হয়েছিল "শিবগৃহ"।

দেখা যাচ্ছে জতুগৃহ নির্মাণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে দুর্যোধনের উল্লেখ রয়েছে। এখানেও প্রশ্ন জাগে, দুর্যোধন নিজের দায়িত্বে এই জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন কিনা, এবং এইভাবে পাণ্ডবনিধন তাঁর কাম্য ছিল কিনা। দুর্যোধনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি শঠতার আশ্রয় গ্রহণ পছন্দ করতেন না। তিনি যা কিছু করেছেন, সোজাসুজি মুখোমুখি করেছেন এবং এই কারণেই তাঁকে বহুবার বার্থতা বরণ করতে হয়েছে। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ যে তিনি খুব বুঝতেন, এমন মনে হয়না; অন্ততঃ মহাভারতে বর্ণিত তাঁর প্রত্যক্ষ কার্যাবলীতে এই অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণাভাব। এক্ষেত্রেও এটা স্পষ্ট যে প্রাসাদের ষড়যন্ত্রই এবিষয়ে প্রধানতঃ কার্যকর হয়েছিল এবং ধৃতরাষ্ট্রের তাতে সমর্থন ছিল। তবে, ধৃতরাষ্ট্র এই হত্যার পরিকল্পনাটা জানতেন না বলেই মনে হয়। ধৃতরাষ্ট্র ক্ষোভের বশে এইভাবে বার বার নিজেকে নীচে নামিয়েছেন, যার ফল তাঁকে দীর্ঘজীবন জুড়ে ভোগ করতে হয়েছে। তিনি অতিশয় দুর্বলচিত্ত ছিলেন। তাই প্রতিবারই প্রাসাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়ে কলঙ্কগ্রস্থ হয়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে যে কিছুকাল পরেই হীন চক্রান্তের পর বিবেকের দংশনে তিনি জর্জরিত হয়েছেন। এক্ষেত্রেও তাই হতেন

যদি না তাঁর সন্দেহ থাকত যে বিদুরের হস্তক্ষেপের ফলে পাণ্ডবেরা নিহত হবেন না। দুর্যোধন বারবারই বিদুরের গোপন অভিসন্ধিমূলক কাজগুলির খবর পেয়েছেন; মাঝে মাঝে তিনি বিদুরকে শ্লেষবাক্যে জর্জরিত করেছেন, কিন্তু তথাপি তাঁর কোন ক্ষতি তিনি করেননি। যদি তিনি এইরকম ষড়যন্ত্রপরায়ণ হতেন, তাহলে আগে যাঁর নিধন হত, তিনি নিশ্চিতভাবেই বিদুর হতেন।

এখানে এসেই যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন যে তাঁদের পুড়িয়ে মারবার জন্যই এই গৃহে আনা হয়েছে। কিন্তু তথাপি তাঁরা নিজেদের মনোভাব বুঝতে দিলেন না। ওদিকে বিদুর একজন খনক পাঠিয়ে সেই জতুগৃহে গোপনে একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই পথ দিয়ে তাঁরা যাতে অগ্নিপ্রজ্বলিত গৃহ থেকে পালিয়ে আসতে পারেন, তাই এই ব্যবস্থা। এক বৎসর অতীত হবার পর পুরোচন ভাবলেন এইবার পাণ্ডবগণের তিনি একান্ত আস্থাভাজন হয়েছেন; কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁর কার্যসিদ্ধির পূর্বেই নিজেদের কার্যসিদ্ধির পরিকল্পনা স্থির করে রেখে-ছিলেন। একদিন রাত্রে কুন্তী ব্রাহ্মণভোজন উপলক্ষে অনেককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সকলেই আহারাদির পর নিজ নিজ বাড়িতে প্রস্থান করলেন, কিন্তু এক নিষাদী অন্নলাভের প্রত্যাশায় তার পঞ্চপুত্রের সঙ্গে খেতে এসেছিল। তাদের ইচ্ছাপূর্বক প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করানো হল এবং তারা একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। এইসব ব্যাপারে অধিক রাত্রি জাগরণের পর পুরোচন ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে নিদ্রামগ্ন হলেন। তখন ভীমসেন আগে তাঁর ঘরে অগ্নিসংযোগ করলেন এবং পরে চতুঃশাল গৃহের চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। আগুন যখন ভীষণ ভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, সেই সময় তাঁরা পাঁচ ভাই, মাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে নিরাপদে বেরিয়ে এসে দ্রুতগতিতে বারণাবত থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বিদুর সবই জানতেন। তিনি একজন গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন। ক্রমে পাণ্ডবেরা বারণাবত নগর থেকে গঙ্গার ধারে এসে যখন কি করবেন ভাবছেন তখন সেই গুপ্তচর তার নৌকো নিয়ে পাণ্ডবদের পার করবার জন্য উপস্থিত হলেন। নিজের

পরিচয় প্রকাশ করে তিনি পাণ্ডবদের ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

পরদিন পুরবাসীগণ সমস্ত আগুন নিভিয়ে ফেলে পুরোচনসহ আরও ছয়টি কঙ্কাল সেই গৃহে যথাস্থানে দেখতে পেয়ে সাব্যস্ত করলেন যে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব সকলেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। খবর হস্তিনায় পৌঁছলো। সেখানে সকলেই কৃত্রিম শোকপ্রকাশ করে ক্ষান্ত হলেন। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ভালই ঘটেছিল; কিন্তু নির্দোষ বেচারী নিষাদী ও তার পঞ্চপুত্রের হত্যা আমাদের মনে একটি করুণ ভাবের উদ্রেক করে। এছাড়া, রাজনীতির দিক থেকে শত্রুদের বিভ্রান্ত করবার বোধকরি আর কোনও উপায় ছিল না। তথাপি যেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটি হচ্ছে, সে যুগের মানবতার আদর্শ। ক্ষত্রিয়দের কাছে নিষাদ প্রভৃতি আদিবাসী বা সমাজের দরিদ্রস্তরের লোকদের জীবনের কোনও মূল্যই ছিল না। এই নিষাদ হত্যার পাপ পাণ্ডবদের গণনার মধ্যেই আসেনি;—কেবল ব্রহ্মহত্যা না ঘটলেই হল। কিন্তু পুরোচনের মৃত্যুটা কৌরবদের কাছে অস্বাভাবিক ছিল এবং তাঁরা বোধ করি পাণ্ডবদের নিধন সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হতে পারেননি।

এর পর পাণ্ডবেরা বহুদিন নানাস্থানে আত্মগোপন করেছিলেন। এর মধ্যে সত্য ঘটনা কি ঘটেছিল বলা শক্ত; তবে অনুমান হয়, ভীমসেন একটি আদিবাসী রমণীর সঙ্গে কিছুকাল সহবাস করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই রমণীই তথাকথিত হিড়িম্বা রাক্ষসী। সম্ভবতঃ পাণ্ডবগণ বনপথে আত্মগোপন করবার সময় কিছু হিংস্র বনচরদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সময় তাদের মধ্যে এই রমণী ভীমের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বোধ হয় বাধ্য হয়েই, নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই ভীমসেনকে এই রমণীর সন্তোষবিধান করতে হয়। এর গর্ভে কোনও সন্তান উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব ছিল না; কিন্তু পিতা তার কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। অতএব, সেইখানে, তার মার কাছেই তাকে রেখে যাওয়া হয়েছিল।

আত্মগোপনকালে পাণ্ডবগণ বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধন করে

তাপসবেশ ধারণ করেছিলেন। তাঁরা মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তাঁরা যখন এইভাবে ভ্রমণ করছিলেন তখন বোধ হয় কোনও স্থানে ব্যাসমুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা পরিচয় প্রদান করলে ব্যাস তাঁদের একচক্রা নগরীতে কোনও এক ব্রাহ্মণ-গৃহে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। সেইখানে তাঁরা একমাস বাস করেছিলেন। একচক্রা নগরীতে অবস্থিতির সময় বক রাক্ষসকে বধ একটি মনোজ্ঞ কাহিনী। রাক্ষসনামক এক প্রকার নরমাংসভোজী জাতি বৈদিক যুগ থেকেই এদেশে ছিল। আসলে বক নামক কোনও দস্যু হয়তো একাচক্রা নগরীতে আধিপত্য স্থাপন করে বিশেষ উৎপীড়ন করেছিল। পাণ্ডবগণ কৌশলে তার হত্যা সাধন করে ওই অঞ্চলকে বিপদমুক্ত করেন। এই সময় উক্ত ব্রাহ্মণ-গৃহে আর এক অতিথি ব্রাহ্মণ আগমন করেন। তাঁর কাছেই পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল দেশে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা জানতে পারেন।

পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন দ্রোণের কাছে নতিস্বীকার করবার পর বিশেষ মনোকষ্টে দিন যাপন করছিলেন। তার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন যাতে দ্রোণকে বধ করতে পারেন, সে বিষয়ে তিনি তাঁকে বাল্যকাল থেকে প্রস্তুত করতে থাকেন এবং তখনকার বিশ্বাস অনুযায়ী দ্রোণের বধকল্পে নানান যাগ-যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করেন। মজা হচ্ছে এই যে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রুপদ নাকি দ্রোণের কাছেই অস্ত্র শিক্ষা নিতে পাঠিয়েছিলেন। রাজ্য পাবার পর দ্রোণের আর কোনও বিরুদ্ধভাব দেখাবার উপায় ছিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়ত তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সংবাদটা কি সত্য? দ্রুপদের দ্রোণ সম্পর্কে যে রকম মনোভাব ছিল তাতে, নিজের ছেলে তাঁর কাছে অস্ত্র শিক্ষা করুক, এটি তাঁর কাম্য না হবারই কথা। কিন্তু, ধৃষ্টদ্যুম্ন কি সত্যিই দ্রোণকে বধ করেছিলেন? দ্রোণ কি সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন? এটাও সম্ভাব্য বলে মনে হয় না।

এর মধ্যে যজ্ঞসেনের কন্যা দ্রৌপদী বিবাহের উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু একে

স্বয়ম্বর বলা চলে না। এ বিবাহে দ্রৌপদীর কোনও হাত ছিল না। রাজা দ্রুপদ একটি দুরূহ লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই লক্ষ্যভেদ যিনি করতে পারবেন, তাকেই তিনি কন্যাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। কুন্তী এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং পুত্রদের পাঞ্চালদেশে গমনের জন্য আদেশ করলেন। তাঁর গোড়া থেকেই বোধ হয় ইচ্ছা ছিল যে অর্জুন যেন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করতে পারেন। মাতৃ আজ্ঞায় পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরী পরিত্যাগ করে পাঞ্চাল অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দ্রৌপদী, তথা কৃষ্ণা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যজ্ঞ থেকে উৎপত্তি সম্বন্ধে রোমহর্ষক কাহিনীর বর্ণনা মহাভারতে আছে; কিন্তু পাণ্ডবদের দেবতা থেকে জন্মগ্রহণ যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি যজ্ঞ থেকে পুত্র বা কন্যার উৎপাদনও সম্ভব ছিল না। এঁরা রাজা দ্রুপদেরই ঔরসজাত সন্তান, সন্ততি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অনেক চিন্তার পরেই দ্রুপদ তাঁর কন্যার স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁকে একজন প্রভাবশালী নরপতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতেই হত; নতুবা, তিনি ক্রমশই অসহায় হয়ে পড়ছিলেন। তিনি জানতেন যে কৌরবদের বিরুদ্ধে তাঁকে যেতেই হবে, কেননা দ্রোণকে বধ করাই তাঁর বিশেষ কাম্য ছিল। যদিও অর্জুনের কাছে তিনি হেরেছিলেন এরকম কথিত আছে, তথাপি তাঁর ক্ষোভটা ছিল দ্রোণের উপর, কেননা সমস্ত পরিকল্পনা ছিল উক্ত ব্রাহ্মণের। রাজা দ্রুপদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, সম্বন্ধ করে ভাল পাত্র তিনি পাবেন কিনা, অথচ স্বয়ম্বর করে কন্যার বিবাহের আয়োজন করলে তিনি সর্বতোভাবে উপযুক্ত পাত্র লাভ করতে পারবেন। স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণ এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ উপস্থিত ছিলেন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ না করলে তাঁদের কেউ যে দ্রৌপদীকে লাভ করতেন, এটাও অনুমান করা যায় এবং তা হলেও রাজা দ্রুপদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত।

এই সময়ে পাণ্ডবগণ ধৌম্য নামে এক ব্রাহ্মণকে তাঁদের পুরোহিত নিযুক্ত করেন। অঙ্গারপর্ণ নামক একজন গন্ধর্বের নির্দেশেই অর্জুন

এঁকে নিযুক্ত করেন। পাণ্ডবেরা উৎকোচ নামক তীর্থে ধৌম্যের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরিচয় প্রদান করলেন এবং তাঁকে তাঁদের পুরোহিত হবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ধৌম্যও তাঁদের যথাবিধি সৎকার করে পৌরহিত্য স্বীকার করলেন। পাণ্ডবদের আশা ছিল ধৌম্যকে তাঁদের সঙ্গে পেলে স্বয়ম্বরে তাঁরা দ্রৌপদীকে লাভ করতে পারবেন। এই আশার হেতু অবশ্য পুরাণকার বিশ্লেষণ করে দেখাননি।

অতঃপর তাঁরা দ্রুপদজনপদে প্রবেশ করলেন। দক্ষিণ পাঞ্চাল-দেশে এই স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এইখানে আসবার সময় আবার তাঁদের ব্যাসের সঙ্গে দেখা হয়। পাঞ্চালদেশে তাঁরা ভার্গব নামক এক কুম্ভকারের বাড়িতে থেকে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

এইখানে পুরাণকার জানাচ্ছেন যে রাজা যজ্ঞসেনের মনে অভিলাষ ছিল যে তিনি অর্জুনকে কন্যাসম্প্রদান করবেন এবং এই কারণেই এক সুদৃঢ় শরাসন তৈরি করে এমন এক আকাশযন্ত্রের উপরে লক্ষ্যস্থাপন করেছিলেন যে অর্জুন ছাড়া আর কারুর পক্ষে তা যেন ভেদ করা সম্ভব না হয়। এই ধরণের উল্লেখ থেকে মনে হয়, পাণ্ডবগণ যে আসলে বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডে নিহত হননি, সেটি প্রচার হয়ে গিয়েছিল। বিদুর যতই সাবধানতা অবলম্বন করুননা কেন অনেকেই পাণ্ডবদের পলায়নের ব্যাপারটা জানতেন। ব্যাস তো জানতেনই এবং তিনি আত্মগোপনকালে তাঁদের সহায়তাও করতেন। কুন্তীর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণও তাঁদের গতিবিধির উপর বিশেষ ভাবে নজর রেখেছিলেন। কৌরবপক্ষও যে খবর না পেয়েছিলেন এমন নয়, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, অর্থাৎ পাণ্ডবগণ নির্বাসিত হওয়ায় তাঁরা আদৌ ভীত বোধ করছিলেন না।

স্বয়ম্বর সভায় কুরুপক্ষের সকলেই উপস্থিত ছিলেন; এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন যদুবংশীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা সকলেই। বলা বাহুল্য, বড় বড় রাজ্যের সকলেই সমবেত হয়েছিলেন, যদিচ তাঁদের কেবল

আভিজাত্য রাখবার জন্যই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

যথাসময়ে কৃষ্ণা রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সকলেই নাকি কামমোহিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু, যদুপ্রবীর কৃষ্ণ সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবকে খুঁজছিলেন; তাঁদের তিনি অনায়াসেই চিহ্নিত করতে পারলেন। পাণ্ডবদের ব্যক্তিগত জীবনে এই কৃষ্ণের প্রথম প্রবেশ। এর আগে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কতখানি নিবিড় ছিল তা পুরাণকার কিছুই বলেননি। আমরা অনুমান করতে পারি যে কৃষ্ণ মাঝে মাঝে পিতৃস্বসা কুন্তীকে দেখতে আসতেন এবং তখন তাঁর সঙ্গে পাণ্ডবদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু, সে খুব কদাচিৎ ঘটত। যাই হোক, এতকাল পরেও ছদ্মবেশীদের কৃষ্ণ চিনে ফেললেন, কারণ পাণ্ডবদের গতিবিধি এবং বেশবাশ তাঁর অগোচর ছিল না।

এর মধ্যে অনেক রাজাই শরাসন নিয়ে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাকে গুণযুক্ত করতে পারলেন না। রাজন্যবর্গ যখন খানিকটা দমে গেছেন তখন কর্ণ লক্ষ্যভেদের প্রয়াস করলেন। তিনি অনায়াসেই লক্ষ্য ভেদ করতে পারতেন; কিন্তু দ্রৌপদী, তিনি সফলপ্রযত্ন হতে যাচ্ছেন দেখে, মুক্তকণ্ঠে বললেন—"আমি সূত-পুত্রকে বরণ করবনা"। এই কথা শুনে কর্ণ শরাসন পরিত্যাগ করলেন।

দ্রৌপদীর এই উক্তি কতখানি যুক্তিযুক্ত এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। সম্ভবত, তাঁকে আগে থাকতেই এইরকম বলতে শেখানো হয়েছিল, নতুবা একটি বালিকার পক্ষে এ মন্তব্য অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিক। রাজা যজ্ঞসেন জানতেন যে লক্ষ্যভেদ করা কর্ণের পক্ষে অসাধ্য না হতেও পারে, অথচ কূটনৈতিক কারণে তাঁকে আমন্ত্রণ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। অতএব এই সম্ভাবনার উদয় হলে কি করতে হবে, সেটিও তিনি ভেবে রেখে-ছিলেন। বিবাহেচ্ছু কন্যা নিজে থেকেই যদি কাউকে মনোনীত না করে তাহলে কর্তৃপক্ষের কোনও দায়িত্ব থাকে না। সেই কারণেই এইভাবে কর্ণকে এড়িয়ে যাওয়া হল। কিন্তু এতে দ্রুপদের প্রতিজ্ঞা-পালনে গুরুতর স্খলন ঘটল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তদীয় ঘোষণায় স্পষ্টই

বলেছিলেন যে তাঁর ভগ্নী কৃষ্ণা কুলশীল-রূপলাবণ্যসম্পন্ন যে ব্যক্তি লক্ষ্যভেদে সমর্থ হবেন, তাঁরই ভার্যা হবেন এবং তিনি সমবেত ব্যক্তিগণের পরিচয় প্রদানের সময় স্বীয় ভগ্নীকে কর্ণের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু তিনি তাঁর কুল নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুর্যোধন এই অন্যায়ের কোনও প্রতিবাদ সেই সভায় করলেন না। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর আত্মীয়বর্গ কেউই যখন যখন দ্রৌপদীকে লাভ করতে সমর্থ হলেননা তখন কর্ণের পক্ষে এই সৌভাগ্য একটি ভেদনীতির অবতারণা করতে পারে। অতএব, তিনি কোনও বাদ প্রতিবাদে প্রবেশ না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

যাই হোক্, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অর্জুন অকুতোভয়ে এগিয়ে এসে অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করলেন। যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণবেশী সেহেতু তাঁর কুলশীল-এর প্রশ্ন আর উঠল না; কৃষ্ণা তাঁকে সহর্ষে মাল্যদান করলেন এবং পার্থ বিজিতা কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে রঙ্গস্থল থেকে বহির্ভূত হলেন।

যে সকল রাজন্যবর্গ কর্ণের পক্ষে একটি কথাও বলেননি, তাঁরা যখন দেখলেন যে একজন নগণ্য ব্রাহ্মণকে দ্রৌপদীর স্বামী বলে স্বীকার করা হল তখন তাঁরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁদের যুক্তি, যেখানে রাজন্যবর্গ উপস্থিত সেখানে কন্যাকে বিপ্রসাৎ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। তাঁদের রাগটা গিয়ে পড়ল রাজা যজ্ঞসেনের ওপর। তিনি ভয়ে ব্রাহ্মণদের শরণাগত হলেন। এর পরের ঘটনা, যাঁরা মহাভারত পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এইরকম অসম যুদ্ধের উদাহরণ আর মহাভারতের কোথাও নেই। এই যুদ্ধে দুজন প্রধানতঃ অংশগ্রহণ করেছিলেন,—একজন কর্ণ, অপরজন শল্য। কর্ণ ছদ্মবেশী অর্জুনের বিক্রমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সাধুবাদ প্রদান করলেন এবং তিনি আত্মপ্রচ্ছাদন করে বিপ্ররূপে যুদ্ধ করছেন কিনা জানতে চাইলেন—কারণ, একমাত্র অর্জুন ভিন্ন কেউ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ নন, এটা তিনি স্পষ্টভাবেই

তাঁর প্রতিযোদ্ধাকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু, অর্জুন তাঁর পরিচয় উদ্ঘাটিত করলেন না। তিনিও স্পষ্টভাষায় নিজেকে ব্রাহ্মণ বলেই ঘোষণা করলেন। সেই মুহূর্তে কর্ণ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজের সম্মান প্রদানের জন্য যুদ্ধ পরিত্যাগ করলেন। ওদিকে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে শল্য শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলেন। এমন সময় কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় যুদ্ধের বিরতি ঘটল।

অতঃপর পাণ্ডবগণ সমাগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে খুব সাবধানে ভার্গবের আলয়ে তাঁদের বাসস্থানে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দ্রৌপদীকে মাতা কুন্তীর হাতে সমর্পণ করলেন। এইখানে দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। এইরকম পরিস্থিতিতে অবশ্য দুর্বিপাক দেখা দিতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান যেটা হল সেটা ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণদের মধ্যে কখনও ঘটতে দেখা যায়নি। অর্জুন দ্রৌপদীকে লক্ষ্যভেদ করে অর্জন করলেও সৌজন্যবশত জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকেই এই কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন যেহেতু যাজ্ঞসেনী তাঁরই জয়লব্ধা কন্যা সেহেতু তিনিই এঁর যথার্থ পতি বলে পরিগণিত হবেন। এই বিধান দিলেও তিনি সভয়ে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর কনিষ্ঠেরা সকলেই কৃষ্ণাকে দেখে মোহগ্রস্ত হয়েছেন ; এমনকি তিনি নিজের মধ্যেও একটা অভূতপূর্ব কামচেতনা অনুভব করলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে এই নারীকে নিয়ে তাঁর ভাইদের মধ্যে অচিরেই একটা বিরোধ বেঁধে যাওয়া খুবই সম্ভব। মুহূর্তে তিনি এক অচিন্ত্যপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ; তিনি তাঁর ভাইদের নির্জনে ডেকে নিয়ে প্রস্তাব করলেন যে দ্রৌপদী তাঁদের সকলেরই ভার্যা হবেন। তাঁর এই বিষয়ে একমত হবেন কিনা বিচার করছেন এমন সময় বাসুদেব কৃষ্ণ বলদেবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বাসভবনে প্রবেশ করলেন। স্পষ্টই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে পাণ্ডবদের অনুসরণ করছিলেন। যুধিষ্ঠির আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন,—তাঁরা যে গোপনে এস্থানে বাস করছেন সে খবর কৃষ্ণের পক্ষে পাওয়া কি করে সম্ভব হল? উত্তরে কৃষ্ণ রহস্য করে বললেন, আগুন প্রচ্ছন্ন থাকলেও

তাদের অনায়াসেই জানা যায়; অতএব তিনিও তাঁদের অনায়াসেই জেনে ফেলেছিলেন। কিন্তু কেমন করে তিনি এই পাঞ্চালনগরীতে তাঁদের বাসস্থান অন্বেষণ করে বের করেছিলেন, সে কথা প্রকাশ করলেন না। অতঃপর তিনি কুন্তীকে প্রণাম ও সম্ভাষণ করে নিজের স্কন্ধাবারে ফিরে গেলেন।

আরও একজন পাণ্ডবদের অনুসরণ করেছিলেন, তিনি দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন। তিনিও ভার্গব নিকেতনে প্রবেশ করে গুপ্তভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি একা ছিলেন না, সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরও ছিলেন। স্পষ্টই মনে হয় কর্মশলার অভিভাবকের অনুমতিক্রমেই তাঁরা নিজেদের উক্ত গৃহে প্রচ্ছন্ন রাখতে পেরেছিলেন। তাঁরা দেখলেন—পাণ্ডবেরা খাওয়া দাওয়া করলেন, তাঁদের মাতা শিরোভাগে শয়ন করলেন এবং ভ্রাতাদের পদতলে দ্রৌপদীকে শুয়ে থাকতে হল। যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ তাঁরা যুদ্ধ ও সেনা-সম্পর্কীয় আলোচনা করতে লাগলেন। সকালবেলা ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতাকে রাত্রির সংবাদ প্রদান করলেন এবং বললেন যে ব্রাহ্মণ ভিখারীরা কখনও যুদ্ধ বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করেন না;—এতে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করছেন,—এরকম যে একটা জনশ্রুতি হয়েছে. সেটা সত্য এবং এঁরা সেই ছদ্মবেশী পাণ্ডব। অতএব, বোঝা যাচ্ছে যে পাণ্ডবেরা যে জতু-গৃহে নিহত হননি সেটা লোকের মুখে মুখে বেশ দূরাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

দ্রুপদরাজ তখন তাঁর পুরোহিতকে ডেকে ভার্গবের কর্মশালায় গিয়ে ছদ্মবেশীদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে যুধিষ্ঠির কিছুই গোপন করলেন না। তিনি পুরোহিতকে রাজার কাছে গিয়ে জানতে বললেন যে অর্জুনই লক্ষ্য ভেদ করে কৃষ্ণাকে জয় করেছেন। এই সময় আর একজন রাজদূতও রথ নিয়ে তাঁদের রাজভবনে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হলেন এবং

তাঁরা ভার্গবের কর্মশালা পরিত্যাগ করে রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। কর্মশালাটির মালিকের সঙ্গে পাণ্ডবগণের সাক্ষাতের কোনও বিবরণ পুরাণে নেই। যাঁর আতিথ্যে তাঁরা এতবড় একটা কাজ সমাধা করলেন, শেষ পর্যন্ত তিনিই সম্পূর্ণ তাঁদের আড়ালে রয়ে গেলেন। এই কর্মশালার প্রকৃত পরিচয় কেন উদ্ঘাটিত হয়নি, সেটাও আমাদের বোধগম্য হয় না।

রাজা দ্রুপদের প্রকাশ্য সভায় যুধিষ্ঠির আর একবার তাঁদের যথার্থ পরিচয় প্রদান করলেন। তারপর তিনি তাঁদের বারণাবতে জতুগৃহে প্রবেশ থেকে নির্গমন পর্যন্ত সব ঘটনাই রাজার কাছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। এইবার দ্রুপদ অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহের প্রস্তাব করলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করে বললেন যে কৃষ্ণা যৌথভাবে তাঁদের সব ভ্রাতারই পত্নী হবেন। রাজা দ্রুপদ লোকাচার এবং এবং বেদবিরুদ্ধ এই কর্মের অনুষ্ঠানে সম্মতি দিতে পারলেন না। তিনি মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। পরদিন রাজসভায় ব্যাসমুনির আগমন ঘটল। রাজা তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলেন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব যে গর্হিত, সে কথাও জানালেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করলেন না। কিন্তু, ব্যাস দৃঢ়ভাবে আদেশ করলেন যে পঞ্চপাণ্ডবের সকলের সঙ্গেই কৃষ্ণার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। এর সমর্থনে তিনি যে কাহিনী বিবৃত করলেন তা একটি গালগল্প মাত্র। যে ব্যাসদেব ব্রাহ্মণ হয়ে দাসীগর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারেন এবং যাঁর নিজের জন্মও ন্যায়সিদ্ধ ছিলনা,—তাঁর পক্ষে এরকম বিধান দেওয়া আশ্চর্য নয়; কিন্তু পাঞ্চালগণ এটা কি করে মেনে নিলেন সেটাই আশ্চর্য। শেষ পর্যন্ত রাজা দ্রুপদ এই লোকাচারবহির্ভূত প্রস্তাবেই সম্মত হলেন এবং বেদবিৎ পুরোহিতগণ কেউই আপত্তিস্থাপন করতে অগ্রসর হলেন না। পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবপক্ষে বিবাহ প্রদান করলেন। এতৎসত্ত্বেও দ্রৌপদী চিরকালই অর্জুনের প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন, কেননা তাঁকেই তিনি যথার্থ স্বামী বলে মনে করতেন। কিন্তু

যে দ্রৌপদী কর্ণকে স্পষ্টভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, পঞ্চস্বামীকে বরণ করবার বেলায় তাঁর সে নীতিবোধ কোথায় গেল? সেক্ষেত্রে তিনি যদি স্পষ্টভাবে বলতেন যে—অর্জুন তাঁকে লক্ষ্যভেদ করে অর্জন করেছেন; অতএব তিনি আর কাউকে বিবাহ করতে পারেন না, তাহলে ব্যাসদেব এত সহজে নিছক একটি কাহিনী বলে রাজাকে এবং তাঁর পুত্রকে একাধিক স্বামী গ্রহণের স্বপক্ষে আস্থাবান করতে পারতেন কি? যুধিষ্ঠিরও অন্তরে অনুভব করছিলেন যে কাজটা সঙ্গত হলনা কিন্তু যাতে তাঁদের মধ্যে কোনও ভেদ না হয় সেই কারণে এতবড় লোকাচারাবিরুদ্ধ কাজেও তিনি পশ্চাদপদ হলেন না। কৃষ্ণও এসম্বন্ধে একটি কথাও বললেন না, কেননা তিনিও অনুরূপ লোকাচারবিরুদ্ধ আর একটি কাজ কিছুকাল পরেই সম্পাদন করেছিলেন এবং তারও নায়ক ছিলেন অর্জুন। পরন্তু যাদবদের পক্ষ থেকে বিবাহিত পাণ্ডবদের মূল্যবান উপহার পাঠানো হয়েছিল।

এইবার আমরা আর একবার কৌরব রাজসভায় আসবার অবকাশ পাই। বিদুর যখন বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলেন যে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লজ্জিত, ভগ্নদর্প হয়ে ফিরে এসেছেন, তখন তিনি অপরিসীম আনন্দলাভ করলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি অতি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করলেন। তিনি তাঁর কাছে বললেন—"মহারাজ ভাগ্যবলে কৌরবেরা বিজয়লাভ করেছেন।" তিনি জ্ঞাতসারেই কেবলমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব বোঝবার জন্যই পাণ্ডবদের বৃহত্তর কৌরবদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কথাটা সরলভাবে গ্রহণ করে আন্তরিক আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন এবং আদেশ করলেন, দুর্যোধন, আর দ্রৌপদীকে যেন বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়; যদিচ চাক্ষুষ দেখার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তখন কপটভাষী বিদুর নিষ্ঠুর সত্যটি উদঘাটিত করে তাঁকে বললেন,—"মহারাজ, আপনি বুঝতে ভুল করেছেন; কৌরবকুলের পাণ্ডবেরাই বরমাল্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা

সকলেই কুশলে আছেন এবং দ্রুপদরাজ তাঁদের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই স্বয়ম্বরস্থলে তাঁদের সমন্তরের বহু বন্ধু বান্ধব এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।" ধৃতরাষ্ট্র একটা তীব্র আঘাত পেলেন। কিন্তু, মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন "ভালোই তো ভালোই হয়েছে; তারা পাণ্ডুর ছেলে বটে, কিন্তু আমি তাদের নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী মনে করি। আমার ছেলেরাই শত্রুতা করে তাদের সঙ্গেই মিত্রতা করতে চায় না।" বিদুর তাঁকে আরও একটু ব্যঙ্গ করে বললেন—"তা তো সত্যিই, তবে আপনার চিরকাল যেন এই সুমতি থাকে।" ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব-বর্জনের ষড়যন্ত্রে জড়িত থেকে অন্যায়ের অংশীদার হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তখন বিদুর তাঁকে নিবৃত্ত করেননি। তিনিও সেই নাটকে সঙ্গোপনে একটি বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এইখানে তিনি মৌনতা অবলম্বন করলে সেটি শোভন হত। এইরকম একটি নিষ্ঠুর অভিনয় করবার কোনও সঙ্গত কারণ তাঁর ছিলনা। তিনি জানতেন ধৃতরাষ্ট্র এতে কতখানি আঘাত পাবেন; তথাপি তিনি এই হৃদয়বিদারক ব্যঙ্গ করলেন কেবল মজা দেখবার জন্য। ধৃতরাষ্ট্রের আসল মনোভাব তাঁর চেয়ে আর কেউ ভালো জানতেন না। আসলে এই দাসীপুত্র বিদুরের মনে যে তীব্র ঈর্ষা ছিল, তা এইরকম ভেদনীতিতেই তাঁর অন্তরকে চরিতার্থ করতো। ধৃতরাষ্ট্রের মাতা অম্বিকা ছল করে এক দাসীর গর্ভে তাঁকে উৎপাদন করিয়েছিলেন। এই অগৌরব তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। সেই কারণেই ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রদের প্রতি চিরকাল তিনি বিদ্বেষ পোষণ করে গেছেন। যে "সুমতির" উল্লেখ তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সম্পর্কে করলেন সেটিকে তিনি নিজের পক্ষে প্রযোজ্য বলে বোধ করি কোনকালেই মনে করতেন না।

এই আলোচনার সংবাদ দুর্যোধন এবং কর্ণের গোচর হল। তাঁরা ক্ষুণ্ণভাবে অন্ধরাজের কাছে এসে বললেন যে বিদুরের কাছে পাণ্ডবদের প্রশংসা করাটা তার উচিত হয়নি, বরঞ্চ এখন তাঁর উচিত পাণ্ডবদের কি করে আবার দূর করতে পারা যায়, সে বিষয়ে মন্ত্রণা করা।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের বুঝিয়ে বললেন যে বিদুরের কাছে আসল অভিসন্ধি গোপন রাখবার জন্যই তিনি সর্বদা পাণ্ডবদের গুণগানে মুখর হয়ে থাকেন। পুরাণকার এই সময় তাঁদের মধ্যে একটা গোপন আলোচনার কথা আমাদের গোচর করেছেন। আলোচনা যেভাবে হল সেটা পিতা, পুত্র এবং পুত্রস্থানীয় অপর এক ব্যক্তির মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না, কারণ এমন উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, যা কর্ণ হয়তো দুর্যোধনকে একান্তভাবে বলতে পারতেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রে সামনে বলাটা অস্বাভাবিক। দুর্যোধনের প্রস্তাব হল :—

(১) কুন্তীপুত্র এবং মাদ্রীপুত্রদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করা বা দ্রুপদকে বিপুল ধনরাশি প্রদান করে যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করানো অথবা পাণ্ডবদের পাঞ্চালেই বাস করতে সম্মত করা।

(২) বহুপতির অশেষ দোষ কীর্তন করে কৃষ্ণার হৃদয়কে দূষিত করা, যাতে একটা বিরাট কলহের ফলে পাণ্ডবদের চিত্তভেদ ঘটে এবং পাণ্ডবদের ওপর দ্রৌপদীর একটা বিরুদ্ধ ধারণা দৃঢ় হয়।

(৩) কোনও ছদ্মবেশী পুরুষ দিয়ে ভীমকে হত্যা করা, যাতে সে অর্জুনকে সাহায্য করতে না পারে। ভীমের সাহায্য না পেলে অর্জুন এককভাবে কর্ণের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না।

(৪) সুন্দরী স্ত্রীলোক দিয়ে প্রত্যেক পাণ্ডবকে প্রলোভন দেখানো যাতে কৃষ্ণা তাঁদের প্রতি বিরাগ পোষণ করেন।

(৫) পাণ্ডবদের হস্তিনায় এনে আর একবার কৌশলদ্বারা তাঁদের ধ্বংস সাধন করা।

এই সমস্ত মতলব দুর্যোধনের নিজের ছিল কি না, সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ এইরকম রাজনীতিতে তিনি কোনদিনই পাকা ছিলেন না। বরাবরই দেখা গেছে, তিনি যা করতেন তা সোজাসুজি করতেন এবং তার পরিণামে কি হবে তাও তলিয়ে দেখতেন না। আসলে, প্রাসাদে, চক্রান্তকারী ব্যক্তির অভাব ছিলনা এবং তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগে দুর্যোধনকে নানা উপদেশ দিয়ে প্ররোচিত করতেন। কর্ণ এই প্রস্তাবগুলির যথাযোগ্য সমালোচনা করলেন

এবং সমুচিত মন্তব্য প্রকাশ করলেন। তাঁর বক্তব্য হলঃ—

(১) যুধিষ্ঠির আগেই ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ রহিত করবার জন্য যুক্তভাবে কৃষ্ণাকে বিবাহ করেছেন। যারা এক পত্নীতে অনুরক্ত তাদের সৌভ্রাত্র বদ্ধমূল হতে বাধ্য। সুতরাং পরস্পর ভেদ উপস্থিত করা নিতান্ত সহজ হবে না। দ্রুপদ তেমন অর্থলোভী নন যে তিনি অর্থের বিনিময়ে পাণ্ডবদের পরিত্যাগ করবেন।

(২) বহুভর্তৃতা, অর্থাৎ বহুপুরুষের সঙ্গে যৌন সংসর্গস্থাপন স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত প্রিয় এবং কৃষ্ণা সেই রমনীকুলবাঞ্ছিত ফল বিনা-যত্নে প্রাপ্ত হয়েছেন, অতএব তাঁর মনে বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপাদন করে হৃদয়কে দূষিত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

তাঁর প্রস্তাব হলঃ—পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল হবার আগেই তাদের যুদ্ধে বিনষ্ট করা। কৌরবপক্ষ এই মুহূর্তে বিশেষ প্রবল এবং পাঞ্চাল-পক্ষ বিলক্ষণ হীনবল। অবস্থাটা এইরকম থাকতেই এবং কৃষ্ণ যাদব-বাহিনী নিয়ে আসবার আগেই পাঞ্চাল দেশে অবস্থিত পাণ্ডবদের প্রবল আঘাত করা হোক; তাহলে তাঁরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবেন। শত্রুতা আর রাখা ঢাকা নেই, সুতরাং প্রকাশ্যে তাঁদের সম্মুখীন হয়ে তাঁদের দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁদের একেবারে শেষ করে দেওয়া হোক। রাজনীতির দিক থেকে এই প্রস্তাব ছিল সবচেয়ে সময়োচিত এবং যুদ্ধটাও তাহলে প্রকাশ্যেই হত। নানারকম ঘৃণ্য গোপন চক্রান্তের চেয়ে সামনা সামনি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে একটা মীমাংসা করাই হচ্ছে সবচেয়ে সোজা পন্থা, যেক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ খুব কম শক্তিশালী। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে একটা দুর্বলতা পেয়ে বসল। দৃঢ়তা জিনিসটা তাঁর চরিত্রে খুব অল্পই পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি কিছুতেই মনস্থির করতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না পরন্তু এহেন গোপন প্রস্তাব নিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের উপদেশ গ্রহণ করবার কথা বিবেচনা করতে লাগলেন, যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন যে তাঁরা তাঁকে সমর্থন করবেননা। ফলে কর্ণের সুপরিকল্পিত প্রস্তাবটি বর্জিত হয়ে গেল।

আর একটি বৈঠক বসল,—বিষয়,—পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ এবং বিবাহের পর কৌরবদের কর্তব্যনির্ধারণ।

জতুগৃহদাহ থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছে সে সম্বন্ধে ভীষ্ম নিজেকে অনেকটা দায়ী করেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করে পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে একটা ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করেননি। মন্ত্রণা প্রসঙ্গে এই ত্রুটি তিনি অকপটে স্বীকার করলেন। তাঁর প্রস্তাব হল পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদানপূর্বক সন্ধিস্থাপন যেহেতু পাণ্ডবদের পিতা দীর্ঘকাল কৌরবদের সম্রাট ছিলেন। তিনি কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার সমানভাবে ভাগ করে নেবার উপদেশ দিলেন, দ্রোণাচার্যও একই অভিমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু কর্ণ এতে প্রবল বাধা দিলেন, কারণ তিনি জানতেন এই ভাগাভাগিতে শেষ পর্যন্ত কোনও ফল হবে না, যুদ্ধ একদিন বাধবেই এবং তাতেই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অতএব, তিনি দুর্যোধনকে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে তাঁর পক্ষে পুরুষকারকে অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সব লোক বিরোধী হলেও তিনি অনায়াসে সমগ্র রাজত্ব লাভ করবেন। নইলে একান্ত যত্ন করলেও রাজ্যলাভ সম্ভব হবে না। কর্ণ হয়তো এতটা উত্তেজিত হতেন না, কিন্তু দ্রোণকে তিনি একেবারে সহ্য করতে পারতেন না, রাজ্য বিষয়ে বা পাণ্ডব-কৌরবদের পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ তিনি অনধিকারচর্চা বলে মনে করতেন। তিনি নিজের থেকেও কোনও প্রস্তাব তুলতেন না, যদি না স্বয়ং দুর্যোধন তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করতেন। সবশেষে বিদুর তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। তিনি নতুন কিছু বললেন না, কেবল ভীষ্মের প্রস্তাবেই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তাঁর মতে এই পন্থা অবলম্বন করলেই পাণ্ডবদহন সম্পর্কে যে লোকনিন্দা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ক্ষালন হতে পারে এবং পাঞ্চাল ও যাদবগণের বন্ধুত্বও অর্জন করা সম্ভব হবে। যে কাজ সন্ধি দ্বারা সম্পন্ন করা যায় তার জন্য বিগ্রহ করাটা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় বলেই তিনি মতপ্রকাশ করলেন। কিন্তু আসলে, এই প্রস্তাবও বিভেদ সৃষ্টিরই প্রস্তাব কারণ রাজত্ব পাণ্ডব এবং কৌরব

উভয় পক্ষের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল এবং বিদ্রোহের অবকাশও রয়ে গেল। অতএব, বিদুরের এতে আপত্তির কারণ ছিল না। তিনি এই বিভেদটুকু চাইছিলেন।

আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটল। দুর্বল ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের উপদেশ গ্রহণ করতে সাহসী হলেন না, কারণ যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর নিজেরও যথেষ্ট ভয় ছিল। তিনি বিদুরকে ডেকে পাঞ্চাল যাত্রার নির্দেশ দিয়ে কুন্তী ও দ্রৌপদী সমেত পাণ্ডবদের হস্তিনায় নিয়ে আসতে বললেন। বিদুর বহু উপঢৌকন নিয়ে পাঞ্চালে এসে রাজা দ্রুপদের সম্বর্ধনা করলেন; সেখানে পাণ্ডবেরাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও আলিঙ্গন করে কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর সকলের উপস্থিতিতে রাজা দ্রুপদকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে পাণ্ডবদের হস্তিনায় প্রেরণ করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। দ্রুপদ সানন্দে অনুমতি প্রদান করলেন এবং বিদুর কৃষ্ণা ও কুন্তীসহ পাণ্ডবদের নিয়ে হস্তিনায় যাত্রা করলেন। কৃষ্ণও তাঁর সহযাত্রী হলেন। হস্তিনায় তাঁদের প্রত্যুদ্গমণের জন্য মান্যগণ্য কৌরবগণ ছাড়া বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ এবং কৃপাচার্যকে পাঠানো হল। তাঁরা এইভাবে সকলের সঙ্গে পুরে প্রবেশ করলে পুরবাসীগণ তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

পাণ্ডবগণ রাজপ্রসাদে প্রবেশ করে বিশ্রামাদি গ্রহণের পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম তাঁদের ডেকে পাঠালেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বললেন, তাঁরা যেন সন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যের অর্ধাংশ গ্রহণ করেন। একমাত্র এতেই ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটবে। যুধিষ্ঠির এই প্রস্তাবে মেনে নিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁরা তাঁদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করলেন। এই জনপদটি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ছিল বলেই এর নাম খাণ্ডবপ্রস্থ। অনেকে এর রাজধানীকে ইন্দ্রপ্রস্থও বলতেন। নগরটি যথেষ্ট সুরক্ষিত এবং পরিখা, প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কৃষ্ণ এবং বলদেব তাঁদের খাণ্ডব নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করে দ্বারবতীতে প্রস্থান করলেন।

কিছুদিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হল। সেই মুহূর্তে কিন্তু কৃষ্ণার

প্রশ্নই যুধিষ্ঠিরের মনকে অধিকার করে রেখেছিল। তাঁরা যৌথভাবে এই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন বটে, কিন্তু পাঁচজনের অধিকারের মধ্যে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছিল, নতুবা বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত। অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নিশ্চয়ই তাঁদের নজর এড়ায়নি। তাঁরা সবাই মিলে তখন দ্রৌপদী সম্বন্ধে এই নিয়ম করলেন যে তাঁদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর কাছে থাকবেন তখন অন্যজন সেখানে যেতে পারবেন না। কিন্তু মহাভারতে এর সঙ্গে আর একটি নিয়মভঙ্গের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে সেটি সম্ভাব্যতার দিক থেকে সন্দেহজনক। এই শাস্তিটি হল এই যে, যিনি এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করবেন, তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করতে হবে। বিচার করে দেখলে এই রকম কোনও গুরুতর শাস্তির সঙ্গত কারণ ছিল বলে মনে হয় না। দ্রৌপদী তাঁদের সকলেরই স্ত্রী; একান্তে সাহচর্য সম্বন্ধে একটা নীতি মেনে চলা নিশ্চয়ই উচিত ছিল; কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে ব্যতিক্রম হয়ে গেল বা অপ্রত্যাশিত লঙ্ঘন ঘটলে একেবারে বারো বছরের বনবাস তাও আবার ব্রহ্মচারী হয়ে, এতবড় শাস্তি যেমন অস্বাভাবিক তেমনি কঠোর। হয়তো ইচ্ছাপূর্বক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করলে শাস্তিস্বরূপ কিছুকালের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারত; কিন্তু একবারে এক যুগের মত বিচ্ছেদ ঘটানোর মত একটা বিধি প্রণয়ন করার স্বপক্ষে কোনও যুক্তিকে সমর্থন করা যায়না। খুব সম্ভবত অর্জুনের প্রতি অলৌকিক ক্ষমতা আরোপের জন্যই পুরাণকারগণ এই রকম একটি পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছিলেন,—যাতে কেবলমাত্র অর্জুনকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন রেখে তাঁকে দিয়ে বহু রোমহর্ষক বীরত্বের কর্ম করিয়ে নেওয়া যায়।

যাই হোক একদিন এইরকম একটা ঘটনা ঘটল যাতে অর্জুনকে নির্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করতেই হল। এক ব্রাহ্মণের গোধন চুরি করে দস্যুরা পালাচ্ছিল, ব্রাহ্মণ অর্জুনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। অর্জুনকে আয়ুধাগারে যেতে হল। সেখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির

দ্রৌপদীর সঙ্গে বিশ্রাম করছিলেন। অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মতি নিয়েই অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে অস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং দস্যুদের বিনাশ করে ব্রাহ্মণের গোধন ছাড়িয়ে আনলেন। তিনি কিন্তু এটিকে নিয়মের উল্লঙ্ঘন বলে ধরে নিলেন এবং প্রতিজ্ঞা অনুসারে যুধিষ্ঠিরের কাছে বনগমনের অনুমতি চাইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে নিবৃত্ত করতে বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি নিবৃত্ত হলেননা এবং শেষ পর্যন্ত বনবাসে যাত্রা করলেন। সমগ্র ঘটনাকেই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। রাজ-ভবনে এত বিশ্রামগৃহ থাকতে হঠাৎ আয়ুধাগারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দ্রৌপদীর সঙ্গে বিশ্রাম গ্রহণের পরিকল্পনা যুধিষ্ঠির যে কেন করলেন, সেটিও বুদ্ধির অগম্য।

স্বাভিপ্রেত বনবাসে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই অর্জুন এলেন গঙ্গাদ্বারে। বর্তমানে এই স্থানটিকেই হরদ্বার (হরিদ্বার) বলা হয়। এখানে তিনি নাগ-জাতীয়া উলুপীর সঙ্গে সহবাস করেন। এর পূর্বেও ভীমের বিষপানের সময় দেখা গেছে গঙ্গার উপকূলেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে নাগজাতীয় কোনও কোনও সম্প্রদায় বাস করতে ভালবাসত। বনবাসের প্রথম পর্যায়েই অর্জুন ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের বহু অনুরোধ উপেক্ষা করে যিনি তথাকথিত দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারীব্রত পালন পূর্বক বনবাস করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন, তিনি খুব সহজেই এক নারীর মোহে সেই প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হলেন। পুরাণকার একে অর্জুনের "ধর্মবুদ্ধি" বলেছেন : কিন্তু এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেননি। সেখানে থেকে অর্জুন হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই অঞ্চলে তিনি অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠ পর্বত, ভৃগুতুঙ্গ ও হিরণ্যবিন্দু তীর্থাদি পরিভ্রমণ করেন। তারপর তিনি হিমালয় থেকে অবতরণ করে পূর্বদিকের অঞ্চলসমূহে এলেন। এই পর্যায়ে তিনি গয়া থেকে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পর্যন্ত দেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন (অতএব, বঙ্গদেশ পাণ্ডববর্জিত দেশ নয়)। কলিঙ্গ রাজ্যের সীমানায় এসে তাঁর ব্রাহ্মণ সহচরগণ ফিরে গেলেন ; অল্পক'জন বন্ধুবান্ধব সহ তিনি এবার সাগরা-ভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি মহেন্দ্রপর্বত অতিক্রম করে মহাসাগর

উপকূলমার্গে মণিপুর নামক জনপদে এসে পৌঁছোলেন। মণিপুরের রাজার চিত্রাঙ্গদা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিলেন। নগরে ভ্রমণরতা এই নারীকে দেখে অর্জুন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে মনস্থ করলেন। তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন এবং নিজের পরিচয় প্রদান করলেন। রাজা বললেন—"আমার এই একমাত্র কন্যা, আমি একে পুত্র বলে জ্ঞান করি। এর গর্ভজাত পুত্রই আমার বংশধর হবে। অতএব তোমাকে এইটি মেনে নিয়েই আমার কন্যাকে বিবাহ করতে হবে।" অর্জুন এতে সম্মত হলেন। চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করে তিনি তিন বৎসর উক্ত মণিপুরে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর একটি পুত্র উৎপন্ন হলে তিনি চিত্রাঙ্গদার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মচর্যরক্ষার প্রতিজ্ঞা তাঁর পরিণয়ের দিক থেকে কোনও বাধার সৃষ্টি করেনি। এই মণিপুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণার মধ্যে একটা ভ্রান্তি আছে বলে মনে হয়। সাধারণতঃ লোকে আসাম সীমান্তে অবস্থিত মণিপুরকেই চিত্রাঙ্গদার বাসস্থান বলে জানেন; মণিপুরীদের নিজের ধারণাও সেইরকম। কিন্তু মহাভারত অনুসারে দেখা যাচ্ছে এই মণিপুর দক্ষিণ পূর্ব ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী একটি রাজ্য ছিল। কিভাবে উত্তর পূর্বভারতের সীমান্তবর্তী মণিপুরের সঙ্গে এই চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধ স্থাপিত হল, এর সূত্র নির্ণয় করা সম্ভব কিনা জানা যায় না। কোনও কোনও পুঁথিতে নামটি "মনলূর" লেখা আছে। কিন্তু উত্তর ভারতের পুঁথি সমূহে সর্বত্র মণিপুর নামই দৃষ্ট হয়ে থাকে। এরপরে অর্জুন দক্ষিণ মহাসাগরের অবস্থিত অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলম, করিন্ধমতীর্থ এবং ভারদ্বাজ—এই পাঁচটি তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। এই পঞ্চতীর্থ পরিক্রমার পর তিনি আবার মণিপুরে ফিরে এলেন। সেখানে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে উৎপন্ন বভ্রুবাহনকে দেখে গোকর্ণতীর্থে যাত্রা করলেন। তারপর তিনি ক্রমে ক্রমে অপারন্ত প্রদেশের (পশ্চিম সমুদ্রতীরস্থ জনপদসমূহ) তীর্থ ও পুন্যায়তনগুলি পর্যটন করতে করতে অবশেষে প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হলেন। এইখানে আর একবার তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ঘটল।

কৃষ্ণ তাঁকে প্রভাসের অন্তর্গত রৈবতক পর্বতে নিয়ে এসে বিপুল আড়ম্বর সহকারে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে তিনি উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, নটদের গান ও নৃত্য উপভোগ করে এবং দুগ্ধফেন-ধবল শয্যায় শয়ন করে বোধ করি ব্রহ্মচর্যের প্রভূত সম্মান রক্ষা করলেন। সেখান থেকে বাসুদেব কাঞ্চননির্মিত রথে তাঁকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। কিছুদিন দ্বারকায় অতিবাহিত করবার পর আবার তাঁরা ফিরে এলেন রৈবতক পর্বতে। সেখানে অন্ধক এবং যদুবংশীয়দের একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। এই উৎসবেই অর্জুন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভগ্নী বসুদেবের কন্যা সুভদ্রাকে দেখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অন্তঃকরণ চঞ্চল হয়ে উঠল। বসুদেব সম্পর্কে তাঁর নিজের মামা এবং সুভদ্রা তাঁর আপনার মামাতো বোন। কিন্তু, সেটা কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলনা। অবশ্য ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে এখনও এরকম বিবাহবিধি যে প্রচলিত নেই তা নয়; তবু কোনও বাধা যাতে না উদিত হয়, সেই কারণে অর্জুন কৃষ্ণকে সোজা-সুজি বললেন—"ইনি আমার মহিষী হলে সবদিক থেকেই মঙ্গল সম্পাদিত হয়; অতএব কি উপায়ে আমার সুভদ্রা লাভ হতে পারে তার অনুসন্ধান কর।" উপায় অনুসন্ধানের কোনও আবশ্যকতা ছিল না; কৃষ্ণের সহায়তার অর্জুন যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি নাকি ক্ষত্রিয়দের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক কর্ম: অর্থাৎ বলপূর্বক কন্যাকে অপহরণপূর্বক বিবাহের অনুষ্ঠান। একদিন সুভদ্রা মহাগিরি রৈবতকের ও দেবতাদের অর্চনা শেষ করে যখন দ্বারকায় যাবার জন্য অগ্রসর হয়েছেন ঠিক তখন অর্জুন তাঁকে বলপূর্বক একটি উৎকৃষ্ট রথে উঠিয়ে নিয়ে একেবারে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে মহাবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। যাদবগণ অর্জুনের এই ব্যবহারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের হস্তক্ষেপে তাঁরা কিছুই করে উঠতে পারলেননা। সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের এবম্বিধ পরিণয় তাঁরা মেনে নিলেন সত্য কিন্তু বোধকরি এই ঘটনার পর থেকে তাঁদের অনেকেই অর্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট রইলেন না। বল-দেব তো পাণ্ডবদের একেবারেই পছন্দ করতেননা। এই ঘটনার পর

থেকে তিনি পাণ্ডবদের অনুকূলে আর কখনও মত প্রকাশ করেননি। এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে নাকি অর্জুনের বনবাসও সম্পূর্ণ হল। ওদিকে যুধিষ্ঠিরকে আগে থেকেই দূত পাঠিয়ে সব জানানো হয়েছিল। সুতরাং সুভদ্রাসহ অর্জুনকে ইন্দ্রপ্রস্থে খুব ভালভাবেই অভ্যর্থনা জানানো হল। দ্রৌপদীও বিশেষ ক্রোধপ্রকাশ করলেন না; বিবাহটা বিনা আপত্তিতে মেনে নিলেন। বিবাহের পর যাদবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে এসে বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করে গেলেন। কেবল কৃষ্ণ আরও কিছুকালের জন্য সেখানে রয়ে গেলেন। ক্রমে সুভদ্রার একটি পুত্র হল। এই ছেলেটিই স্বনামধন্য অভিমন্যু। মহাভারতকার বলেছেন,—এই সময় দ্রৌপদীও পঞ্চপতির কাছ থেকে পঞ্চ পুত্র লাভ করেন। যেভাবে এই উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সমস্ত জিনিসটাই সাজানো বলে মনে হয়; কারণ দ্রৌপদী ঠিক পাঁচ বৎসরেই পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি নিশ্চয়ই। এর জন্যে প্রতি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বেশ কিছুটা সময় অতীত হবার কথা। আসলে দ্রৌপদীর এই পঞ্চপুত্র লাভের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ থেকে যায়। পুত্র হয়ত তাঁর হয়েছিল। কিন্তু মহাভারত যেভাবে জানিয়েছেন তত সংক্ষেপে হয়নি। এই পুত্রদের খুব কম বিবরণই মহাভারতে পাওয়া যায়। তারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল, এরকম উল্লেখ আছে; এটুকুও জানা যায় যে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তারা অশ্বত্থামাকর্তৃক নৈশযুদ্ধে শিবিরের মধ্যে নিহত হয়। পঞ্চপাণ্ডবের তথাকথিত পঞ্চপুত্র মহাভারতে অতি নগণ্য ভূমিকা পালন করেছে যেক্ষেত্রে ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন, ইরাবান প্রভৃতির বীরত্ব উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

সুভদ্রার সঙ্গে পরিণয়ের কিছুদিন পরে অর্জুন একটি অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করেছিলেন, সেটি হচ্ছে খাণ্ডবদাহন। পুরাণকার বলেছেন, অর্জুন সপরিবারে গিয়েছিলেন যমুনায় জলবিহারে; সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণ। তাঁরা জলক্রীড়ার পর বিশ্রাম করছেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি নিজেই পরিচয় দিলেন যে তিনি অগ্নি। তিনি অপরিমিত ভোজন করেন, অথচ অল্পাহারী

নন। তাঁর ইচ্ছা যাবৎ প্রাণীসহ সমগ্র খাণ্ডববন দগ্ধ করেন, কিন্তু ইন্দ্রের সখা নাগরাজ তক্ষক সপরিবারে সেখানে বাস করেন। যখনই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হন তখনই ইন্দ্র প্রবল বর্ষণ ঘটিয়ে তাকে নিবারণ করেন; তাই তিনি অর্জুন এবং কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন যে তাঁরা যেন অস্ত্র ধারণ করে ইন্দ্রের বর্ষণকে রোধ করেন এবং প্রাণীদের নষ্ট করেন। অর্জুন জানতে চাইলেন, তিনি কি কারণে ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং কেনইবা খাণ্ডববন দগ্ধ করতে চান। অগ্নি এর ইতিহাস বিবৃত করলেন। এক সময় শ্বেতকী নামে এক রাজা দীর্ঘকাল যজ্ঞ করেন। অগ্নি দ্বাদশ বৎসর ধরে ক্রমাগত ধারায় বর্ষিত ঘৃত ভক্ষণ করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তিনি ব্রহ্মার শরানাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা বললেন—"বারো বছর ধরে ঘী খাওয়াই হচ্ছে তোমার এই স্বাস্থ্য-বিকৃতির এবং তেজোহীনতার কারণ; তুমি খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করে সেখানকার নানারকম জন্তুজানোয়ারের মেদমাংস ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হলেই আবার প্রকৃতিস্থ হবে।" সেই থেকেই অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সাতবার চেষ্টা করেও সফল হননি; প্রতিবারই অরণ্যবাসীগণ জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। অবশেষে, তাঁকে আবার ব্রহ্মার দ্বারস্থ হতে হল। তাঁরই পরামর্শক্রমে এবারে তিনি অর্জুন এবং কৃষ্ণের কাছে খাণ্ডবদাহনে সাহায্য-প্রাপ্তির জন্য এসেছেন। এটি নিতান্তই কাহিনী, কিন্তু আখ্যায়িকাটি যেমন বিচিত্র, ব্রহ্মার প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটিও তেমনি অদ্ভুত।

আসলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ছিল অন্যরকম। সমগ্র খাণ্ডবপ্রস্থ ঘিরে বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। এই অরণ্যে হয়তো কোনও হিংস্র জাতি বা দস্যুর বাসস্থান ছিল, কিম্বা পশুদের অত্যাচারেও প্রজাদের দুর্দশা-গ্রস্ত হতে হত;—অথবা, অরণ্যচারীদের কোনও বিদ্রোহের আভাসও হয়তো পাওয়া গিয়েছিল। যে কোনও কারনেই হোক, খাণ্ডবপ্রস্থের অরণ্যভূমিকে বিপদ থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই কারণেই সমস্ত অরণ্যভূমিকে ঘিরে ফেলে অগ্নিপ্রয়োগে সমস্ত অধিবাসী এবং অরণ্যপ্রাণীদের হত্যার মত বিভীষিকা যাঁরা সৃষ্টি

করতে পারেন তাঁদের হৃদয়হীনতা অপরিসীম। এই রকম নিষ্ঠুর হত্যালীলার আর একটি বিবরণ সমগ্র মহাভারতে পাওয়া যায়না। অভিমন্যুকে যখন সপ্তরথী ঘিরে বধ করেছিলেন, তখন তাঁদের নৃশংসতায় সমগ্র পুরাণ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে ; কিন্তু সেটাতো হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে নেহাৎই যুদ্ধের প্রয়োজনে ; কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এই দাহনযজ্ঞের বীভৎস বিবরণের আতিশয্যে পুরাণকার যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। হায়, এই কি বীরত্ব বা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক ; এই কি মহাভারতের পবিত্র উপাখ্যানের নির্দশন ; যে নাগ উপজাতীয় লোকেরা ভীমকে বিষের কবল থেকে মুক্ত করেছিল, অর্জুন সেই উপজাতির রাজা তক্ষকের পুত্রকে অবরুদ্ধ করলেন, যাতে সে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। সেই আহত অর্ধদগ্ধ পুত্রকে মুক্ত করবার জন্য যখন তার মা ছুটে এলেন অর্জুন তীক্ষ্ণবাণে তার মস্তক ছেদন করলেন ; অর্থাৎ স্ত্রী হত্যায় তিনি এতটুকু দ্বিধাবোধ করলেনা। হতভাগ্য তক্ষক তখন সেই বনে উপস্থিত ছিলেন না, কুরুক্ষেত্রে গমন করেছিলেন। নাগ-রাজপুত্র অশ্বসেন কোনক্রমে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। আর মুক্তি লাভ করেছিল ময় নামক একজন দানবজাতীয় স্থপতি।

যাই হোক, ভগবান হুতাশন খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ হবার পর সেখানকার জীবজন্তুগণের অপরিমিত বসা ও মেদ ভক্ষণ করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। ইন্দ্র বাধা দিতে এসে অনেক যুদ্ধ করলেন বটে কিন্তু তথাকথিত পুত্রের কাছে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হল। এই বিরাট ধ্বংসসাধন সমাপ্ত হলে, যে ইন্দ্র তক্ষকের পরম বন্ধু ছিলেন তাঁর মুখ দিয়েই কৃষ্ণ এবং অর্জুনের উদ্দেশ্যে বলানো হয়েছে, ঃ—"তোমরা যে মহাকার্যের অনুষ্ঠান করলে তা দেবতাদেরও দুষ্কর। আমি তোমাদের পরাক্রমদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হয়েছি। এখন তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" আমরা অবশ্য সেই বরপ্রার্থনা প্রসঙ্গে যাচ্ছিনা, কিন্তু উক্ত ইন্দ্রের শেষ পর্যন্ত বন্ধুবিস্মৃতির মহিমায় বিস্মিত হচ্ছি।

এবম্বিধ মহৎ কার্যের স্মারক হিসাবে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে একটি বিরাট সভাগৃহ নির্মাণ করলেন। স্থপতি ময়দানবকে এই গৃহনির্মাণ

করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই বিরাট সভাগৃহের নির্মাণে ও সাজ-সজ্জায় পাণ্ডবগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। বস্তুতঃ এটি যাতে তৎকালীন ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সব দেশের রাজসভার চেয়ে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ ও আড়ম্বরপূর্ণ হয় সেদিকেই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যুধিষ্ঠিরের কিন্তু এটি বোঝা উচিত ছিল যে তাঁর অপরপক্ষ কৌরবেরা এতে ঈর্ষান্বিত হবেন। এই পরিস্থিতিকে পরিহার করাই ছিল রাজনীতির দিক থেকে কাম্য। তিনি সেদিকটা যে একেবারে বিবেচনা করেননি তা নয়, তথাপি কৌরবদের ঈর্ষাকাতর দেখাটাই তাঁর বোধ হয় মনোগত অভিপ্রায় ছিল। অতএব পাণ্ডবপক্ষ থেকে এই বিশাল রাজসভার সংবাদ বিশেষ যত্নের সঙ্গে চারদিকে প্রচার করা হতে লাগল। তাঁরা, বিপুল আড়ম্বর সহকারে সেই রাজসভায় প্রবেশ করলেন। সেই সঙ্গে বহু রাজা আমন্ত্রিত হয়ে সেই সভাপ্রবেশের অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন। এইভাবে পাণ্ডবগণ বহু রাজন্যবর্গের আনুকূল্য লাভ করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করলেন।

দুই

পাণ্ডবদের ঈদৃশ আড়ম্বরপূর্ণ সভানুষ্ঠানের পর কতিপয় প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করবার জন্য খুব ধরাধরি করতে লাগলেন। এত বড় রাজা যাঁর এত বড় সভা,—তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ না করলে চলবে কেন? যুধিষ্ঠির এই প্রশংসায় বিগলিত হয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করবার সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি দূত পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে ;—তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করাটা একান্ত দরকার। এর আগে কিন্তু তাঁর উচিত ছিল ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শ গ্রহণ করা, কেননা তাঁরাই তাঁর বংশের জ্যেষ্ঠ পুরুষ। দেখা যাচ্ছে, তিনি তাঁদের অগ্রাহ্য করলেন। এটা অত্যন্ত অনুচিত কাজ হয়েছিল। কারণ, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলেও সমগ্র পাণ্ডব এবং কৌরবের মিলিত প্রচেষ্টায় যদি হত তাহলে যজ্ঞের

পরবর্তীকালে এনিয়ে কৌরবদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতনা। এই সময় থেকেই পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে সব বিষয়ে পুরোভাগে এনেছেন। চতুর কৃষ্ণ এই উপলক্ষ্যে একটি সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি যে রাজসূয় যজ্ঞের অনুকূলে, সেকথা জানালেন; কিন্তু একথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে মগধের প্রবল প্রভাপান্বিত রাজা জরাসন্ধ জীবিত থাকতে এই যজ্ঞসম্পাদনেযুধিষ্ঠির কখনই কৃতকার্য হতে পারবেন না। মহারাজ জরাসন্ধ বহু ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গকে নিজের অধীনে এনেছিলেন, বহু শক্তিমান নৃপতির সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব সূত্রেও আবদ্ধ ছিলেন। তার ওপর শিশুপালের মত প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন বীর তাঁর সেনাপতি ছিলেন। অতএব তাঁর ক্ষমতাকে প্রতিহত করতে না পারলে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। জরাসন্ধের উপর কৃষ্ণের পুঞ্জীভূত আক্রোশ ছিল, কেননা তাঁর ভয়ে ভীত হয়েই তাঁর বিরাট বংশ ও আত্মীয়-বংশদের মথুরা ছেড়ে দ্বারবতী নগরে চলে আসতে হয়েছিল। এই যজ্ঞকে উপলক্ষ্য করে যুধিষ্ঠিরের সহায়তায় যদি এত বড় শত্রুকে নিপাত করা যায়, তাহলে তার চেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। অতএব, স্থির হল বাসুদেব ভীম আর অর্জুনকে নিয়ে জরাসন্ধ বধে যাত্রা করবেন।

ছলের আশ্রয়ে ছাড়া কৃষ্ণ কোনও পরিকল্পনায় অগ্রসর হতেন না, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ভীম এবং অর্জুনকে তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদ পরানো হল এবং এই ছদ্মবেশে কৃষ্ণ তাঁদের মগধে নিয়ে চললেন। যদিচ ভীমার্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ছিলেন, তথাপি মগধপুর পর্যন্ত তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গেই রেখেছিলেন। খাণ্ডবপ্রস্থ থেকে মগধ অনেকটাই দূর। প্রথমে তাঁরা কুরুদেশ উত্তীর্ণ হয়ে কুরু-জাঙ্গলের মধ্য দিয়ে পদ্মসরে এলেন। তারপর কালকূট অতিক্রম করে গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা, সরযূ,—এইসব অরণ্যময় প্রদেশের নদী-সমূহ পার হয়ে পূর্বকোশলে এসে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে মিথিলা এবং মিথিলায় গিয়ে চর্মন্বতী নদী পার হলেন। তারপর গঙ্গা এবং শোণ অতিক্রম করে মগধদেশের কাছাকাছি এসে পৌঁছোলেন।

মগধের গোড়াতেই গোরথগিরি। সেই পর্বতে আরোহণ করে তাঁরা মগধপুরীকে পর্যবেক্ষণ করলেন। এই পুরীকে ঘিরে ছিল পাঁচটি পাহাড়,—বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক। এরই মধ্যবর্তী যে নগর, সেইটিই মগধপুর বা গিরিব্রজ নামে পরিচিত ছিল।

প্রথমেই তাঁরা উক্ত ছদ্মবেশে পুরদ্বারে নগরচৈত্যের সামনে এসে তিনটি মহানাদকারী বিশাল ভেরীকে ভেঙে ফেললেন ; তারপরে চৈত্য-প্রাকারের কাছে এসে পুরাতন চৈত্যশৃঙ্গে অবস্থিত বহু বস্তুকে ভেঙে নষ্ট করে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা গিরিব্রিজপুরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও প্রয়োজন ছিল না এবং এতে তাঁদের কোনও বিক্রমও প্রকাশ পায়নি, তথাপি তাঁরা অনাবশ্যক কতক গুলি রমণীয় বস্তুকে ধ্বংস করে ফেললেন। রাজা জরাসন্ধের কাছে এইসব খবর পৌঁছোলো। এই সময় নানা দুর্নিমিত্ত দৃষ্টিগোচর হওয়ায় জরাসন্ধ দীক্ষিত এবং নিময়স্থ হয়ে উপবাসে ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না কিসের জন্য এই ব্যক্তিরা এইভাবে তাঁর পুরে প্রবেশ করছেন। এদিকে, ওই তিনজন রাজমার্গ দিয়ে জরাসন্ধের প্রাসাদের দিকে আসতে লাগলেন। আসবার সময় তাঁরা মালাকারদের দোকান থেকে জোর করে মাল্যগ্রহণ করে সেগুলি গলায় পরলেন। এইভাবে তাঁরা প্রাসাদের অন্তঃপুরে মহারাজ জরাসন্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। স্নাতকবেশী ব্রাহ্মণদের কোনও রক্ষীই বাধা দেয়নি। জরাসন্ধ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের পাদ্য, মধুপর্ক প্রভৃতি দিয়ে পূজা করলেন। তাঁরা কিন্তু কোনও কথা বললেন না, কেবল কৃষ্ণ বললেন যে, এঁরা পূর্বরাত্রি অতীত হলে রাজার সঙ্গে আলাপ করবেন। জরাসন্ধ সেই অনুসারে অর্ধরাত্র সময়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলেন। এইবার কৃষ্ণ তাঁর কাছে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করলেন যে তাঁরা আসলে স্নাতক ব্রাহ্মণ নন, তাঁরা ক্ষত্রিয় এবং তিনি নিজে বসুদেবপুত্র, তাঁর দুজন সঙ্গী হচ্ছেন পাণ্ডুপুত্র ভীম আর অর্জুন। তিনি জানালেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য কপটে জরাসন্ধকে বধ করে তাঁর বন্দী বহু রাজাকে মুক্তি দেওয়া। এঁদের নাকি তিনি পশুপতির পূজায় বলি দেবার বাসনা করেছিলেন।

জরাসন্ধ নির্ভয়ে বললেন, তিনি প্রত্যেকটি রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তবে বন্দী করে এনেছেন ; অতএব কৃষ্ণের কথায় তিনি তাঁদের ছেড়ে দিতে রাজি নন। এঁদের যে বলিপ্রদান করা হবে—তাও তিনি নিশ্চিতভাবে বললেন না। জরাসন্ধ প্রকৃতই বীর ছিলেন, কেননা এই কপট ব্যক্তিদের প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার না করে তিনি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রস্তাবই মেনে নিলেন, যদিচ উপবাসে তাঁর দেহ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকের আজ্ঞা দিলেন। কৃষ্ণ তখন মহারাজ জরাসন্ধকে বললেন—তিনি তাঁদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, বেছে নিন। জরাসন্ধ ভীমকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন, কেননা, তিনি মল্লযুদ্ধের বাসনা করেছিলেন। জরাসন্ধকে কি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল তা মহাভারত-পাঠকমাত্রেই জানেন। একজন উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিনা প্ররোচনায় ছলক্রমে যুদ্ধের নামে হত্যা করে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবদ্বয় অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হয়ে ফিরে এলেন। তারপর নামে মাত্র কতকগুলি দিগ্বিজয় কার্য সাধিত হল ; এই কার্যের নায়ক ছিলেন—ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব।

এর পরে রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা হল। ব্যাস যেসব ঋত্বিকদের নিয়োগ করলেন তাঁদের মধ্যে অধ্বর্যু ছিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য (কোন যাজ্ঞবল্ক্য বলা শক্ত), দুজন হোতা ছিলেন—বসুপুত্র পৈল এবং ধৌম্য ; উদ্গাতা ছিলেন ধনঞ্জয় গোত্রীয় সুসামা। এই ধনঞ্জয় সম্প্রদায় বহু প্রাচীন কাল থেকে সামগানকে রক্ষা করে এসেছিলেন। তাঁদের শিষ্যবর্গ ও পুত্রগণ সদস্য হলেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস নিজে সর্বাধিনায়ক ব্রহ্মার পদে দীক্ষিত হলেন। এইবার যজ্ঞে নিমন্ত্রণের জন্য চারদিকে দূত পাঠানো হতে লাগল। নকুল নিজে গেলেন হস্তিনাপুরে কৌরবদের নিমন্ত্রণ জানাতে। ইতিমধ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হলেন। সব আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা যখন এসে পড়লেন তখন যজ্ঞের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। দুঃশাসন নিলেন ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধারণের ভার, অশ্বত্থামা বিপ্রসেবায় নিযুক্ত হলেন, সঞ্জয় রাজ-

পরিচর্যায় তৎপর হলেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করতে লাগলেন ; রজত, সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষিণাপ্রদানের কাজে কৃপাচার্যকে নিযুক্ত করা হল। দুর্যোধন নিযুক্ত হলেন উপায়ন প্রতিগ্রহ কাজে। এই কাজটি হচ্ছে যাঁরা পাণ্ডবদের যজ্ঞ উপলক্ষ্যে উপহার পাঠিয়েছেন সেই সব উপহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করা। এই কাজটি দুর্যোধনকে ইচ্ছা করেই দেওয়া হল, যাতে তিনি পাণ্ডবদের বিপুল ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষাকাতর হন। বস্তুতঃ, দুর্যোধন যতই এই বিপুল ঐশ্বর্য গ্রহণ করে পাণ্ডবদের রাজকোষে পাঠাচ্ছিলেন ততই নিজের দারিদ্র্য অনুভব করে ক্লিষ্ট হচ্ছিলেন। পাণ্ডবদের গূঢ় অভিসন্ধি এতে সিদ্ধ হয়েছিল। কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর চেয়ে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা আর কি হতে পারে।

যজ্ঞের অভিষেক দিবসে মহর্ষিগণ এবং ব্রাহ্মণগণ রাজন্যবর্গের সঙ্গে অন্তর্বেদীতে প্রবেশ করলেন। এর পর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণদের এবং রাজাদের সৎকার বিধানের উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন,—যজ্ঞস্থলে আচার্য, ঋত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয়ব্যক্তি,—এই ছয়শ্রেণী হচ্ছেন আর্ঘ্য পাবার উপযুক্ত ;—এরা সকলে তো এক একটি অর্ঘ্য পাবেনই, এ ছাড়া যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ বিবেচিত হবেন তিনিই প্রধান অর্ঘ্যটি পাবেন। যুধিষ্ঠির এবিষয়ে ভীষ্মের মতই প্রার্থনা করলেন। ভীষ্ম নিজের বিবেচনা অনুযায়ী বললেন—কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করা কর্তব্য।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। চেদিরাজ এবং নিহত জরাসন্ধের প্রধান সহায় শিশুপাল তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন, যেহেতু কৃষ্ণ নিজে রাজা, আচার্য বা ঋত্বিক, কোনও পর্যায়েই পড়েন না, সেহেতু তিনি অপ্রাপ্তলক্ষণ এবং তাঁকে অর্ঘ্যপ্রদান করলে সভার অবমাননা করা হবে। এর উত্তরে ভীষ্ম অনেক লম্বা লম্বা বক্তৃতা করলেন, কিন্তু সহদেব সহসা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সবাইকার সামনে বললেন,—"যে সব অধম ব্যক্তি কৃষ্ণের পূজা সহ্য করতে না পারে, আমি তাদের

মস্তকে পদার্পণ করি";—এমন কি,—সেই সঙ্গে আস্ফালনভরে পাদোত্তলন করে পাদ প্রহারের অভিনয় করলেন। সভায় আগুন জ্বলে উঠল। চারিদিকে উত্তেজনা দেখা দিল, তখন ভীষ্ম তাতে ইন্ধন যোগ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—"তুমি এ সব গ্রাহ্য কোরোনা, এই সব লোকেরা কুকুরদের মত চেঁচামেচি করছে, এদের মতিচ্ছন্ন ঘটেছে,—এরা যা ইচ্ছা করুক, কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না, তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অটল থাক।" শিশুপাল তখন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়, যাঁকে পাণ্ডবেরা অর্ঘ্য প্রদানে উদ্যত হয়েছেন, সেই কৃষ্ণের জীবনকাহিনীর কতিপয় অপ্রীতিকর অধ্যায় তুলে ধরলেন। তাঁর উক্তির একটি বর্ণও মিথ্যা ছিল না। এর উত্তরে ভীষ্মের মুখ দিয়ে শিশু-পালের জন্মরহস্য সম্বন্ধে নেহাৎই একটি অলৌকিক উপাখ্যান পেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে কৃষ্ণ নাকি তাঁর শত অপরাধ মার্জনা কববার জন্য তাঁর মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এর পরে ভীষ্ম এবং শিশুপালের মধ্যে যথেষ্ট কটুবাক্য বিনিময় হল এবং রাজন্য-বর্গের অনেকে শিশুপালের পক্ষ অবলম্বন করলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে আত্মহারা প্রবীনতম ভীষ্মের মুখ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বেরুলো "হে নৃপতিগণ, তোমরা আমাকে বধ কর বা কটাগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম।" এর পরেও শিশুপাল এবং কৃষ্ণের মধ্যে কিছু তর্কবিতর্ক চলেছিল; কিন্তু শিশুপাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বেই হঠাৎ কৃষ্ণ প্রকাশ্য সভাস্থলে ছুটে গিয়ে চক্র দিয়ে তাঁর মস্তক ছেদন করলেন। অথচ এই শিশুপাল ছিলেন যুধিষ্ঠিরদের মত কৃষ্ণের আর এক পিসি যাদবীর সন্তান। পাণ্ডবদের যজ্ঞে সবাইকার সামনে এই কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটল, অথচ এর পরে কেউ যুদ্ধের উদ্যম করলেন না।

আসলে সমস্ত উত্তেজনার জন্য দায়ী ছিলেন পাণ্ডবপক্ষ। প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সম্পর্কে কখনও ভীষ্মের মতামত গ্রহণ করেননি, হঠাৎ তিনি কেনইবা অর্ঘ্যপ্রদান উপলক্ষে তাঁর মত প্রার্থনা করতে গেলেন বোঝা দুষ্কর। তিনি নিজে থেকেই অর্ঘ্যপ্রদানের জন্য কৌরবজ্যেষ্ঠ

ভীষ্মের নাম, অথবা ব্যাসদেবের নাম করতে পারতেন,—তাহলে এই বিক্ষোভের কারণ ঘটতনা। শিশুপাল যখন আমন্ত্রণ রক্ষা করে যজ্ঞস্থলে এসেছিলেন এবং পূর্বেও যজ্ঞে অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন তিনি যুদ্ধ করবার বাসনা নিয়ে সেখানে আসেননি, এটা নিশ্চয়। যুধিষ্ঠির জানতেন যে এর আগে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে তাঁর বিপক্ষে কম সংখ্যক রাজন্যবর্গ নেই, এমনকি, যে কৌরবদের তিনি শেষ মুহূর্তে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, তাঁরাও তাঁর স্বপক্ষে ছিলেননা। অতএব তাঁর প্রত্যেকটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। এর পর, সহদেবের মত একজন নগণ্য পাণ্ডব যখন আমন্ত্রিত ক্ষত্রিয়দের মাথায় পদাঘাত করতে চাইলেন তখন সেটা নিরতিশয় ইতর কাজ হয়েছিল ; যুধিষ্ঠির তাকে নিবৃত্ত করবার মত একটি কথাও বলেননি। শেষ পর্যন্ত কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের মুখ থেকেও একই কটূকাটব্য এবং গালি নিসৃত হল। মাননীয় অতিথিদের আহ্বান করে নিয়ে এসে তাঁদের উদ্দেশ্যে কটূক্তিবর্ষণের মত নিন্দনীয় অপরাধ আর কিছুই হতে পারে না। এই সমস্ত ঘটনার জন্য যুধিষ্ঠিরই দায়ী। গোড়া থেকেই তিনি একটুও রাজনীতিজ্ঞের রীতি অনুসরণ করেননি। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডব-প্রবর্তিত এই রাজসূয়যজ্ঞের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত অনুষ্ঠান হচ্ছে শিশুপাল হনন। তাঁর স্পষ্টোক্তির কোনও উত্তর দিতে না পেরে সভাস্থ আমন্ত্রিত সজ্জনদের গালি দেওয়া হয় এবং পরে তাঁকে কাপুরুষের মত হীনভাবে হত্যা করা হয়।

যাই হোক, তার পরে যুধিষ্ঠির নিজেই শিশুপালের পুত্রকে চেদি রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যজ্ঞ নাকি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির অবভৃথ স্নান করে দীক্ষিত অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হলেন। এর পরে সকলেই যথাস্থানে ফিরে গেলেন ; কেবল দিন কয়েকের জন্য রয়ে গেলেন রাজা দুর্যোধন এবং তাঁর মাতুল সুবলনন্দন শকুনি। কি মনে করে দুর্যোধন এবং তাঁর মাতুল থেকে গিয়েছিলেন জানা যায় না, কিন্তু পাণ্ডবগণ নানাভাবে দুর্যোধনকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছিলেন। অবশেষে, তিনি অপমানিত বোধ করে হস্তিনায় ফিরে

গেলেন। এইভাবে রাজসূয় পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল।

সমস্ত সভায় কার্যবলী আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করলে পাণ্ডবদের অহঙ্কার সঙ্কীর্ণতা, আতিথ্যের প্রতি অবমাননা এবং অসৌজন্য ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয়না। উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে—সব আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের উপেক্ষা করে কৃষ্ণস্তুতি এবং তাঁর সন্তুষ্টিবিধান ও অপরটি হচ্ছে, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, যিনি এ পর্যন্ত সব কাজেই অপারগতা প্রমাণ করেছেন, তাঁর ইচ্ছাকৃত দুর্ব্যবহার ও দুর্বাক্য প্রয়োগ। আরও একটি ব্যর্থ ভূমিকা হচ্ছে রাজমাতা কুন্তীর। যেক্ষেত্রে রাজমাতা সত্যবতী রমণী হয়েও দৃঢ়তার সঙ্গে রাজকার্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন, রাজকুলকে শাসিত ও সংযত রেখেছেন, সেই ক্ষেত্রে কুন্তী তাঁর পুত্রদের একটিও সদুপদেশ প্রদান করেননি এবং প্রয়োজনীয় বিষয়েও কিছু-মাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেননি। শিশুপাল সম্বন্ধে কোনও মমত্ববোধের পরিচয়ও তিনি প্রদান করলেন না। তিনি দৃঢ়চিত্ত হলে এসব বিরোধের অনেকটাই প্রশমিত হতে পরেত।

দুর্যোধন শোচনীয় আত্মধিক্কার নিয়ে ফিরে এলেন। পূর্বের শত্রুতা আরও অনেক প্রবলভাবে তাঁর অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। এই সময় থেকে দুর্যোধনের উপর যিনি অসামান্য প্রভুত্ব বিস্তার করতে আরম্ভ করেন, তিনি হচ্ছেন তাঁর মাতুল সুবলনন্দন শকুনি। তিনি পরামর্শ দিলেন, পাণ্ডবদের বিনাশ সাধনের জন্য তো অনেক কিছু মন্ত্রণাই করা হয়েছে, কোনোটাই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি ; এইবার তাঁদের পাশাখেলায় আমন্ত্রণ করা যাক। একমাত্র দ্যূতক্রীড়ায় পরা-জিত করতে পারলেই পাণ্ডবদের রাজলক্ষ্মীর কৃপা থেকে বঞ্চিত করা যাবে। শকুনি বললেন, তিনি অক্ষবিষয়ে অভিজ্ঞ, মর্মজ্ঞ, পণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ। যুধিষ্ঠির নিজেও দ্যূতপ্রিয় ; কিন্তু উক্ত বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা নেই। ক্ষত্রিয়দের রীতি অনুসারে দ্যূতের বা যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রিত হলে অবশ্যই তাকে আসতে হবে ; অতএব, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করা যাক। প্রয়োজন হলে কপটক্রীড়ায় তাঁকে পরাজিত করে সর্বস্ব অপহরণ করা যাবে। আমরা সকলেই জানি, শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির

পাশাখেলায় হেরেছিলেন। মহাভারতে শকুনির মুখে "কপটপশা" শব্দটি উচ্চারণ করানো হয়েছে। পুরাণ অনুসারে ধারণা হয় শকুনি পর পর কপট পাশায় যুধিষ্ঠিরকে হারিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যুধিষ্ঠির যেরকম নির্বোধের মত পণ রেখে খেলেছিলেন, তাতে তাঁর বুদ্ধির স্থূলতাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মহাভারতে যেভাবে পাশাখেলা এবং তৎপরবর্তী বিবরণগুলি বর্ণিত হয়েছে তার সবটাইকি সত্য? কৌরবেরা পাণ্ডবেরা শত্রু ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁরা কি এতই কদর্য ছিলেন যে নিজেদের কুলকামিনীকে সভায় ডেকে এনে বর্বরের মত ব্যবহার করবেন? পাশায় যেভাবে যুধিষ্ঠির পণ রেখে যাচ্ছিলেন, তাঁর মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কি সেভাবে পণ রেখে পাশা খেলতে পারতেন? ঘটনাগুলি বাস্তবে কিভাবে ঘটেছিল বলবার উপায় নেই, কিন্তু যেভাবে মহাভারতের সভাপর্বে বিবৃত হয়েছে তার অনেকটাই অতিবর্ণিত বলে মনে হয়।

এই পাশাখেলায় ধৃতরাষ্ট্রকে সহজে রাজি করানো যায়নি; তিনি অনেকবার ইতস্ততঃ করেছিলেন; কিন্তু দুর্যোধনের কাছে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করলেন। তাঁর অন্তরগত অভিলাষ যে একটা না ছিল তা নয়, তবে কোনও সর্বনাশা পরিণতি সম্বন্ধে তিনি বরাবরই ভয় পাচ্ছিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর দুর্যোধন তাঁকে বললেন— "মহারাজ, আমার অক্ষবিশারদ মাতুল দ্যূতদ্বারা পাণ্ডবদের সর্বহারা করতে পারবেন বলেছেন; আপনি খেলায় অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র তখন পাশাখেলা অনুষ্ঠানের জন্য "তোরণস্ফাটিকা" নামে একটি সভা-গৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন এবং বিদুরকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়ে দিলেন কৌরবসভায় দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। এই আহ্বানটি কিন্তু দুর্যোধন নিজে করলেন না। এখানে এও লক্ষ্যণীয় যে সমস্ত কাজই দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে করে যাচ্ছেন, একটি কাজও তিনি নিজের দায়িত্বে করবার আদেশ দেননি। অঙ্গরাজ্যে কর্ণের অভিষেক দুর্যোধন নিজে করেছিলেন,—সেটা একটা ব্যতিক্রম হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্যোধন নিজে রাজা হয়েও অন্ধ পিতাকে মহারাজ

বলে সম্বোধন করেছেন এবং মতামতের ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা জানালেন। কুশলবিনিময়ের পর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছার কথা জানিয়ে বললেন—"তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে হস্তিনায় এসে দুর্যোধনের সঙ্গে সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ, এই দ্যূতক্রিয়া সুহৃদের মত হবে—এইটাই বিদুর তাঁকে জানালেন। তিনি কিন্তু একবারও কৌরবদের দুষ্ট পরিকল্পনার কথা জানালেননা, বা তার আভাসও দিলেননা। যুধিষ্ঠির এর পিছনে একটা কু-অভিসন্ধি আছে এটা আন্দাজ করলেন এবং বিদুরকে বললেন—"আপনি কি এই পাশা খেলা উচিত হবে বলে মনে করেন? বলুন, আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলব।" বিদুর বললেন—"দেখো, দ্যূত যে অনর্থের মূল তা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এ থেকে নিবৃত্ত করতেও চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু তথাপি তিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, এখন তোমার বিবেচনায় যা হয় তাই কর।" যেবিদুর জতুগৃহ দগ্ধ হবার আগে এবং পরে প্রত্যক্ষভাবে পাণ্ডবদের এত সাহায্য করেছিলেন, এবার তিনি মোটেই সেভাবে অগ্রসর হলেননা, বরঞ্চ ব্যাপারটা যেন একটু চেপেই যেতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন "ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ছাড়া আর খেলোয়াড় কারা আছেন? আপনি বলুন, আমি তাদের পরাজিত করব।" বিদুর বললেন "রাজা শকুনি, বিবিংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত এবং জয় সেখানে উপস্থিত আছেন।" যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন তাঁর প্রতিপক্ষ কত প্রবল। তথাপি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি রাজি হলেন। তিনি বললেন, "ধৃতরাষ্ট্রর এই পাশাখেলায় যেতে আমার ইচ্ছা করছে না। কিন্তু আপনি বলছেন বলেই তাতে প্রবৃত্ত হব। যদি আমাকে সভায় আহ্বান না করত তাহলে শকুনির সঙ্গে খেলতুম না, কিন্তু যখন আহূত হয়েছি, তখন নিবৃত্ত হবনা, এইটাই আমার সনাতন ব্রত।" বিদুরের উপর প্রবল বিশ্বাস নিয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনায়

পাশা খেলতে এলেন, কারণ তিনি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করতেন যে বিদুরের মত হিতৈষী তাঁদের আর কেউ নেই ; কিন্তু সেই বিদুর এবারে আর কিছুতেই মুখ খুললেন না। রাজমাতা কুন্তীও এতটুকু বাধা প্রদান করলেন না। যুধিষ্ঠির ভাইদের এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে হস্তিনায় এলেন পাশা খেলতে, সঙ্গে রইলেন কয়েজন অনুচর।

সভায় বহু অভ্যাগত জনের সমাগম হয়েছিল। যুধিষ্ঠির সকলের সঙ্গে কুশলবিনিময়ের পর খেলার নিয়মানুসারে জানতে চাইলেন তিনি এই লোকসমবায়ের মধ্যে তার তুল্যমানের কোন ব্যক্তির সঙ্গে খেলবেন। এর উত্তরে দুর্যোধন বললেন "আমি সমুদয় ধন এবং রত্ন প্রদান করব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হয়ে ক্রীড়া করবেন।" যুধিষ্ঠির অবশ্য আশা করেননি যে দুর্যোধন তাঁর প্রতিপক্ষ হবেন, কেননা তিনি জানতেন যে ধূর্ত দুর্যোধন শকুনিকেই নিয়োগ করবেন।" তিনি কেবল এই প্রতিবাদটুকু করলেন যে একজনের প্রতিনিধি হয়ে খেলা করা তাঁর মতে অসঙ্গত ; যাই হোক, তিনি উক্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলতেই সম্মত আছেন। এই ষড়যন্ত্রে কিন্তু দুর্যোধনকে স্বধর্মচ্যুত হতে দেখা যায়। তিনি সর্বদা বিপক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি বিবাদে প্রবৃত্ত হতেন ; এখানে যে কপটতার আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাকে সমর্থন করা যায় না। বস্তুতঃ ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে তিনি এতটা লজ্জিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন যে প্রতিশোধের একটা তীব্র স্পৃহা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। যে কোনভাবেই পাণ্ডবদের পর্যুদস্ত করবার জন্য তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই স্বীয় আদর্শ-বিচ্যুত হতে দ্বিধা করেননি।

খেলা আরম্ভ হল। একুশ দফা খেলায় প্রতিবারই যুধিষ্ঠির হেরে গেলেন। প্রত্যেকবারই ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন, আর জিজ্ঞাসা করছিলেন তাঁদের জয় হয়েছে কিনা। বোধ করি সর্বশেষ জয়ের খবরে তিনি বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির ভাইদের এবং নিজেকে পণ রেখেছিলেন ; আর শেষদানে পণ রেখেছিলেন নিজের স্ত্রী দ্রৌপদীকে। চূড়ান্ত ভাবে হেরে যাবার

পর দুর্যোধন বিদুরকে বললেন,—দ্রৌপদীকে তিনি রাজসভায় নিয়ে আসুন। বিদুর বিরক্তি প্রকাশ করে এই কাজে নিজের অসম্মতি জানালেন। এর পর সূতপুত্র প্রতিকামীকে পাঠানো হল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিকামীও দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় আনাবার মত মনোবল দেখাতে পারলেন না। অবশেষে দুঃশাসন গিয়ে রজস্বলা একমাত্র বসনধারিনী দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এলেন। তাঁর স্বপক্ষে তাঁর স্বামিরা, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি কেউ কোন কথা বললেননা, দুঃশাসনকে সংযতও করলেন না। পরন্তু দুঃশাসন তাঁকে আরও বেগে আকর্ষণ করে "দাসী, দাসী" বলে হাসতে লাগলেন। দ্রৌপদী ভীষ্মের কাছে আবেদন জানালেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে উত্তর এল তা যেমন অন্তঃসারশূন্য তেমনি নির্বীর্য। তিনি বললেন—"তোমার স্বামীই কিছু বলতে পারছেননা যেহেতু তিনি তোমাকে পণ রেখেছিলেন। তিনি যখন স্বয়ং তোমার অবমাননা উপেক্ষা করেছেন তখন আমি তোমার আবেদনে সাড়া দিতে পারছিনা।" এই সময় দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ প্রশ্ন তুললেন—"যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখবার আগেই নিজে পরাজিত হয়ে স্বত্ব বর্জিত হয়েছেন। তাহলে পরবর্তী পণের স্বীকৃতিতে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলে স্বীকার করতে পারা যায় না।" কর্ণ এর উত্তরে বললেন—"যখন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্বস্ব পণ করলেন, আর দ্রৌপদী সেই সর্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি এই কৃষ্ণা জয়লব্ধ নয়, এটা কি করে অনুমান করলে ? তুমি বালক, তুমি পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর যা কিছু আছে সব গ্রহণ কর।" কর্ণের কথা শোনবামাত্র পাণ্ডবগণ নিজেদের উত্তরীয়বস্ত্রগুলি ফেলে দিয়ে সভায় উপবেশন করলেন। কিন্তু, কর্ণের তথাকথিত যুক্তি সমর্থনযোগ্য ছিলনা. কারণ যুধিষ্টির সর্বস্ব পণ রাখবার পরও যখন দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন তখন সেটা মেনে নেওয়া হয়েছিল কেন ? কৌরবপক্ষ যখন যুধিষ্ঠিরের সর্বস্বের অতিরিক্ত দ্রৌপদীকে পণ হিসাবে স্বীকার করেছিলেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁকে এই সর্বস্বের মধ্যে ধরেননি ; অতএব বিকর্ণ ঠিক কথাই বলেছিলেন।

কিন্তু, বিকর্ণ এনিয়ে আর কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করেননি। অতঃপর দুঃশাসন দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করতে লাগলেন। তখন দ্রৌপদী কৃষ্ণকে চিন্তা করতে লাগলেন এবং মহাভারতের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে দ্রৌপদীর অঙ্গে একের পর এক বস্ত্র সংযোজিত হতে লাগল, আর শেষ পর্যন্ত দুঃশাসনকে এই প্রযত্নে ক্ষান্ত হতে হল। এইবার মহামতি বিদুর কথা বলবার সাহস পেলেন, শুধু তাই নয়,— একটা লম্বা চওড়া পৌরাণিক কাহিনীও বলে ফেললেন। সভাস্থল বেশ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে দেখে শেষ পর্যন্ত কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন— "আর কিছু করবার প্রয়োজন নেই, এইবার দাসী দ্রৌপদীকে ঘরে নিয়ে যাও।" কিন্তু দ্রৌপদী রুখে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি আগে সভায় সমস্ত ব্যক্তির কাছে আবেদন জানিয়েছি যে আমি রজস্বলা এবং একবস্ত্র পরিহিতা। কুরুবংশীয়দের কাছে এই যে আমার বস্ত্র আকর্ষণ করা হয়েছিল এর বিরুদ্ধে এঁরা কেউ নিন্দা করেন নি। আমি জানতে চাই কেন দুর্যোধনের এই অধর্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করা হল: এর উত্তর নিয়ে তবে আমি যাব।" আবার সেই সামর্থ্যহীন ভীষ্ম বললেন—"ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার এই প্রশ্নের যে রকম সিদ্ধান্ত করবেন, তাই প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হবে। তুমি জিতা কিংবা অজিতা হয়েছ, ইনিই সেটি সম্যগ্‌ভাবে নিরূপণ করুন।" এর চেয়ে নিষ্ঠুর বাক্য আর কি হতে পারে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে কোনও উত্তর এল না। তখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বললেন—"এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নন। তুমি আমার অনুমতিক্রমে রাজভবনে প্রবেশ করে রাজপরিবারের অনুগত হও। তুমি বরঞ্চ এঁদেরই কাউকে পতিত্বে বরণ করে নিজের নিরাপত্তাকে দৃঢ় কর।" দুর্যোধন এসব শুনে যুধিষ্ঠিরকে বললে - "মহারাজ, তোমার ভাইরা তোমার বশীভূত; কিন্তু এখন বল তোমার স্ত্রী দ্রৌপদী পরাজিত হয়েছে কিনা।" এর পরেও দুর্যোধনের যুধিষ্ঠিরকে "মহারাজ" সম্বোধন আশ্চর্য লাগে; বোধ হয় সংস্কারবশতই এটি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই কথা বলে তিনি হাসতে হাসতে দ্রৌপদীর দিকে চেয়ে বসন উত্তোলন করে তাঁকে

নিজের উরুর মধ্যস্থল দেখালেন। সমগ্র রাজসভা লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল। এইবার বিদুর একটি কূট মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন "দেখো যদি যুধিষ্ঠির নিজের পরাজয়ের আগে দ্রৌপদীকে পণ রেখে ক্রীড়া করতেন তাহলে ওঁকে তাঁর যথার্থ প্রভু বলে স্বীকার করা যেত, কিন্তু যখন তিনি নিস্ব হয়ে গেছেন তখন তাঁর কাছে বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্নার্জিত ধনের মত, অতএব দ্রৌপদীকে দাবী করে ধর্মচ্যুত হোয়োনা।" তিনি প্রকারান্তরে বিকর্ণকেই সমর্থন করলেন। কিন্তু দুর্যোধন কাঁচা লোক নন, তিনি দ্রৌপদীকে সম্বোধন করে বললেন—"যদি ভীম, অর্জুন, নকুল, এবং সহদেব যুধিষ্ঠিরকে নিস্ব অর্থাৎ অনীশ্বর বলে স্বীকার করেন তাহলে তোমার দাসীত্ব মোচন হবে।" এর উত্তরে অর্জুন বললেন—"মহারাজ যুধিষ্ঠির আগে আমাদের সকলের ঈশ্বর ছিলেন, এখন তিনি আমাদের প্রভু হয়েও কার কাছে পরাজিত হয়েছেন, তা কুরুগণের অবিদিত নেই।" এইরকম বাদানুবাদ যখন চলেছে তখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গান্ধারীর পক্ষ থেকে একটা কড়া নির্দেশ এল। তিনি খুবই ভয় পেয়ে গেলেন এবং পরিশেষে তাঁর আজ্ঞাতেই দ্রৌপদী দাসীত্ব থেকে মুক্ত হলেন এবং পাণ্ডবেরাও আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পেলেন। তাঁরা আবার খাণ্ডবপ্রস্থের শাসক হিসাবে ফিরে এলেন। এর মধ্যে ভীমের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় মহাভারত পাঠকেরা জানেন, সেগুলির উল্লেখ না করে কেবল মূল বিষয়টি দেওয়া হল।

এই যে ঘটনাগুলি ঘটেছে এর সবটাই কি সম্ভব? যুধিষ্ঠির অন্য যেকোন পণ রেখেই খেলতে পারতেন, কিন্তু ভাইদের এবং নিজের স্ত্রীকে পণ রাখাটা যে ব্যভিচার তা কি তিনি জানতেন না? সেটা কি তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল? যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এরকম অন্যায় এবং অসংগত কাজ কোনক্রমেই আচরণীয় বলে মনে হয় না। সভার কর্তা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র অথচ দেখা যাচ্ছে, কর্ণ, দুর্যোধন সকলেই ঢালাও রাজোচিত আদেশ দিচ্ছেন। যে দুর্যোধন পদে পদে পিতার অনুমতি নিয়ে কাজ করছেন, তিনি এইভাবে একটার পর একটা গর্হিত আদেশ দিতে পারতেন

কি ? কর্ণের পক্ষেও ধৃতরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করা সাধ্যায়ত্ত ছিলনা। যে কর্ণ স্বয়ম্বরসভায় দ্রৌপদীর অস্বীকৃতি শোনবামাত্র শরাসন রেখে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে প্রকাশ্য সভাস্থলে দ্রৌপদীর প্রতি কোনও কটূক্তি প্রয়োগ একান্ত অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। দুঃশাসন রাজার ছেলে ; ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা তিনি অর্জন করেছিলেন ; কোনও নারীকে সভাস্থলে কেশ আকর্ষণ করে টেনে আনবার মত গর্হিত কাজ কি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল এবং দুর্যোধন নিজে রাজা হয়ে কি এমন অন্যায় আদেশ দিতে পারতেন ? তা ছাড়া রাজমাতা গান্ধারীর বিনা অনুমতিতে অন্তঃপুর থেকে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসা কি কোনও কৌরবপুরুষের পক্ষে সম্ভব ছিল ? দুর্যোধন নীচমনা কি অসৎ হতে পারতেন ; কিন্তু কোনও নারীকে সভায় এনে অপমানিত করবার মত বর্বরোচিত প্রবৃত্তি তাঁর ছিল এমন বিশ্বাস করতে পাঠকদের প্রবৃত্তি হয় না। সমগ্র মহাভারতে দুর্যোধনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর এবম্বিধ প্রবৃত্তি হতে পারে সেটা কদাচ প্রমাণিত হয়না, অথবা অনুমান করবার অবকাশও ঘটতে পারে না। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন কৌরবকে অতি কলঙ্কিতে করে দেখাবার চেষ্টা এবং কৃষ্ণের অলৌকিক মহিমাকে অতিমাত্রায় উদ্ঘাটিত করবার প্রয়াস ;—তানইলে একটির পর একটা অকথ্য ব্যভিচার ঘটে চলেছে এবং কেউ একটা কথা বলছেননা, এটি কেমন করে হতে পারে।

আসলে এই দ্যূতক্রীড়া সুহৃদ্দ্যূতক্রীড়াতেই পর্যবসিত হয়েছিল বলে বিচারশীল পাঠকের মনে হয়। এই পাশাতে শকুনি যুধিষ্ঠিরের ক্ষমতা ও দুর্বলতা গুলি জেনে নেন, যাতে পুনরায় খেলায় তাঁকে হারাতে কষ্ট পেতে না হয়। এই সভাতে অনেকবার খেলা হয়েছিল;—শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ এমন কোনও শর্ত আরোপ করে খেলার পরিকল্পনা হয়, যা একান্ত নিন্দনীয় বোধ হওয়াতেই গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে এই ক্রীড়ার পরিচালনা থেকে নিবৃত্ত হতে বলেন। গান্ধারীর পক্ষে দূত পাঠাবার কারণ এই যে, কুরুবৃদ্ধেরা কেহই এই পাশার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ জানাননি। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মহিষীকে উপেক্ষা করতে পারেননি, কিন্তু

শীঘ্রই আটঘাট বেঁধে আর একবার দ্যূতক্রীড়ার যখন আয়োজন করা হল তখন তিনি আর গান্ধারীর উপদেশ কর্ণপাত করলেননা ;—পুত্রস্নেহই তখন প্রবলতরভাবে তাঁর হৃদয়কে অধিকার করেছিল।

প্রথম খেলার শূন্য পরিণামে আদৌ সন্তুষ্ট হতে না পেরে শকুনির পরিচালিত কৌরবসভা আবার একদফা পাশা খেলার আয়োজন করলেন। শকুনি এবারে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দুর্বলতা জেনে গিয়েছিলেন এবং স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে এবারে তাঁকে অনায়াসেই পরাজিত করতে পারবেন। সমস্ত পরিকল্পনা পাকা করে তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চাইলেন যে পাণ্ডবেরা আবার রণসাজে সজ্জিত হচ্ছেন ; তাঁদের দখল করতে না পারলে তাঁরা কৌরবদের সমূলে উচ্ছেদ করে ফেলবেন। কিন্তু পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের অযোগ্যতা যখন বোঝা গেছে তখন যুদ্ধের মধ্যে না গিয়ে আর একবার তাঁকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করা হোক ;—এবারেও যে তিনি পরাজিত হবেন সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এবারের পণ হবে বনবাস। খেলায় হেরে গেলে পাণ্ডবেরা বা কৌরবেরা, যাঁরাই হোন, দ্বাদশ বৎসর বল্কলাজিন পরিধান করে বনবাসে যাবেন। এক বৎসর অজ্ঞাত, এবং দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত, এই ত্রয়োদশ বর্ষ তাঁদের অতিক্রম করতেই হবে। ধৃতরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে আবার রাজি হয়ে গেলেন ; আবার দূত পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হল। একথা কুরুবৃদ্ধদের সকলের সামনেই হয়েছিল। তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে পাশাখেলায় পাণ্ডবদের নিয়ে আসবার কথা শোনবামাত্র বাধা দিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এঁদের কথা রাখলেননা, পাণ্ডবদের ডেকে পাঠালেন। এইবার রাজমাতা গান্ধারী আবার এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন—"মহারাজ, দুর্যোধন আমাদের কালান্তক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই দুর্বিনীত পুত্রের কথায় কখনো অনুমোদন করবেন না, কেন আপনি এই ঘোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে হস্তার্পণ করছেন ? আপনি পুত্রবৎসলতা হেতু বিজ্ঞদের পরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন করে আসছেন, তার সাংঘাতিক ফল প্রায় উপস্থিত হয়েছে। শান্তি, ধর্ম, ও মন্ত্রিবর্গের উপদেশ অনুযায়ী আপনার বুদ্ধিকে

পরিচালিত করুন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ না করাটা অত্যন্ত দোষাবহ। আপনি সাবধানতা অবলম্বন করুন।" কিন্তু, এবারে আর গান্ধারী তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেননা, তিনি সহধর্মিনীকে বললেন —"বংশনাশ যদি হয়, তাকে নিবারণ করা আমার অসাধ্য ; কিন্তু পুত্রেরা যেরকম ইচ্ছা প্রকাশ করছে তার অন্যথা হোক,—এ আমি চাইনা।" গান্ধারী আর কিছু বললেন না। একটা ব্যাপার কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের চোখ এড়ায়না, সেটি হচ্ছে এই যে গান্ধারী কোনও ক্ষেত্রেই তাঁর ভ্রাতা শকুনিকে ডেকে এসব পরিকল্পনা থেকে নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করেননি। তিনি একমাত্র তাঁর স্বামী ভিন্ন আর কারোর কাছে কোনও অনুরোধ জানাতেন না।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানকে এবারেও উপেক্ষা করতে পারলেন না ; তিনি আবার হস্তিনায় এসে পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে সতুপদেশ দেবার যেমন কিছু কিছু লোক ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তেমন কেউ ছিলেন না। তুজ্ঞের্য় কারণে বিতুর এই পাশাখেলার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুধিষ্ঠিরকে কোনও উপদেশই দেননি। তাঁর অপরাপর ভ্রাতারা কাঠের পুতুলের মত তাঁর অনুবর্তী ছিলেন এবং দ্রৌপদী এত অপমানের পরেও আবার পাশাখেলার ব্যাপারে একটা কথাও বললেননা। সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের কাছে হেঁয়ালি ঠেকে। তবে কি পাশাখেলা একবারই হয়েছিল এবং পূর্বের ঘটনাপূর্ণ অধ্যায়টিকে প্রক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া সমীচীন হবে? গতবারের লাঞ্ছনায় দ্রৌপদীর প্রবল বাধা দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁর দিকে থেকে কোনো প্রতিবাদ না আসায় এই ধারণাও পাঠকদের হতে পারে যে দ্যূতক্রীড়া একবারই হয়েছিল এবং সেটীতে রাজ্যটুকুই পণ ছিল। পরপর তুবার পাশাখেলার ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে : কেননা প্রথমবারের খেলায় যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দ্বিতীয় খেলার আমন্ত্রণ খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়। যাই হোক, পুরাণে যা বলা হয়েছে তাকেও একেবারে অগ্রাহ্যে করা যায়না, তবে গুরুতরভাবে সন্দেহ থেকে যায় এটা ঠিক।

খেলতে বসে শকুনি দ্যূতের পণ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে বললেন—"মহারাজ আমরা আপনাদের কাছে দ্যূতে পরাজিত হলে কৃষ্ণসারমৃগের চর্ম পরিধান করে মহারণ্যে প্রবেশ করে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে থাকব। আর আমরা জয়ী হলে আপনাদেরও অজিন পরিধান করে কৃষ্ণার সঙ্গে এইভাবে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস যাপন করতে হবে। এই ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলে উভয় পক্ষের এক পক্ষ আবার নিজের রাজ্য ফিরে পেতে পারবেন। অতএব আসুন—এইরকম পণ রেখে আমরা আবার খেলা আরম্ভ করি।" যুধিষ্ঠির, সভায় বহু ব্যক্তির প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত হলেন। শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করবামাত্র তাঁর জয়লাভ হল ;—যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে দাঁড়াতেই পারলেন না।

দ্যূতে হেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা অঙ্গীকার পালনে তৎপর হলেন। তাঁরা সকলেই অজিন ও উত্তরীয় গ্রহণ করলেন। বোধ করি সভাতেই চর্মবাস প্রস্তুত ছিল। পাণ্ডবগণ যখন সভা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন পিছন থেকে দুর্যোধন নাকি ভঙ্গী করে তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন। সভাস্থ সব রাজন্যবর্গের সামনে মহারাজ দুর্যোধন এইরকম বাচলতা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ এইটুকু সাধারণ জ্ঞান তাঁর থাকবার কথা বলেই পাঠকদের মনে হবে।

এইখানে আর একবার কপট পাশার কথা উত্থাপন করি। যুধিষ্ঠির নিজের ইচ্ছাতেই দ্যূতক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, কেননা পারদর্শিতা না থাকলেও খেলবার দিকে তাঁর দুর্বার আসক্তি ছিল। অতএব, এই খেলাটিকে "কপটদ্যূত" বলা যাবে কিনা সন্দেহ, বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে কৌশলী শকুনি নিজের পারদর্শিতাতেই জয়লাভ করেছিলেন। সভার এতগুলি লোক খেলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; কাপট্য কিছু ঘটে থাকলে, নিশ্চয়ই একটা প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠত। কিন্তু, সেটা আদৌ হতে দেখা যায়নি।

যথারীতি, যুধিষ্ঠির বনগমনের পূর্বে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করলেন। কুন্তী বিদুরের গৃহে রয়ে গেলেন। তিনি পুত্রদের ও পুত্র-বধূকে গৃহ থেকে বল্কলবাস পরে বেরিয়ে যেতে দেখে বহুবিধ বিলাপ করতে লাগলেন; কিন্তু যদি পূর্বাহ্নে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ গ্রহণে পুত্রদের অসম্মত হতে নির্দেশ দিতেন, তাহলে এসব কিছুই হতোনা। দুর্বল মাতার এই বিলাপ বিচারপ্রবণ পাঠকের মনে কোনও সমবেদনার সঞ্চার করেনা। বিদুরের উক্তি সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। তিনিও পাণ্ডবদের কোনও সদুপদেশই প্রদান করেননি এবং এই প্রচেষ্টা থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টাও করেননি;—যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন যে দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির চেয়ে বহুল পরিমাণে অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

অন্ধরাজ পাণ্ডবদের এই নিষ্ক্রমণ ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল সে সম্বন্ধে বিশেষ কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিদুরকে ডেকে কৃষ্ণা এবং পুরোহিত ধৌম্য সহ যুধিষ্ঠিরেরা কিভাবে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, সে সম্বন্ধে সব বর্ণনা করতে বললেন; বিদুর পাণ্ডবদের ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে গমন এবং প্রজাদের ক্ষোভের প্রকাশ সম্বন্ধে সব কথাই অন্ধরাজের গোচর করলেন।

পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে খাণ্ডবপ্রস্থ রাজ্যকে দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনির পরামর্শ অনুযায়ী দ্রোণাচার্যকে দেওয়া হল। পাণ্ডবদের তথাকথিত মহা হিতৈষী গুরু এই রাজ্যভার গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না, কারণ তাঁর মতে দৈবই মূলাধার এবং পাণ্ডবগণ ধর্মতঃ পরাজিত হয়েই ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য প্রস্থান করেছেন:—একথাও তিনি সবাইকে বললেন। এইভাবে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে ঐশ্বর্য প্রদানে বশীভূত করে নিজের আয়ত্তে রেখে দিলেন। ওদিকে বিদুরের বর্ণনা শুনে দুর্বলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র আবার ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি বিদুরকে বললেন—"তুমি যাও, পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনো; আর যদি তারা ফিরে না আসে, তাহলে শস্ত্র, রথ, পদাতিক ও ভোগদ্রব্যাদি দিয়ে সৎকৃত করে বিদায় প্রদান কর" কিন্তু পাণ্ডবেরা বোধ করি তখন হস্তিনানগরের সীমা অতিক্রম করে গেছেন। বিদুর এই কথায় আর কোনও গুরুত্ব প্রদান

করলেন না। এর মধ্যে সঞ্জয় এসে কথা প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে বেশ খানিকটা তিরস্কার করে গেলেন। ধৃররাষ্ট্র অনুশোচনায় অভিভূত হয়ে রইলেন; কিন্তু তখন আর তাঁর্ করবার কিছু ছিলনা।

তিন

হস্তিনানগরের বর্ধমান নামক পুরদ্বার দিয়ে পাণ্ডবেরা বেরিয়ে উত্তরাভিমুখে চলতে লাগলেন। প্রজারা তাঁদের অনেকটা এগিয়ে দিয়ে গেলেন, তথাপি সঙ্গে রয়ে গেলেন বেশ কিছু ব্রাহ্মণ। এঁরা স্বয়ং অন্ন আহরণ করে জীবনধারণ করতেন; অতএব যুধিষ্ঠিরকে এঁদের জন্য চিন্তা করতে হতনা। কিছুদিন পরে তাঁরা কাম্যক বনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা যখন এইখানে রয়েছেন তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিদুরের একটা মনোমালিন্য ঘটল। পাণ্ডবদের বনবাসের পর থেকেই ধৃতরাষ্ট্র আদৌ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন না। তিনি প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর ছেলেরা তাঁর সঙ্গে কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া দেখা করতেননা; গান্ধারীও যে তাঁকে খুব অধিককাল সঙ্গ দিতেন, এমন নয়। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রভৃতি সকলেই নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকতেন। অতএব, এই নিঃসঙ্গ লোকটি মাঝে মাঝে কথা বলবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠতেন। তাঁর কথা বলবার লোক ছিলেন মাত্র দুজন;—বিদুর এবং সঞ্জয়। এই দুজনের কেউই তাঁকে সুনজরে দেখতেন না। বিদুর তবু একটু বিনয় সম্ভাষণ করে কথাবার্তা বলতেন, কিন্তু সঞ্জয় কেবলমাত্র কাজের আলাপ ছাড়া আর কিছুই করতেন না;—তাও প্রায়ই রুক্ষ হয়ে দাঁড়াতো।

অসহায় ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—"দেখো যা হবার তা তো হয়ে গেছে; তুমি সমগ্র কুরুকুলের হিতাকাঙ্খী;— যাতে কুরু-পাণ্ডব উভয়কুলের হিত হতে পারে, সেইরকম পরামর্শ আমি তোমার

কাছ থেকে চাই। এখন আমাদের কি করা কর্তব্য, সে সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দাও, বিশেষ করে প্রজাগণ যখন বেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের দিক থেকেও আমি যে বিপদের আশঙ্কা করছিনা, এমন নয়।" বিদুর বললেন—"মহারাজ আমি যে উপায় স্থির করেছি, তা অবলম্বন করলে আপনারা আবার জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হতে পারবেন। আপনি পাণ্ডবদের যা প্রদান করেছিলেন তা আবার তাদের ফিরিয়ে দিন। পাণ্ডবদের তুষ্ট করা এবং শকুনিকে দমন করাই এখন আপনার প্রধান কর্তব্য। আমি দুর্যোধন জন্মবামাত্র আপনার হিতসাধনের জন্য বলেছিলুম,—একে পরিত্যাগ করুন, কিন্তু আপনি তখন আমার হিতকর বাক্য উপেক্ষা করেছিলেন। এখন আবার আপানাকে উপদেশ দিচ্ছি। যদি আমার কথা অনুসারে কাজ না করেন, তাহলে পরে পরিতাপ করতে হবে।"

ধৃতরাষ্ট্র এমনিতেই মর্মাহত ছিলেন, এখন বিদুরের মুখে পুত্রবিসর্জনের উল্লেখ শুনেই ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি চেয়েছিলেন পাণ্ডবদের প্রস্থানের পর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কার্যকর অলোচনা হোক ; কিন্তু বিদুর যা বললেন তা আগেই হতে পারত ; কিন্তু হবার নয় বলেই এতগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। পিতার কাছে পুত্রত্যাগের মত মর্মবিদারক প্রস্তাব এমনিতেই অসহ্য ;—অথচ বিদুর বার বার সেই আঘাতই করতেন এই হতভাগ্য অন্ধ দোলাচলচিত্ত ব্যক্তিটিকে। ধৃতরাষ্ট্র নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেননা ; উত্তেজিতভাবে বললেন— "বিদুর তুমি যা কিছু বল তা কেবল পাণ্ডবদের ভালোর জন্য— আমাদের ভালোর দিকে তোমার একটুও আগ্রহ দেখা যায় না। পাণ্ডবদের জন্য আমার পুত্রকে পরিত্যাগ করব,—এটা কি একটা যুক্তি হল ? পাণ্ডবেরা আমার সন্তানতুল্য,— এটা ঠিকই, কিন্তু দুর্যোধন আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে,—একথা ভুলে যাচ্ছ কেন ? কোনও সমদর্শী ব্যক্তি যে এমন উপদেশ দিতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারিনা। স্পষ্টই বোধ হচ্ছে তুমি আমাকে অহিতকর কপট উপদেশ দিচ্ছ। আর তোমার উপদেশের দরকার নেই এবং আমার কাছে তোমার উপস্থিতিরও

কোনও মূল্যই আমি প্রদান করছিনা। তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পার।" বিদুর অভিমানে হস্তিনা পরিত্যাগ করে কাম্যকবনে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকবার জন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু কুন্তীর সঙ্গে তাঁর যাবার আগে কোনও আলোচনা হয়েছিল কিনা জানা যায়না। তিনি পাণ্ডবদের কাছে এসে সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—"তুমি আপততঃ বনবাসের ক্লেশ সহ্য করে এই ভাবেই থাকো। তোমাকে বর্তমানে ক্ষমা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু কালপ্রতীক্ষা করে থাকলে তোমার সেই দুর্লভ সুযোগ আসবে, যখন তুমি একলা এই পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারবে। যুধিষ্ঠির উপযুক্ত পরামর্শদাতারূপে বিদুরকে তাঁর কাছে রেখে দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র যে মুহূর্তে শুনলেন যে বিদুর পাণ্ডবদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর দিকে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন। সান্ধিবিগ্রহবিষয়ে বিদুরের মত কূটনীতিজ্ঞ সেই সময় অপর কোনও রাজসভায় আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। এর মধ্যে শকুনি তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন সত্য, কিন্তু বিদুরের মত অভিজ্ঞ কূট-নীতিবিদ তিনি ছিলেননা। তিনি কতকগুলি চতুর কৌশলে শত্রুপক্ষকে বিপন্ন করতে পারতেন; কিন্তু বৃহত্তর রাজনীতিতে তাঁর দক্ষতা ছিল না;—সেই কারণে বিদুরকে হাতে রাখা খুবই প্রয়োজন ছিল। ওদিকে বিদুরও শকুনির অভ্যুত্থানে সন্তুষ্ট ছিলেননা, কারণ তাঁর চক্রান্ত ছিল স্থুল, যাতে চক্রান্তকারাকে সহজেই লোকে চিনে নিতে পারত। তাই ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি শকুনির কাছ থেকে বিযুক্ত করবার চেষ্টা করতেন। বিষয়টা সম্যগ্‌ভাবে চিন্তা করে ধতরাষ্ট্র বিদুরকে পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে সঞ্জয়কে ডেকে পাঠালেন। সঞ্জয় এলে তাঁর কাছে তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন বিদুরকে তিরস্কার করে তাঁর অন্তঃকরণ অনুতাপে বিদীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন,—"তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখো, আমার ভাই বিদুর আমার কঠোর তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন কিনা; আমি এতবড় পাপাত্মা যে রাগের মাথায় আমার প্রিয়তম ভাইকে অপসারিত করেছি; তাঁকে

অপমান করবার জন্য আমি যারপরনাই অনুতপ্ত। তুমি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, নইলে আমি এ প্রাণ আর রাখবনা।" সঞ্জয় বিনাবাক্যে কাম্যক বনে বিদুরের কাছে এসে ধৃতরাষ্ট্রের সেই হৃদয়-বিদারক, উক্তি জ্ঞাপন করলেন। বিদুর অবশ্য এ সুযোগে পাণ্ডবদের যা পরামর্শ দেবার দিয়েছিলেন এবং বনবাসও তাঁর কাম্য ছিলনা। অতএব, তিনি বিনা প্রতিবাদে আবার হস্তিনায় ফিরে এলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আবার তাঁর মিলন হল। দুজনেই দুজনকে চিনতেন এবং প্রয়োজনে "ডিপ্লোমেটিক রিলেশন" স্থাপন করতে দ্বিধা করতেননা।

দুর্যোধন যখন শুনলেন যে বিদুর কাম্যকবন থেকে তাঁর পিতার কাছে ফিরে এসেছেন তখন তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি জানতেন তাঁর পিতার চিত্ত স্থির নয়; কিন্তু বিদুরকে দিয়ে তিনি গোপনে পাণ্ডবদের ফিরে আসবার উপদেশ দিয়েছেন কিনা সেটা ঠিক বুঝতে পারলেননা। শকুনি কর্ণ এবং দুঃশাসনের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসলেন। পিতা যেরকম বিদুরের মন্ত্রণা কামনা করতেন, পুত্র তদানুরূপ মাতুলের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি আস্থাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর ধারনা ছিল, প্রত্যক্ষ বিষয়ে শকুনির মত পরামর্শদাতা কৌরবকুলে আর কেউ ছিলেননা। পিতাপুত্র কুটনীতির দিক থেকে দুজন মন্ত্রণাদাতাকে বেছে নিয়েছিলেন। শকুনির মনুষ্যচরিত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। যুধিষ্ঠিরকে তিনি চিনতেন। তিনি দুর্যোধনকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে পাণ্ডবেরা আর যাই করুন সত্যভঙ্গ করবেননা; অতএব সেদিক থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে যদি তাঁরা সত্যভঙ্গ করে হস্তিনায় ফিরে আসেন, তাহলে তখন একটা উপায় খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না। কর্ণও তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন যে পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার আগে ফিরে আসবেননা। যদি শেষ পর্যন্ত ফিরেই আসেন তখন আবার একটা খেলার আয়োজন করা যেতে পারে। দুর্যোধন কিন্তু এবারে কর্ণের পরামর্শে খুশী হতে পারলেননা, আকারে প্রকারে তাঁর অসন্তোষ চাপা রইলনা। তখন কর্ণ রীতিমত অভিমানভরে বললেন— "মহারাজ, আপনি আমাদের পরামর্শে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন

কিন্তু আমি কি এর আগে বলিনি যে সোজাসুজি সম্মুখযুদ্ধ করে শত্রুদের ধ্বংসসাধন করুন। তখন আপনি আমার যুক্তিগ্রহণ করেননি। আজ, আমি যখন আপনাকে অপেক্ষা করে দেখতে বলছি তখন আপনি মনে করছেন, আমি আপনাকে যোগ্য উপদেশ দিচ্ছি না। বেশ, তাহলে চলুন, সবাই একসঙ্গে বর্মধারণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাণ্ডবদের নিধন সাধন করে আসি।" এইবার দুর্যোধন কর্ণের কথায় খুশী হলেন। তাঁরা পৃথক পৃথক রথে আরোহণ করে পাণ্ডবদের বিনাশ করবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় কতকগুলি বাধা উপস্থিত হল। ধৃতরাষ্ট্রের হিতৈষীরা তাঁদের নিবৃত্ত করবার উপদেশ দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হল।

এদিকে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কৃষ্ণ এবং তাঁর অপরাপর সহচরগণ কাম্যকবনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে পাঞ্চালের জ্ঞাতিবর্গও এসেছিলেন। পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে যখন এত সব ঘটনা ঘটে চলেছিল তখন কৃষ্ণ একটি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি এসব খবর রাখতে পারেননি। এখানে এসে তিনি ক্ষুব্ধ পাণ্ডবদের কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। কিন্তু, তিনি আপাততঃ বনবাস ভিন্ন আর কোনও পরামর্শ পাণ্ডবদের দিতে পারলেননা। সাক্ষাৎ শেষ হলেই তাঁরা আবার নিজেদের স্থানে ফিরে গেলেন। অতঃপর পাণ্ডবেরা কাম্যকবন ছেড়ে দ্বৈতবনে বাস করতে লাগলেন। এক অরণ্যস্থলে দীর্ঘকাল বাস করা সমীচীন হত না, কারণ এতে কিছুকালের মধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাঁর দ্বৈতবনে সরস্বতী নদীর তীরে এক শালবনে আশ্রয় স্থাপন করলেন।

কিছুকাল পূর্বে কৃষ্ণসহ অপরাপর রাজন্যবর্গের সাক্ষাৎকারটি বেশ ফলপ্রসূ হয়েছিল। পাণ্ডবেরা বুঝতে পারলেন যে তাঁরা নিঃসহায় নন, দ্বারস্থ হলে বহু প্রভাবশালী এবং বলসম্পন্ন রাজন্যবর্গের প্রত্যক্ষ সহায়তা তাঁরা পাবেন। দ্রৌপদী মনে করলেন, বনবাসে কাল না কাটিয়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বহুভাবে

উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে বললেন,—"মহারাজ, এখন তেজের সময় উপস্থিত এবং তেজ প্রকাশ করাই কর্তব্য। আপনি যতই মৃদু হবেন, ততই অবজ্ঞার পাত্র হবেন কিন্তু উগ্রতা অবলম্বন করলে লোকে আপনাকে দেখে শঙ্কিত হবে। এখন আমাদের যে ভয়ঙ্কর অনর্থ উপস্থিত হয়েছে, যদি আপনি পুরুষকার অবলম্বন করেন, তাহলে নিঃসন্দেহেই সেই অনর্থ ঘুচে যাবে। যদি কর্ম সফল না হয় ভেবে আপনারা পাঁচ ভাই নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহলে রাজ্যপ্রাপ্তির আশা একেবারেই দূর হয়ে যায়। অতএব, আপনাদের সচেষ্ট হতেই হবে। ভীমও দ্রৌপদীকে সমর্থন করে অনেক কথা বললেন। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য ধরে এঁদের সব উপদেশ শুনলেন ; কিন্তু তিনি ঠিক সেইসময়টা যুদ্ধের উপযুক্ত বলে মনে করলেননা ; বরঞ্চ ক্ষমা অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ নীতি বলে সিদ্ধান্ত করলেন। দ্রৌপদীকে তিনি বললেন—"আমি দেখতে পাচ্ছি এমন একটা সময় এগিয়ে আসছে, যখন ভরতবংশীয়দের বিনাশ ঘটবে। এটা একেবারে অবধারিত। দুর্যোধন রাজকার্যে নিতান্ত অযোগ্য এবং সেই কারণেই সে ক্ষমা অবলম্বন করতে পারে না। কিন্তু আমার মধ্যে যোগ্যতা আছে বলেই আমি যথাকাল পর্যন্ত ক্ষমা অবলম্বন করতে পারি।" তিনি তাঁদের কাছে অকপটে স্বীকার করলেন যে তাঁর অন্যায় আচরণের জন্যই এই অনর্থ ঘটেছে। তিনি স্পষ্ট বললেন—"আমি দুর্যোধনের রাজ্য জিতে নেবার প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করেই অক্ষ গ্রহণ করেছিলাম। ধূর্ত শকুনির কাছে আমার এই মনোভাব অবিদিতি ছিলনা। তাই সে নিজেই দুর্যোধনের প্রতিনিধি হয়ে আমার সঙ্গে পাশা খেলতে বসল। আমি যখন তার চালে ঘুঁটির জোড় ভাঙ্গা আর জোড় মেলানো লক্ষ্য করলুম তখনই তার কুটিলতা বুঝতে পারলুম। সেই মুহূর্তেই আমার নিবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ক্রোধে আমার ধৈর্য বিলুপ্ত হয়েছিল ;—আমি নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারিনি। এইবার তিনি ভাইদের উদ্দেশ্য করে বললেন,—"দ্বিতীয়বার যখন বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের পণ রেখে খেলবার প্রস্তাব এল তখন তোমরাও তো একটা কথা বলনি। তোমাদের সম্মতি আছে মনে

করেই আমি পণে অনুমোদন করেছিলুম। তোমরা পাশাখেলার আগে বা পাশাখেলায় আমি যখন হেরে যাচ্ছিলুম। তখন ক্রোধ প্রকাশ করেছিলে বটে, কিন্তু জোর করে আমাকে নিবৃত্ত করনি। তা যদি করতে তাহলে খেলা আর এগোতে পারত না। এখন—এনিয়ে অনুযোগ, অভিযোগ করে আর কোনও ফল নেই, আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছি তা পালন করবই কারণ সেটাই আমার ধর্ম।" এই কথাবার্তা শুনলে মনে হয় পাশা খেলাটা হয়তো দুবারই হয়েছিল; তাই যদি হয়ে থাকে, তবে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ প্রভৃতি প্রথমবারের পাশাখেলায় আদৌ হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। যুধিষ্ঠির সবাইকে বুঝিয়ে বললেন যে যুদ্ধ করাটা যত সহজ ভাবা হচ্ছে তত সহজ হবেনা। তাঁরাও খাণ্ডবপ্রস্থে রাজা হয়ে রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্‌কালে বহু রাজাকে উৎপীড়ন করেছেন এখন তাঁরা দুর্যোধনের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত হবেন। দুর্যোধন আর যাই হোক, বীর-পুরুষদের যথেষ্ট মর্যাদা প্রদান করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপাচার্য রাজার আশ্রয়ে রয়েছেন. সুতরাং তাঁরা সকলেই দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করবেন। কর্ণের সহায়রাও বড় কম কথা নয়। অতএব যুদ্ধ এখন অতিশয় দুরূহ ব্যাপার এবং তাতে কৃতকার্য হওয়া প্রায় অসম্ভব।

যুদ্ধের আলোচনা এর পরে আর অগ্রসর হলনা। কিছুকাল দ্বৈত-বনে থেকে যুধিষ্ঠির সবাইকে নিয়ে আবার কাম্যক বনে ফিরে এলেন এবং সেখানেও সরস্বতী নদীর তীরে বাস করতে লাগলেন। এইখান থেকে পুরাণকার অর্জুনকে নিয়ে নানা দৈবী কাহিনীর অবতারণা করে গেছেন, কারণ নানা অলৌকিক উপায়ে তাঁকে দিয়ে নানারকম ভয়াবহ অস্ত্র সংগ্রহ করানোর আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু, আসল ব্যাপারটা বোধ হয় এই যে অর্জুন দীর্ঘ বনবাসে একসঙ্গে থাকতে ভালবাসতেন না। যে অবস্থায় তাঁরা বাস করছিলেন তাতে দ্রৌপদীর সঙ্গলাভেও তাঁদের বাধা ঘটছিল। অতএব, তিনি পূর্বের মত আর একবার একাই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন একেবারে পাঁচ বছরের মত।

ভাইদের এবং দ্রৌপদীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন হিমাচল-

পর্বতমালায় এসে উপস্থিত হলেন। এই সব পর্বতের মধ্যে গন্ধমাদন ঘুরে তিনি এলেন ইন্দ্রকীল নামক পর্বতে। এখানে তিনি একজাতীয় কিরাতের মধ্যে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন বলে মনে হয় কিন্তু শিকার নিয়ে গোলমাল হওয়াতে এ অঞ্চল বোধ করি তিনি ছাড়তে বাধ্য হন। এখান থেকে তিনি সম্ভবতঃ যক্ষদের বাসভূমি কৈলাস-পর্বতে এসেছিলেন। এই ভ্রমণপর্যায়ে গন্ধমাদন পর্বতে তাঁর লোমশ নামক একজন তপস্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অর্জুন তাঁকে তাঁর কুশলসংবাদ যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ জানান লোমশ তাঁর অনুরোধে স্বীকৃত হয়ে কাম্যকবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ওদিকে দুর্যোধনের চরেরা পাণ্ডবদের সব খবর রেখে চলেছিলেন, এমন কি অর্জুনের গতিবিধির খবরও তাঁরা জানতেন। যথাসময়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কাম্যকবনে রাজন্যবর্গের সঙ্গে পাণ্ডবদের কি আলোচনা হয়েছিল সেসব সংবাদ বর্ণনা করলেন। তাঁর উক্তিতে বোঝা গেল এই দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর পাণ্ডবগণ নীতিগতভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন যাদব, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি প্রভৃতি কৃষ্ণের গোষ্ঠীবৃন্দ, এতদ্ব্যতীত পাঞ্চাল, কেকয় এবং মৎস্যদেশ প্রভৃতি পাণ্ডবদের অনুগত বান্ধবগোষ্ঠী।

ভীম কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলতে পারছিলেন না। অর্জুন চলে যাবার পর তিনি সমস্ত দিকটার পর্যালোচনা করে আবার যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে, অর্জুনকে ভ্রমণের আদেশ দেওয়া তাঁর উচিত হয়নি কেননা দুর্যোধনকে এখনই আঘাত করা যেতে পারত এবং বর্তমানে কৃষ্ণকে ডেকে এনে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করার আগেই কৌরবদের নিহত করা কর্তব্য। ভীমের যথেষ্ট ভয় ছিল যে অজ্ঞাত-বাসের সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন হবে। ধরা পড়ে গেলে আবার কোনও সর্ত তাঁদের ওপর আরোপ করা হতে পারে। এছাড়া তেরোবৎসর পরেও আবার যে যুধিষ্ঠির পাশা-খেলার আমন্ত্রণ গ্রহন করে সর্বনাশ ডেকে আনবেননা, তারও কোনও

নিশ্চয়তা নেই। যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়ে গিয়েছিল। যুধিষ্ঠির কিন্তু উত্তেজিত হলেননা। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ভীমকে জানালেন যে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলে তাঁরা নিশ্চয়ই কৌরবদের বিনাশ করতে সক্ষম হবেন। ভীম যে বলছেন এখনই যুদ্ধকাল আগত হয়েছে যুধিষ্ঠির সেটা মেনে নিতে পারলেননা। তাঁর মতে প্রতিজ্ঞা পালন করে যাওয়াই ধর্মবুদ্ধির পরিচায়ক। যখন তাঁদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা চলেছে তখন বৃহদশ্ব নামক একজন ঋষি তাঁদের কাছে উপস্থিত হলেন। কথাপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির তাঁকেও জানালেন যে অক্ষবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতার অভাবই সব অনর্থের মূল। এর জন্যই তাঁদের বনবাসে আসতে হয়েছে এবং ভ্রাতা ও স্ত্রীর নির্মম তিরস্কার তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে। ঋষি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং পুণ্যশ্লোক নলরাজ যে তাঁর চেয়েও কষ্ট সহ্য করেছিলেন সেই কাহিনী সবিস্তারে শোনালেন। বৃহদশ্ব অক্ষবিৎ ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে তিনি তাঁকে অক্ষবিদ্যা শিক্ষা দিলেন এবং সেই সঙ্গে অক্ষবিদ্যা সম্বন্ধেও উপদেশ দিলেন। অক্ষক্রীড়ায় আসক্তি ঋষিদের নীতিতে অনুমোদিত ছিলনা বলেই আমরা জানি, তথাপি অনেক ঋষিই অনেককিছু জানতেন, কেননা অতীত জীবনে তাঁদের বহু অভিজ্ঞতাই অর্জিত হয়ে থাকত। এটাও এই প্রসঙ্গে চিত্তাকর্ষক যে এত ব্যাপারের পরেও যুধিষ্ঠির সময় কাটাবার জন্য খেলার সরঞ্জম আনতে ভোলেননি, নইলে অক্ষবিদ্যা শেখানো হল কি উপায়ে?

অর্জুন চলে যাবার পর সর্বাপেক্ষা কাতর হয়েছিলেন দ্রৌপদী; কেননা আসলে অর্জুন ভিন্ন অপর চার স্বামী তাঁর কাছে প্রতীক ছিলেন মাত্র। তাঁর ব্যাকুলতা অনুভব করে যুধিষ্ঠির একটি বিরাট তীর্থযাত্রার পরিকল্পনা করলেন, যাতে অর্জুনবিরহের শোক নিত্য-নূতন ভ্রমণের আনন্দে কিছুটা ভুলে থাকতে পারা যায়। এইসময় লোমশ মুনি অর্জুনের সংবাদ নিয়ে তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে অর্জুনের একান্ত ইচ্ছা পাণ্ডবেরা তীর্থ পর্যটনে উদ্যোগী হন এবং তার পর গন্ধমাদন পর্বতে

তাঁরা আবার মিলিত হতে পারেন। যদি তাঁরা স্বীকৃত হন তাহলে লোমশমুনি স্বয়ং তাঁদের রক্ষক হয়ে তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। এই তপস্বী আগে দুবার তীর্থাদি পরিভ্রমণ করেছিলেন; তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে তৃতীয়বার তীর্থদর্শনের বাসনা প্রকাশ করলেন। পাণ্ডবেরা আগেই এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; অতএব লোমশের প্রস্তাব তাঁরা সানন্দেই গ্রহণ করলেন। এরপর তাঁরা তাঁদের অনুচর বাহিনীর অধিকাংশ ব্রাহ্মণকেই বিদায় দিলেন। তাঁদের কেউ কেউ হস্তিনায় বা পাঞ্চালে গমন করে রাজ আতিথ্যে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। অনেকেই নিজ নিজ আবাসে ফিরে গেলেন। তথাপি স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ তীর্থ-যাত্রায় পাণ্ডবদের সঙ্গে থেকে গেলেন; তাঁদের সঙ্গে রইলেন ইন্দ্রসেন-প্রমুখ সারথিবর্গ, চোদ্দটি রথ, কয়েকজন সূপকার এবং আরও কিছু পরিচারক। রথের উল্লেখে বোঝা যায় পাণ্ডবেরা অরণ্যপ্রদেশের এমন অংশে থাকতেননা, যেখানে পথঘাট ছিলনা এবং এও জানা যায় যে তৎকালে অরণ্যভূমি অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত থাকত।

সব বন্দোবস্ত সম্পন্ন হলে তাঁরা কাম্যকবন পরিত্যাগ করে পূর্বদিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা প্রথমে এলেন নৈমিষারণ্যে। সেখানে গোমতী নদীতে স্নান করে কন্যাতীর্থ, গোতীর্থ, কালকোটি, বিষপ্রস্থ, বাহুদা তীর্থ প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেন। তারপরে তাঁরা এলেন মহানদীর তীরবর্তী মহীধর তীর্থে। সেখান থেকে দুর্জয় তীর্থে অগস্ত্যাশ্রমে তাঁরা কিছুদিন বাস করেছিলেন। এর পরে ভৃগুতীর্থে স্নানাদি সমা-পন করে তাঁরা যেখানে এলেন সেটি হেমকূট বা ঋষভকূট নামক পর্বতশ্রেণী। এইখানে নন্দা এবং অপরনন্দা নামক দুটি নদী তাঁদের অতিক্রম করতে হয়। কৌশিকী নদীতে স্নান করে তাঁরা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির পিতা বিভাণ্ডকের আশ্রম পরিদর্শন করলেন। তারপর তাঁরা এলেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে। এখানে অবগাহনের পরে তাঁরা সমুদ্রতীর ধরে কলিঙ্গ দেশে এসে পৌঁছোলেন। এই প্রদেশে তাঁরা রমণীয় বৈতরণী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন করলেন। এখান থেকে তাঁরা এলেন মহেন্দ্র পর্বতে। এই পার্বত্য দেশে কিছুকাল অতিবাহিত

করবার পর তাঁরা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। এই অঞ্চলেই ছিল অর্জুনমহিষী চিত্রাঙ্গদার দেশ। পাণ্ডবেরা কেন এই অঞ্চলকে এড়িয়ে গেলেন বোঝা গেল না। হয়তবা সেটী তীর্থের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা বলেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। অথবা দ্রৌপদীর সপত্নীর দেশ ভ্রমণ করে তাঁকে মনোকষ্ট না দেওয়াই ছিল পাণ্ডবদের উদ্দেশ্য।

দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ পর্যায়ে তাঁরা প্রশস্তা নদী অতিক্রম করে গোদবরী তীর্থে আসেন। ক্রমে সে অঞ্চল পেরিয়ে দ্রাবিড় দেশের সাগরাঞ্চলে এসে তাঁরা অগস্ত্যতীর্থ, নারীতীর্থ, শূর্পারকতীর্থ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তারপর তাঁরা এলেন একটি সুবিদিত অরণ্যাঞ্চলে, যেখানে বহু ব্যক্তি তপস্যা করেছিলেন এবং বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অরণ্যাঞ্চল পরিভ্রমণের পর তাঁরা আবার শূর্পারক-তীর্থে ফিরে এলেন। সেখান থেকে সাগরতীরবর্তী পথ অবলম্বন করে তাঁরা সুবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে এসে পৌঁছলেন। এইখানে কৃষ্ণসহ যদু-বংশীয়েরা এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা আর একবার যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। এমনকি সাত্যকি প্রস্তাব করলেন যে কেবলমাত্র যদুবংশীয় বীরেরাই কুরুদের সংহার করে পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ সিংহাসন নিষ্কণ্টক করুন এবং যতদিন না তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালিত হয় ততদিন অভিমন্যুকে প্রতিভূস্বরূপ স্থাপন করা হোক। কিন্তু কৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন যে যুধিষ্ঠির অন্যের জয়লব্ধ রাজ্য কখনই গ্রহণ করবেননা, তবে সবাই মিলিতভাবে যুদ্ধ করে রাজ্য জয়ে তিনি কোনও বাধা দেখতে পাননা। তথাপি যুধিষ্ঠির এই সব প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না; তিনি বললেন, এখনো যুদ্ধের সময় আসেনি যখন আসবে তখন তখন অবশ্যই সেই ব্যাপারে তাঁরা সকলেই উদ্যোগী হবেন।

যাদবগণ বিদায় গ্রহণ করলে পাণ্ডবেরা বিদর্ভ দেশে পয়োষ্ণী নদীর তীরে এসে পৌঁছোলেন। এখান থেকে বৈদূর্যপর্বত, নর্মদা, মহানদী অতিক্রম করে তাঁরা আর্চীক পর্বতে উপস্থিত হলেন; তারপর যমুনার তীরে সোমকতীর্থে ছয় রাত্রি যাপন করলেন। অতঃপর যুগন্ধর

দেশাদি ভ্রমণ করে তাঁরা কুরুক্ষেত্রের কাছে পৌঁছোলেন। সেখান থেকে সরস্বতী নদীর অনতিদূরে নিষাদরাজ্যের দ্বারদেশে বিনশন প্রদেশে নানা তীর্থ দর্শন করে তাঁরা কাশ্মীরমণ্ডলে সমাগত হলেন। তৎকালে কাশ্মীরমণ্ডল দিয়ে মানসসরোবরে যাতায়াত করা হত। এই দেশে কিছু তীর্থাদি দর্শনের পর তাঁরা কনখলে এসে উপস্থিত হলেন। সেইখান থেকে তাঁরা উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেতপর্বত ও কাল-শৈল অতিক্রম করে কৈলাসের কাছাকাছি চলে এলেন।

এইবারে তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে অভিযানের আয়োজন করলেন। এই পর্বতেই তাঁদের অর্জুনের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল। দুর্গম পর্বতের পথে অগ্রসর হতে হতে তাঁরা পুলিন্দাধিপতি সুবাহুর রাজ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে বহু কিরাতও বাস করত। একরাত্রি সুবাহুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে পরদিন তাঁরা আবার যাত্রা করলেন; কিন্তু এবার ইন্দ্রসেন প্রভৃতি যাবতীয় পরিচারক ও অপর অনুচরদের রাজা সুবাহুর কাছে সমর্পণ করে গেলেন। এইবার তাঁদের সহায় বলতে আর কেউ রইলেননা।

পাণ্ডবদের এই অভিযানটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক এবং একটি অতি প্রাচীন পর্বতাভিযানের চিত্র এই পুরাণের বর্ণনা থেকে পাওয়া সম্ভব। তাঁদের যাত্রাস্থলের প্রথম কেন্দ্র হচ্ছে বদরিকাশ্রম, যাকে মহাভারতের যুগেও বিশালবদরী বলা হত। এখান থেকে তাঁরা আসেন মন্দার পর্বতে। পুরাণে যেরকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় মন্দার পর্বত গন্ধমাদনের দ্বারদেশে অবস্থিত ছিল। এই পথে ভ্রমণ করবার সময় তাঁদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্রে তাঁরা সুসজ্জিত তো ছিলেনই, এছাড়া চর্মবাসে দেহ আবৃত করে-ছিলেন; হাত পরেছিলেন অঙ্গুলিত্র। ক্রমে ক্রমে তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করতে আরম্ভ করলেন। এইখানে তাঁরা একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হলেন। ধূলায় এবং অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তাঁরা এক সুদৃঢ় গাছের তলায় আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। ঝড় থামতেই আরম্ভ হল সাংঘাতিক শিলাবৃষ্টি এবং তাঁর

সঙ্গে চলল বিদ্যুৎবিস্ফোরণ ও মেঘগর্জন। তাঁরা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এদিকে পার্বত্য নদী ও ঝর্ণাগুলি স্ফীত হয়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতি শান্ত হল বটে কিন্তু তাঁদের দুর্গতির সীমা রইলনা। দ্রৌপদী এত কাতর হয়েছিলেন যে তাঁর আর চলবার মত ক্ষমতাও ছিলনা। এই অবস্থার তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করে তুললেও তাঁর শরীরে যথেষ্ট বলসঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য উপজাতীয়দের সহায়তা গ্রহণ করতে হল তাঁকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য। পুরাণে আছে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ পিতার স্মরণে আবির্ভূত হয়ে দ্রৌপদীকে বহন করেছিলেন এবং পাণ্ডবদের বহন করেছিলেন তাঁর অনুচর অপর রাক্ষসবৃন্দ। বলা বাহুল্য এটা নেহাৎই কাহিনী মাত্র। আসলে সেখানকার পার্বত্য অধিবাসীরাই এই বহনকর্মে নিযুক্ত হয়েছিল।

পাণ্ডবেরা আর ওপরে না উঠে তখনকার মত আবার বিশালা-বদরীতে ফিরে এলেন। এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করে তাঁরা উত্তরকুরু পর্যটন করতে বেরুলেন। এখান থেকেও তাঁরা কৈলাসের দৃশ্য উপভোগ করলেন। তারপর আবার তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন বদরিকাশ্রমে কিছুকাল বিশ্রামের জন্য। তাঁরা যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে মৈনাক পর্বতের দৃশ্য এবং পার্শ্ববর্তী বিন্দুসরোবরও দেখা যেত।

এই সময় দ্রৌপদী কোথা থেকে একটি সৌগন্ধিক পুষ্প সংগ্রহ করেছিলেন তিনি সেই পুষ্পের রমণীয়তায় এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ভীমসেনকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন এই জাতীয় পুষ্প খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। তাঁর ধারণা ছিল এই ফুল কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যায়; কিন্তু সেই ফুল খুব নিকটে পাওয়া যেতনা এবং সহজলভ্যও ছিলনা। বেচারি ভীমসেনকে এর জন্য বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি দ্রৌপদীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সেই ফুল সংগ্রহের জন্য যাত্রা করলেন। তাঁকে আবার গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করতে হল। এবার তিনি একা। অনুসন্ধান করতে করতে বেশ

খানিকটা উঁচুতে পর্বতের সানুদেশে একটি পার্বত্য নদীর জলে সেই ফুল প্রচুর পরিমাণে ফুটে রয়েছে দেখা গেল। এরই কাছে আর একটি সরোবর ছিল ; তাতেও প্রস্ফুটিত প্রচুর সৌগন্ধিক পুষ্প তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। এই সরোবর যক্ষ-জাতীয়দের অধিকারে ছিল। তাঁরা সহজে পুষ্প দিতে চাইলেননা এবং একটা বিরোধের উপক্রম হল। যাই হোক, তাঁদের অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত ভীমকে কিছু পুষ্প চয়ন করবার অনুমতি দিলেন।

এদিকে বদরিকাশ্রমে ভীমের জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির জানতেননা যে দ্রৌপদীর জন্য পুষ্প সংগ্রহ করতে ভীমসেন কাউকে না জানিয়ে একা বেরিয়ে পড়েছেন। তিনি যখন একথা শুনলেন তখন তাড়াতাড়ি সকলে মিলে ভীমের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। যে সব পার্বত্য অধিবাসীরা তাঁদের বহনের জন্য নিযুক্ত ছিল, তারা এই সুগন্ধী পুষ্প যেখানে ফুটত সেই জায়গার সন্ধান জানত। তারা যত তাড়াতড়ি সম্ভব, পাণ্ডবদের সেই যক্ষদের অধিকৃত সরোবরের কাছে নিয়ে এল। সেইখানে তাঁরা ভীমসেনকে দেখতে পেলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁর হঠকারিতার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন এবং যক্ষদের সখ্যতায় বশীভূত করে সেইখানে কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর আবার তাঁরা বদরিকাশ্রমে ফিরে এলেন। এই সময় তাঁদের সঙ্গে উক্ত পাবত্য সহচরদের মধ্যে একজন দুর্দ্ধর্ষ দস্যু আত্মগোপন করে অবস্থান করেছিল। একদিন ভীম যখন মৃগয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন তখন সেই ব্যক্তি দ্রৌপদীকে হরণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই ভীমসেন ফিরে এলেন এবং তার প্রাণ সংহার করলেন। এই দস্যুই হচ্ছে পুরাণের জটাসুর।

দেখতে দেখতে তাঁদের বনবাসের পাঁচবৎসর প্রায় পূর্ণ হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হবার বাসনায় আবার পর্বতাভিযানে প্রস্তুত হলেন। তাঁরা ক্রমাগত সতেরদিন উত্তর মুখে ভ্রমণ করবার পর আবার গন্ধমাদন পর্বতের একটি পরিকল্পিত স্থানে এসে পৌঁছলেন।

এইখানে এবারে তাঁরা রাজা বৃষপর্বার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তাঁর আশ্রমে সাতদিন কাটিয়ে পাণ্ডবগণ তাঁদের সহচরদের রাজার আশ্রয়ে রেখে আবার আগের মত নিজেরা মিলে উত্তরাভিমুখে চলতে লাগলেন। চতুর্থ দিবসে তাঁরা কৈলাস পর্বতে প্রবেশ করলেন। সেই পর্বত থেকে তাঁরা এলেন মাল্যবান পর্বতে এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁরা আর একবার গন্ধমাদন পর্বতে এসে সমবেত হলেন। এবারে তাঁরা আগে থেকেই পথঘাট জেনে ভ্রমণ করছিলেন, তাই ততটা অসুবিধার মধ্যে পড়েননি। গন্ধমাদনে তাঁরা রাজ আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই আশ্রমে তাঁরা বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। দ্রৌপদী কিন্তু এর মধ্যে আবার আগের মতই একটা গোলমাল পাকিয়ে তুললেন। তিনি গন্ধমাদন পর্বতের শিখিরের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে একদিন ভীমের কাছে গোপন সেই উচ্চপ্রদেশে উঠে পার্বত্য সৌন্দর্য উপভোগ করবার বাসনা প্রকাশ করলেন। ভীম প্রথমে তাঁকে না নিয়ে নিজেই উপরে উঠে পথঘাট পরীক্ষা করতে লাগলেন। অনেকখানি উঠে তিনি অদূরে যক্ষরাজের রাজধানী অলকার অপূর্ব সুষমা দেখতে সমর্থ হলেন। এই সেই কালিদাসের মেঘদূতের অলকাপুরী। কালিদাস মহাভারতের বর্ণনা অনুসারেই সে দেশের বর্ণনা প্রদান করেছেন। দূর থেকে ভীমসেন দেখলেন অলকাপুরী কাঞ্চন এবং স্ফটিকময় গৃহসমূহে সুশোভিত; তার চতুর্দিকে সুবর্ণ নির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। কোনও কোনও জায়গায় পরম রমণীয় উদ্যান দেখা গেল। এই পুরীর উচ্চ প্রাসাদশিখরগুলি অতিশয় মনোরম—দ্বার এবং তোরণগুলি পতাকাদ্বারা সুশোভিত। এমন কি, নৃত্যরতা বিলাসিনীদেরও তিনি দেখতে পেলেন। তিনি একমনে অলকার সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছেন এমন সময় যক্ষেরা এসে তাঁকে বাধা প্রদান করল, কারণ উক্ত অঞ্চল ছিল ভীমের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা। ভীমসেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং যক্ষরাজের সখা মণিমানকে হত্যা করলেন।

অচিরে এই সংবাদ যুধিষ্ঠিরের কর্ণ গোচর হল। তাঁরা ছুটে এলেন সেই উচ্চপ্রদেশে কি ঘটেছে দেখবার জন্য। ওদিকে যক্ষাধিপতিও

যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি অপরাধীর মত কৃতাঞ্জলি-পুটে সেই যক্ষরাজের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি কারণে জানা যায়না যক্ষাধিপতি তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে ভীমসেন যে মণিমানকে হত্যা করেছিলেন, তিনি এবং তদীয় অনুচরবর্গ উদ্ধত প্রকৃতির জন্য যক্ষরাজের অনুগত বা প্রীতিভাজন ছিলেননা। এক হিসাবে এই [illegible] হওয়ায় তিনি বহুল পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন; যাই হোক তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে ভীমের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে রাখলেন। তিনি স্পষ্টই বললেন যে ভীমসেন বালস্বভাব, এবং অতিরিক্ত রকমের দুঃসাহসী; তাঁকে শাসন করা অবশ্য কর্তব্য। যুধিষ্ঠিরকে নিরতিশয় লজ্জিত দেখে শেষ-পর্যন্ত ভীমসেন যক্ষরাজকে নমস্কার জানিয়ে বিনীতভাব ধারণ করলেন। তাঁর অনুচব যক্ষেরা বিচিত্র কম্বলাস্তীর্ণ বিবিধ রত্নভূষিত যানে আরোহণ করে প্রভুর অনুগমন করলেন। যাবার সময় যক্ষরাজ সেই স্থানে পাণ্ডবদের কয়েকদিন বাস করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। তাঁরাও সেই রমণীয় প্রদেশে যক্ষরাজের আতিথ্যে বাস করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

এইখানে বাসকালেই অর্জুন তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। বলা বাহুল্য এই মিলন গভীর আনন্দের হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই পাঁচ বছর অর্জুন কি করে কাটিয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি সর্বসমক্ষে স্থাপন করলেন। কিন্তু এ বিবরণ এত অলৌকিক এবং দৈবী ঘটনায় পরিপূর্ণ যে বাস্তবে তিনি কিভাবে ছিলেন তা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। তবে এটুকু মনে হয় যে কিরাত, রুদ্র এবং হিমাচলের অপরা-পর পার্বত্য অধিবাসিদের সঙ্গে থেকে তাদের রণকৌশল সম্বন্ধে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।

পাণ্ডবেরা যক্ষপুরীর এই উদ্যানভূমিটিকে বনবাসকালে সর্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি অতি রমণীয় জনপদ ছিল। এখানকার গৃহগুলি ছিল অতি সুদৃশ্য ও আরামদায়ক।

এগুলির চতুর্দিকে প্রকৃতিবিনির্মিত শৈলাঞ্চলে অতি মনোরম ও বিচিত্র ক্রীড়াস্থান রচিত হয়েছিল। পাণ্ডবেরা যাই যাই করেও এই স্থানে পুরোপুরি চারটি বছর কাটিয়ে দিলেন। এইখানেই তাঁদের বনবাসের দশটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল।

একদিন সেই অলকাপুরীর বহির্দেশ প্রদক্ষিণ করে তাঁরা বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা করলেন। তাঁরা গন্ধমাদন এবং কৈলাসপর্বতের সীমান্তে অবস্থিত রাজর্ষি বৃষপর্বার আশ্রমে একদিন থেকে বিশাল বদরীতে ফিরে এলেন। এখানে এক মাস বাস করবার পর তাঁরা সুবাহুর রাজ্যে যাত্রা করলেন। তাঁরা নাকি চীন, তুষার, দরদ, কুলিন্দ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে সুবাহুর রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। এখানে পাণ্ডবদের যে সব অনুচর রাজার আশ্রয়ে ছিলেন তারা আবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এইবার তাঁদের আজ্ঞাবাহী যে সব পার্বত্য অনুচর এপর্যন্ত এসেছিল, তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিরাতরাজ্য থেকে তাঁরা এলেন যামুন পর্বতে। মহাভারত বলছেন,—এই পর্বতের সানুসমূহ অরুণ এবং পাণ্ডুবর্ণ;—শিখরদেশসংসক্ত শিশিররাশি শ্বেতবর্ণ উত্তরীয়ের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল। অর্থাৎ, পাহাড়ের চূড়াগুলি সাদা বরফে ঢাকা ছিল। এই পর্বতের সানুদেশে বিশাখযূপ নামক একটি স্থানে তাঁরা কিছুদিন ছিলেন। তাঁদের দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হবার যে কিছুকাল বাকি ছিল সেটি তাঁরা অতিক্রম করলেন মরুধন্ব প্রদেশের প্রান্তভাগে এবং সরস্বতীতীরে দ্বৈতবনে অবস্থান করে। অবশেষে তাঁরা তাঁদের বনবাসের প্রথম পর্যায়ের অতি পরিচিত কাম্যকবনেই ফিরে এলেন। এইখানে কৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং কিছুকাল তাঁদের সঙ্গে অতিবাহিত করে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

এইভাবে তাঁদের দ্বাদশ বৎসরের বনবাস সমাপ্ত হল। যেটুকু যথার্থ বনবাস উপলক্ষ্যে ভ্রমণ সেটুকু পরম চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। এই ভ্রমণ আমাদের সুপ্রাচীন হিমাচল সভ্যতার সঙ্গে খানিকটা পরিচিত করে। বহু জনপদের অবস্থিতি আমরা জানতে পারি। কিরাত-

সভ্যতা যে একটি বিস্তৃত এবং বলিষ্ঠ সভ্যতা ছিল এটি নানা ঘটনায় জানতে পারা যায়। যক্ষেরা কারা ছিলেন, এই প্রশ্ন আমাদের মনে বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়। এদের নামের সঙ্গে প্রায়ই "মণি" শব্দটি যোজিত থাকত, যথা— মণিমান, মাণিভদ্র ইত্যাদি। এতে মনে হয় এঁরা ছিলেন বর্তমান তিব্বতীয়দের একটি প্রাচীন শাখা। গন্ধর্বদের প্রচুর উল্লেখে মনে হয় তখনও এই জাতির একটি মিশ্র অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু পাণ্ডবেরা কি পার্বত্যপথে এতদূর পর্যন্ত অভিযান করতে সত্যই সমর্থ হয়েছিলেন ? তাঁরা চীন, তুষার, দরদ প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করে-ছিলেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁদের সমগ্র ভারতব্যাপী ভ্রমণটাও অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। আসলে একটি তীর্থ-পরিক্রমার বর্ণনাপ্রসঙ্গে পাণ্ডবদের যুক্ত করে বিবৃতিকে গৌরবান্বিত করার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেটি করা হয়েছে। অর্জুনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কৌরবেরাও হিসাব রেখেছিলেন কবে পাণ্ডবদের দ্বাদশবর্ষের বনবাস অতিক্রান্ত হবে। একদিন এক বাক্‌পটু ব্রাহ্মণ হস্তিনায় এসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডবদের বনবাসকাহিনী বিবৃত করলেন। পাণ্ডবেরা আবার অনতিবিলম্বে হস্তিনায় ফিরে আসবেন জেনে ধৃতরাষ্ট্র শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হতে লাগল এবারে তাঁর পুত্রদের নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন হবে তিনি সেই ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর শঙ্কার কথা করুণভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু শকুনি ও কর্ণ দুজনে মিলে দুর্যোধনকে নানা বাক্যে উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন পাণ্ডবেরা এখন দুর্বল, তাঁদের এখনও কিছুদিন বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হবে। এই সময় দুর্যোধন যদি তাঁদের কাছে গিয়ে নিজের বিরাট ক্ষমতার নিদর্শন প্রকাশ করেন তাহলে তাঁরা নিরতিশয় ভীত হয়ে কোনও বলপ্রকাশের উদ্যোগ করবেননা। শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসন পরামর্শ করে স্থির করলেন যে দ্বৈতবনে যে সমস্ত আভীর পল্লী আছে তাদের তত্ত্বাবধান উপলক্ষ্যে সেখানে যাওয়া যেতে পারে। তাহলেই পাণ্ডবদের সাক্ষাৎভাবে

পর্যবেক্ষণ করে আসা যাবে। তাঁদের ইঙ্গিতে সমঙ্গ নামক একজন গোপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দ্বৈতবনের ঘোষপল্লী পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা নিবেদন করলেন। কর্ণ এবং শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "দ্বৈতবনের ঘোষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে সন্নিবেশিত। গোবৎসদের বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদিনিরূপক অঙ্ক প্রদান করবার উত্তম সময় উপস্থিত হয়েছে। এই সময়টা মৃগয়ার পক্ষেও উপযুক্ত। অতএব, আপনি আপনার পুত্র মহারাজ দুর্যোধনকে ঘোষযাত্রায় অনুমতি প্রদান করুন।" ধৃতরাষ্ট্র বললেন,—"এসবের প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করছি বটে, কিন্তু সেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করছেন; অতএব এখন সেখানে যাবার অনুমতি আমি প্রদান করতে পারিনা। সেখানে গেলে একটা প্রচণ্ড বিরোধ বোধ যাবার সম্ভাবনা; সেটা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। শকুনি বললেন —'মহারাজ যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক, তিনি দ্বাদশ বৎসর বনবাসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—এ অবস্থায় তাঁরা বিরোধের সম্মুখীন হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। আর তাছাড়া আমরা ধেনুসমূহের গণনা এবং অঙ্কন করবার উদ্দেশ্যে সেখানে যাচ্ছি, পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার বাসনা আমাদের নেই এবং তাঁদের উপর কোনও উৎপীড়ন করবার মনোভাবও আমাদের নেই।" অগত্যা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁদের এই পরিকল্পিত ঘোষযাত্রায় অনুমতি দিলেন। পিতার অনুমোদন লাভ করে দুর্যোধন সাড়ম্বরে ঘোষযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। তিনি দ্বৈতবনে পৌঁছোবার দুই ক্রোশ আগেই একটি স্থান ঠিক করে তাঁদের স্কন্ধাবার সমূহ স্থাপন করা হল। এই ঘোষযাত্রা সেকালের গোসংরক্ষণ প্রণালীর দিক থেকে বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

দুর্যোধন তাঁদের আবাসস্থল থেকে দ্বৈতবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত আভীরপল্লীর সমস্ত গোরক্ষণবিভাগে গিয়ে সেসব সংস্থার কার্যপ্রণালী নিপুণভাবে পরিদর্শন করেছিলেন। সেখানে তিনি যাবতীয় গাভী ও বৃষসমূহের গণনা সমাপ্ত করে তাদের চিহ্ন প্রদান করলেন। গোবৎসদের আলাদা করে গণনা করা হল এবং তাদের বয়স অনুসারে ভাগ

করে প্রত্যেক গোষ্ঠীর পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হল। কাজটি নপুণতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল। এই স্থানে গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে তাদের নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুষ্ঠানে মহারাজ ও তাঁর সভাসদ্‌গণের মনোরঞ্জন করে প্রচুর পুরস্কার লাভ করল।

এই সব কাজ মিটে গেলে দুর্যোধন দ্বৈতবনের অভ্যন্তরে একটি রমণীয় সরোবরের তীরে তাঁর স্কন্ধাবার স্থাপন করলেন। এখানে মৃগয়া করাই তাঁর—অভিপ্রায় ছিল। পুরাণ বলছেন, গন্ধর্বেরা অলকা থেকে এসে বিহার করবার উদ্দেশ্যে এই প্রদেশ আগে থেকেই দখল করে রেখেছিলেন। তাঁরা দুর্যোধনকে প্রবল বাধা দিলেন। একটা যুদ্ধ বেধে উঠল এবং তাতে দুর্যোধন সম্পুর্ণ পরাজিত হয়ে সপরিবারে বন্দী হলেন। কর্ণ যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে আত্মগোপন করলেন। কৌরবের অমাত্যবর্গ অগত্যা যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁরা যুদ্ধ করে দুর্যোধনকে সপরিবারে মুক্তি দিলেন। পাণ্ডবদের অনুগ্রহে মুক্তিপ্রাপ্ত দুর্যোধন যখন লজ্জায় দুঃখে একান্ত কাতর তখন কর্ণ আত্মপ্রকাশ করে দুর্যোধন জয়লাভ করেছেন মনে করে তাঁকে অভি-নন্দন জানালেন। দুর্যোধন ক্ষুব্ধভাবে যথাযথ যা ঘটেছে তা কর্ণকে জানালেন। এর পরে তিনি প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু অনেক কষ্টে তাঁকে এই প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত করা হয়।

এই আখ্যায়িকা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ বর্তমান। প্রথমতঃ গন্ধর্বেরা গন্ধমাদন ও তৎসন্নিহিত বহু রমণীয় পার্বত্য অঞ্চলের তড়াগসমূহ ছেড়ে এতদূরে দ্বৈতবনে একটি সাধারণ সৌন্দর্যসম্পন্ন সরোবরের তীরে কেন বিহার করতে আসবেন, সেটি উপলব্ধি হয়না; দ্বিতীয়তঃ এটি সম্পূর্ণ নীতি বহির্গত ব্যাপার; দ্বৈতবন দুর্যোধনের অধিকারে ছিল। সেখানে বরঞ্চ কুরুসম্রাটের জন্য তাঁদের তৎক্ষণাৎ সরোবর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, তা না করে তাঁরা অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের সূচনা করে অনেক বেশী বলসম্পন্ন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে স্বয়ং কুরুসম্রাটকেই সপরি-বারে বন্দী করে ফেললেন; তৃতীয়তঃ কৌরবের অমাত্যবর্গের পক্ষে কখনই রাজাদেশ ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিলনা;

তাঁরা বরঞ্চ হস্তিনায় এসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত নিবেদন করে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হতে পারতেন। চতুর্থতঃ কর্ণের মত এতবড় বীর কখনই কোনও গন্ধর্বের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হতেননা। পরাজিত হলেও পলায়ন করবার মত লোক কর্ণ ছিলেননা, অথচ মহাভারতে বার বার তাকে পলায়নপর হতে হয়েছে, যদিচ সমকক্ষাতায় তিনি একমাত্র অর্জুনের তুল্য দিলেন।

স্পষ্টই এখানেও পাণ্ডবদের গৌরব প্রদান করবার জন্যই এইরকম নীতিবহির্ভূত আখ্যায়িকার প্রবর্তন করা হয়েছে। ঘটনা যদি কিছু ঘটে থাকে তবে সেটা অন্যরকম হয়েছিল। হয়তো বনচরদের একটা গোষ্ঠী সাময়িকভাবে সরোবরের সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হওয়ায় বিদ্রোহীভাবাপন্ন হয়েছিল; কিন্তু পাণ্ডবগণ সেটা জানতে পেরে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে এই বিরোধের মীমাংসা করে দেন এবং তাঁদের উদারতায় দুর্যোধন লজ্জিত হয়ে ফিরে যান, কেননা তাঁর মূল উদ্দেশ্য আর যাই হোক প্রশংসনীয় ছিলনা। দুর্যোধন যে মনোভাব নিয়ে দ্বৈতবনে এসেছিলেন সেটি বুঝিয়ে দেবার জন্য গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনকে ঘটনাক্ষেত্রে অবতরণ করাবার প্রয়োজন ছিলনা; যুধিষ্ঠির নিজেই এটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন।

আশ্চর্যের বিষয়, —যে পুরাণ সামান্য গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণকে পরাজিত এবং পলায়মান প্রতিপন্ন করেছেন, কয়েক অধ্যায় পরে তাঁকে দিয়েই দিগ্বিজয় সাধন করিয়েছিলেন। কর্ণ একাই প্রথমে দ্রুপদ-রাজকে পরাজিত করেন এবং তারপরে আরও বহু প্রদেশ জয় করে দুর্যোধনকে বিপুল অর্থ এনে দেন। এই ঘটনা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ যে সমস্ত রাজ্য জয়লাভের কথা বলা হয়েছে সেগুলি আগে থেকেই কৌরবের অধিকারে ছিল। এমন কি, যে অঙ্গদেশের তিনি নিজে রাজা ছিলেন, সেই অঙ্গদেশকেও তিনি রাজ্যান্তর্গত করলেন, এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব এসব যে প্রক্ষিপ্ত কাহিনী মাত্র সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক্ এই জয়—যাত্রা সম্পূর্ণ করে কর্ণ কেবলমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের নয় মহিষী গান্ধারীরও

স্নেহলাভে সমর্থ হলেন। অতঃপর দুর্যোধন মহা আড়ম্বরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুরূপ বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। এই যজ্ঞে সুবর্ণনির্মিত লাঙ্গল দিয়ে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করা হয়েছিল। বহু ভূপতি আমন্ত্রিত হয়ে সভাস্থলে সমাগত হয়েছিলেন। পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি বরঞ্চ দৃঢ়ভাবে এয়োদশ বৎসরকাল নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞাপালনের সংকল্প জানিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ যাদবগণও অনুপস্থিত ছিলেন, কারণ তাঁদের কোনও উল্লেখ দেখা যায়না। যখন দুর্যোধন এই যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন তখনও পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে ছিলেন। বনবাসের যখন আর একবৎসর আটমাস অবশিষ্ট, তখন তাঁরা কাম্যক-বনে এসে বসতি স্থাপন করলেন।

এই পর্বের শেষ অধ্যায়ে সিন্ধুরাজ (সুবীর দেশের রাজা) জয়দ্রথ-কর্তৃক দ্রৌপদী হরণের করুণ হঠকারিতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি নাকি বিবাহার্থী হয়ে উত্তম বেশভূষা করে শাল্বদের কাছে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি কাম্যকবনে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিবিরাজকুমার কোটিকাস্য, ত্রিগর্তদেশীয় কুলিন্দাধিপতির পুত্র ক্ষেমঙ্কর, ইক্ষ্বাকু রাজপুত্র এবং সুবীরদেশীয় অপর দ্বাদশ রাজকুমার। পাণ্ডবেরা মৃগয়ায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন ; আশ্রমে কেবল-মাত্র পুরোহিত ধৌম্য ছাড়া আর কেউ ছিলেননা। দ্রৌপদী আশ্রমদ্বারে বসে স্বামীদের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময় তিনি জয়দ্রথের দৃষ্টিগোচর হলেন। দেখবামাত্র জয়দ্রথ স্থির করলেন যে এই রমণীকে তিনি বিবাহের জন্য নিজের রাজধানীতে নিয়ে যাবেন। তিনি কোটিকাস্যকে ডেকে এই নারীর আনুপূর্বিক পরিচয় নিয়ে আসতে বললেন। কোটিকাস্য দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। দ্রৌপদীর মনে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিল। তথাপি তিনি তাঁর এবং তাঁর স্বামীদের পরিচয় জানিয়ে তাঁদের কিছুকাল অপেক্ষা করতে বললেন,—যাতে পাণ্ডবেরা এসে অতিথি সংকার করতে পারেন। তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করলে কোটিকাস্য ফিরে এসে জয়দ্রথের কাছে দ্রৌপদীর পরিচয় নিবেদন

করলেন। এইবার জয়দ্রথ নিজেই—আশ্রমদ্বারে এসে দ্রৌপদীর সঙ্গে সম্ভাষণ করতে আরম্ভ করলেন। দ্রৌপদী তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন; কিন্তু জয়দ্রথ কালবিলম্ব না করে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। দ্রৌপদীর বাধা বিপত্তি সবই নিষ্ফল হল; পুরোহিত ধৌম্যও জয়দ্রথকে তিরস্কার ব্যতীত আর কিছু করতে পারলেননা। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথে তুলে নিয়ে বেগে রথ চালিয়ে দিলেন; তাঁর সৈন্য সামন্তেরা অনুগমন করতে লাগল। পুরোহিত ধৌম্য যথাসাধ্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই পদাতিকসৈন্যের অনুসরণ করতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যেই পাণ্ডবেরা ফিরে এসে দেখলেন দ্রৌপদীর দাসপত্নী ধাত্রেয়িকা আকুল হয়ে কাঁদছেন। তিনি দ্রৌপদীহরণের কালে যে পথে জয়দ্রথ প্রস্থান করেছিলেন সেইদিক দেখিয়ে দিলেন। পাণ্ডবেরা সঙ্গে সঙ্গে সেই পথে রথ চালিয়ে দিলেন। অবিলম্বে তাঁরা জয়দ্রথের প্রধাবিত রথ দেখতে পেলেন এবং পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গেও তাঁরা মিলিত হলেন। জয়দ্রথও তাঁদের পাঁচটি রথ দেখতে পেয়ে এই পাঁচজন কে কে তা দ্রোপদীর কাছে জানতে চাইলেন। দ্রৌপদী প্রত্যেকের পরিচয় দিতে দিতে পাণ্ডবগণ এসে জয়দ্রথকে ঘিরে ফেললেন। তখন তাঁর সঙ্গে যেসব রাজন্যবর্গ ছিলেন তাঁরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু জয়দ্রথকে রক্ষা করতে পারলেননা এবং প্রায় সকলেই নিহত হলেন। ভীত সন্ত্রস্ত জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজে প্রাণপণে পালাতে লাগলেন। দ্রৌপদী মাদ্রীপুত্রের রথে আরোহণ করলেন। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে নকুল, সহদেব ও ধৌম্যের সঙ্গে আশ্রমে ফিরে যাবার উপদেশ দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে জয়দ্রথের অনুসরণ করলেন। এদিকে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ছিলেন দুর্যোধনের ভগ্নী দুঃশলার স্বামী। সেই কারণে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলে দিলেন যে গান্ধারীর কথা স্মরণ করে তাকে যেন হত্যা করা না হয়। কিন্তু দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে তীব্র ভৎর্সনা করে অর্জুনকে বললেন; তাঁরা যেন অবশ্যই সেই দুরাত্মাকে সংহার করেন। জয়দ্রথ এর মধ্যে দুই ক্রোশ দূরে পালালেও তাঁর অশ্বগণ নিহত হয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি দৌড়তে দৌড়তে

বনের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু, অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীম তাঁকে খুঁজে বের করলেন; তারপরে তাঁর চুলের মুঠি ধরে বিষম প্রহার করতে লাগলেন। যৎপরোনাস্তি প্রহারের পর ভীমসেন অর্ধচন্দ্র বাণ দিয়ে তাঁর মাথায় পাঁচ জায়গা মুড়িয়ে পঞ্চচূড় করে দিলেন। যুধিষ্ঠিরের কথা স্মরণ করে তাঁকে তাঁরা প্রাণে মারলেননা। তাঁকে বন্ধন করে যুধিষ্ঠিরের সামনে নিয়ে আসা হল এবং সবাইকার সামনে পাণ্ডবের দাস বলে ঘোষণা করানো হল। জয়দ্রথ নিরতিশয় লাঞ্ছিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে তীব্র ভৎর্সনা করে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করলেন এবং নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে বললেন। জয়দ্রথ অতি শোচনীয় অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সমস্ত ব্যাপারটায় তৎকালীন স্ত্রীলোকেদের প্রতি উচ্চকোটির লোকেদের মনোভাব জেনে বিস্মিত হতে হয়। পঞ্চস্বামীর সেবিকা এবং তথাকথিত পঞ্চপুত্রের জননী দ্রৌপদী হরণের পক্ষে কতটা চিত্তা-কর্ষণসম্পন্না ছিলেন জানিনা, কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে অতি জঘন্যই বলতে হবে। অরক্ষিতা নারী অপরের ভার্যা বা জননী হলেও তাঁকে হরণ করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল : জয়দ্রথ তার ব্যতিক্রম ছিলেননা।

ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ সম্পুর্ণ অতিবাহিত হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির তাঁদের সঙ্গে যত অনুচর ছিলেন সবাইকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেবল-মাত্র পুরোহিত ধৌম্য ও কতিপয় হিতৈষী ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে গিয়ে অজ্ঞাতবাসের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

চার

পাণ্ডবেরা আত্মগোপনের জন্য খুব দূরবর্তী স্থানে যেতে চাননি। ইচ্ছে করলে তাঁরা সুদূর দক্ষিণদেশে চলে যেতে পারতেন; কিন্তু তাঁরা কুরুমণ্ডলের চতুর্দিকেই কোথাও থাকতে চেয়েছিলেন যাতে এক বৎসর পরে খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা কৌরবদের সম্মুখীন হতে পারেন। কুরু-মণ্ডলের চতুর্দিকে যেসব দেশ ছিল সেগুলি হচ্ছে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র এবং অবন্তী। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন—"মহারাজ এসব দেশের কোনখানে বাস করতে আপনার অভিরুচি হয় বলুন।" যুধিষ্ঠির বললেন—"মহারাজ বিরাট বলবান, ধর্মশীল, বদান্য, বৃদ্ধ ও সতত প্রীতিভাজন, বিশেষ করে পাণ্ডবদের প্রতি তিনি অনুরক্ত। অত-এব, আমরা এই একটি বৎসর বিরাটনগরে মৎস্যরাজের কাছেই বাস করতে চাই।" অতঃপর কি ঘটেছিল মহাভারত পাঠক মাত্রেই তা অবগত আছেন। যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে অক্ষবিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে বিরাট-রাজার প্রধান সভাসদ্ নিযুক্ত হলেন। এখানেও সেই পাশাই যুধি-ষ্ঠিরের অজ্ঞাতবাসের পেশা হয়ে দাঁড়ালো। শকুনি পাশাখেলায় তাঁর চেয়ে অনেক পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁকেও এই ব্যসনে যুধিষ্ঠিরের মত আসক্ত দেখা যায় না। মহাভারতে তাঁকে কেবলমাত্র পূর্ববর্তী ঘটনাতেই পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়; তারপর আর তিনি এই ক্রীড়াসম্বন্ধে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেননি। যুধিষ্ঠিরকে একা-ধিকবার পাশার প্রতি আসক্ত হতে দেখা গেছে, একান্ত শোচনীয় পরিণতির পরেও। ভীমসেন বল্লব নাম নিয়ে বিরাটরাজের সূপকার নিযুক্ত হলেন, সেই সঙ্গে তিনি মল্লবিদ্যাশিক্ষক রূপেও অধিষ্ঠিত হয়ে-ছিলেন। অর্জুন ক্লীবরূপে বৃহন্নলা নামে বিরাটরাজের অন্তঃপুরে নৃত্য ও সঙ্গীতশিক্ষার জন্য নির্বাচিত হলেন। নকুল গ্রন্থিক নাম গ্রহণ করে বিরাটরাজের অশ্বশালার ভার গ্রহণ করলেন এবং সহদেব গোপবেশে

অরিষ্টনেমি নামে বিরাটরাজের পশুপাল নিযুক্ত হলেন। দ্রৌপদী বিরাটরাজের মহিষীর সৈরিন্ধ্রীরূপে বাস করতে লাগলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁরা পাঁচটি গূঢ়নাম রাখলেন সাঙ্কেতিক প্রয়োজনে। নামগুলি হল যথাক্রমে— জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শ্মশান-সমীপবর্তী এক বিশাল শমীবৃক্ষের একটি জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বেঁধে রেখে দেওয়া হল। পুরোহিত ধৌম্য তাঁদের যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়ে পাঞ্চাল নগরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সারথি ইন্দ্রসেন এবং আর অল্প কয়েকজন যাঁরা ছিলেন, তাঁরা রথ ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে যাদবদের দেশে বাস করতে লাগলেন।

পাণ্ডবদের ছদ্মবেশে বিরাটরাজের সভায় প্রবেশ যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি আদৌ প্রতীতি জন্মাবার মত নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই বিরাটরাজকে বলেছিলেন যে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুধিষ্ঠিরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের চেহারার বিশেষত্ব কেউ ঢাকতে পারেননি। বিরাটরাজ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি নিজেও পাণ্ডবদের খবরা-খবর রাখতেন ; অতএব ছেলেমানুষের মত তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভবপর ছিলনা। সমগ্র বিরাটপর্বে বিরাটরাজ এবং তাঁর এক পুত্রকে বুদ্ধিবিহীন, নিবীর্য এবং ভয়গ্রস্ত বলে দেখানো হয়েছে, অথচ যুধিষ্ঠির নিজেই পুরপ্রবেশের আগে তাঁর সম্পূর্ণ অন্য পরিচয় দিয়েছিলেন। একের পর এক তাঁরা যেমনভাবে রাজসভায় এসেছেন তাতে যে-কোনও লোকের মনেই সন্দেহ হবার কথা। বিরাটরাজ, বিনা সন্দেহে তাঁরা যা বললেন তাই বিশ্বাস করে এক কথায় এক একটি পদ তাঁদের দিয়ে দেবেন, এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আসল সত্য এই হতে পারে যে বিরাটরাজের সঙ্গে প্রতক্ষ্যভাবে পরামর্শ করেই তাঁরা রাজ-কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্যাপারটা স্বয়ং বিরাটরাজ ভিন্ন আর কেউই বোধ হয় জানতেননা। পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতিবশতঃ এই বিপদের ঝুঁকি নিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। এর আরও একটি কারণ ছিল। বিরাটরাজ নিজে খুব শান্তিতে ছিলেননা। তাঁর বিরাট পশুশালা পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের একটি বিশাল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল

অনেকগুলি আক্রমণ তাঁর রাজ্যে এর আগে হয়ে গিয়েছিল ; বিশেষ করে ত্রিগর্তরাজ একাধিকবার তাঁর গোসম্পত্তি অপহরণের চেষ্টা করে-ছিলেন ; কিন্তু প্রতিবারই তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। তথাপি তাঁদের লুব্ধ দৃষ্টি বিরাটরাজ্যকে সর্বদাই শঙ্কাজনক পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করে রেখেছিল। এই অব্যাহতি তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর শ্যালক কীচকের সহায়তার ফলে। কীচক বাহ্যতঃ তাঁর সারথির কাজ করতেন কিন্তু আসলে সমস্ত সৈন্যের পরিচালনা তিনি নিজের হাতেই করতেন এবং যুদ্ধেও তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। তথাপি এই দুর্বিনীত ব্যক্তিটিকে বিরাটরাজ একটু'ও পছন্দ করতেন না ; অথচ আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে নিযুক্ত রাখতেই হয়েছিল। অনতিবিলম্বে তিনি আর একটি আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন। এই সময় পাণ্ডবগণকে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হলেন এবং ছদ্মবেশে এক বৎসরের জন্য তাঁদের স্বগৃহে রেখে বহুলপরিমাণে নিশ্চিন্ত হলেন।

পাণ্ডবগণ বিরাটরাজের আশ্রয়ে আসবার অনতিকালের মধ্যে দ্রৌপদীকে নিয়ে আবার গোলযোগ দেখা দিল। এবার বিপদ এল দুর্বৃত্ত কীচকের কাছ থেকে। কীচক বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার ভাই ; সুতরাং তাঁর ক্ষমতা অপরিসীম। তিনি রাজার অন্তঃপুরে যখন ইচ্ছা তখন প্রবেশ করতে পারতেন। একদিন দ্রৌপদীকে দেখে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্রৌপদী প্রথমটা তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন ; কিন্তু কীচক তাঁর কুপ্রবৃত্তি থেকে কিছুতেই বিরত হলেননা। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে একটা কুৎসিৎ পরিস্থিতিতে দাঁড়ালো। তখন, একদিন রাত্রে ভীমসেন তাঁকে গোপনে মল্লযুদ্ধে সংহার করলেন। তাঁর একশো পঞ্চাশজন অনুচর ছিলেন, তাঁরা উপকীচক নামে পরিচিত ছিলেন। এর পর তাঁদেরও বিনাশ সাধন করা হয়। বিরাটরাজ দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়লেন, কারণ কীচক এতদিন তাঁর রাজ্যকে বহিরাক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর শত্রুরাও সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগ গ্রহণ করলেন।

একদিন রাজভায় দুর্যোধন বন্ধুবান্ধব এবং ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাসহ

অবস্থান করছিলেন এমন সময় কয়েকজন দূত এসে কীচক নিধনের সংবাদ তাঁদের গোচর করলেন। সুশর্মা সেই সংবাদ শোনবামাত্র প্রস্তাব করলেন যে, ত্রিগর্তগণ এবং কৌরবগণ যদি এই সময় একসঙ্গে মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করেন, বিরাটরাজের গোধনসহ সমস্ত সম্পত্তি তাঁরা দুই পক্ষ সমান ভাগে লাভ করতে পারবেন। তখন আলোচনা করে ঠিক হল যে সুশর্মা আগেই বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে গোপদের কাছ থেকে গোসমূহ হস্তগত করবেন এবং কিছুকালের মধ্যেই কৌরবগণও বিরাটরাজ্যের উপর আর একটি আঘাত হানবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সুশর্মা তৎক্ষণাৎ বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে বহুতর গোধন অপহরণ করলেন। গোপেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে রাজার কাছে এই আক্রমণের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করল। বিরাটরাজ তৎক্ষণাৎ তাঁর ভ্রাতৃবর্গ এবং রাজপরিবারের বহুব্যক্তি ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শঙ্খকে নিয়ে সুশর্মাকে বাধা দেবার জন্য যাত্রা করলেন। তাঁদের প্রচ্ছন্নভাবে সাহায্য করতে চাইলেন,— ভীম নকুল এবং সহদেব। একটি প্রচণ্ড যুদ্ধে সুশর্মা সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। নগরে বিজয় সংবাদ ঘোষিত হল। এদিকে কৌরবগণও বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেই মুহূর্তেই এসে পৌঁছলেন এবং নগরের অপর অঞ্চলে রক্ষিত বহু সহস্র গোধন গোপদের কাছ থেকে দখল করে নিলেন। রাজধানীতে তখন হয়ত সুশর্মার পরাজয়ের কথা সবেমাত্র প্রচারিত হয়েছে। বিরাটরাজ তাঁর রাজধানীতে তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রত্যাগত হবার আগেই আর এক পর্যুদস্ত গোপাধ্যক্ষ প্রাসাদে ছুটে এসে কনিষ্ঠ রাজপুত্র উত্তরের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। উত্তর একে ছেলেমানুষ তার উপর সৈন্য সামন্ত যা ছিল তা অতি সামান্য; সুতরাং সে মহাচিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু ছদ্মবেশী অর্জুন তাঁকে অভয় দিয়ে সেই শমীগাছ থেকে নিজের অস্ত্রাদি উদ্ধার করে শত্রুদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করবার জন্য এগিয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ এই সময় বিরাটরাজের মূল বাহিনীর সঙ্গে তাঁরা একত্রিত হতে পেরেছিলেন এবং সুশর্মার পরাজয়ে উৎসাহিত বিরাটরাজের প্রবলশক্তি কৌরবদের সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিল। কৌরবগণ অনেক আশা

নিয়ে এসেছিলেন ; কিন্তু সুশর্মার অপ্রত্যাশিত পরাজয় তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করে দিল। এর উপর একটা প্রকাণ্ড গোবাহিনীকে রক্ষা করে সংগ্রাম করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। পরের দেশে এসে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিবেশে হঠাৎ প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে যদি প্রথম প্রচেষ্টায় কৌরবেরা গোধন হরণ করে বিরাট সীমানা অতিক্রম করতে পারতেন, তাহলে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত ; কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব হবার ফলে কৌরব সৈন্যদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলা বজায় ছিলনা ; যার ফলে তাঁরা গোধন পরিত্যাগ করে পশ্চাদপসরণ করে হস্তিনায় ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা যে বিরাটরাজ্যে রয়েছেন, সেটা প্রকাশ হতে বিলম্ব হলনা ; কিন্তু ততদিনে ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হয়ে পাঁচমাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর বিরাটরাজ স্বীয় পুত্রী উত্তরাকে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে মৎস্য ও ভরতকুলের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। বিবাহ বিরাট নগরেই সুসম্পন্ন হল। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণ, পাঞ্চালগণ, কাশীরাজ এবং শিবিরাজ। এই সময়ে পুরোহিত ধৌম্য এবং ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারথিগণও পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বিরাটপর্বের বিষয়বস্তু মোটামুটি এইটুকু। কিন্তু পুরাণকার এই অধ্যায়টিকে সমগ্র মহাভারতের প্রহসনপর্বরূপে উপস্থাপিত করেছেন। গোড়াথেকেই রাজসভায় পাণ্ডবদের ছদ্মবেশে প্রবেশ একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। বিরাটরাজকে যেরকম স্থূলবুদ্ধি প্রতিপন্ন করা হয়েছে তিনি কদাচ সেইরূপ ছিলেননা ; তাহলে তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রকে অপরাপর বলশালী রাষ্ট্রের মাঝখানে রেখে শাসনকার্য সুষ্ঠু ভাবে চালাতে পারতেননা। অর্জুন একাই বিশাল কৌরববাহিনীকে পরাজিত করলেন,—এটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রাজকুমার উত্তর হয়ত ভীত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাকে যতটা ভীতপ্রবণ দেখানো হয়েছে ততটা হবার কথা নয় ; কারণ সে আর যাই হোক একটি

প্রধান রাষ্ট্রের রাজপুত্র তো বটে। সেকালে ক্ষত্রিয় সন্তানদের আবাল্য একটি স্বভাবকে পরিহার করতে শিক্ষা দেওয়া হত, সেটা হচ্ছে শত্রু-ভীতি। ভীমের সঙ্গে নাট্যশালায় কীচকের মল্লযুদ্ধের যে রোমহর্ষক বিবরণ প্রদান করা হয়েছে, তাতে সমগ্র নগরেরই জেগে ওঠার কথা; কিন্তু কার্যত দেখা গেল, নাট্যশালার চারপাশে কেউ যুদ্ধের কোনও সাড়াশব্দ পাননি। সবচেয়ে বড় প্রহসন হচ্ছে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বিরাট-রাজের সিংহাসন দখল করে নিজেদের পরিচয় ঘোষণা। আশ্রয়দাতার প্রতি এইরূপ অসম্মান যুধিষ্ঠিরের মত স্থিতধী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। আনুপূর্বিক বিবরণে এই পর্বে পাঠকের সাধারণ বিশ্বাসের ওপর যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করা হয়েছে।

পাঁচ

এইবার মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জটিল রাজনীতিক মতবিনিময়ের সূচনা হতে দেখা গেল। সমগ্র কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে বোঝা-পড়ার এইটিই শেষ পর্যায়,— এর পরেই সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে এতদিনকার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস শেষ হবার পরেও বিরাট নগরেই রয়ে গেলেন। দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে যে পণ রাখা হয়েছিল, তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাত-বাসের পর পাণ্ডবগণ নিজ রাজ্য ফিরে পেতে পারবেন। সেই সর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবগণ হস্তিনায় গিয়ে সোজাসুজি বলতে পারতেন যে তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হোক; কিন্তু সেটি তাঁরা করলেননা, কারণ তাঁদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে দুর্যোধন তাঁদের হত্যা করতে পারেন। কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণ যখন দৌত্যকার্যে হস্তিনায় এসেছিলেন তখনও এই প্রবল সন্দেহটি তিরোহিত হয়নি। পুরাণকার তো বন্দী করা বা বিষ প্রদানের ব্যাপারটিকে সংশয়ের মধ্যে না রেখে সোজা সত্য পরিকল্পনা বলেই প্রচার করেছেন। কিন্তু এটা না হতেও তো পারত?

বরঞ্চ ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মই তখন বিপদে পড়ে যেতেন। অপরদিকে ধৃতরাষ্ট্র বা গান্ধারীও পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানালেন না,—যেটা না করায় তাঁদের নিরপেক্ষ মনোভাব আদৌ প্রকাশ পায়নি। দুদিক থেকেই একটা প্রবল দ্বিধার ভাব থাকায় সোজাসুজি একটা সহজ সমাধান ঘটে উঠতে পারল না। পাণ্ডবেরা ঠিক করলেন যে প্রথমে দূত পাঠিয়ে পূর্বসর্ত সম্বন্ধে কৌরবদের নিশ্চিত অভিমত অথবা প্রতিক্রিয়া তাঁরা লক্ষ্য করবেন, তারপরে পরবর্তী নীতি নির্ধারণ করবেন।

বিবাহোৎসবের পরে যাদবগণ, পাঞ্চালগণ রয়ে গিয়েছিলেন। একটি সভায় সম্মিলিতভাবে এবিষয়ে কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে আলোচনা হল। প্রথমে বাসুদেব কৃষ্ণ একটি ছোট বক্তৃতায় বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে বললেন—"কৌরবেরা যেরকম আচরণ করে চলেছেন, তাতে যদি এখনই যুদ্ধে পাণ্ডবেরা আহুত হন তাহলে তাঁদের নিঃসন্দেহে বিনাশ সাধন করবেন যদি আপনারা অনুমান করেন যে পাণ্ডবেরা সংখ্যায় অল্প বলে কৌরবদের পরাজয় করতে অসমর্থ হবেন, তাহলে যাতে তাঁদের সংহার করা যায় সেবিষয়ে যত্নশীল হোন। কিন্তু দুর্যোধন এ বিষয়ে কি করবেন তার কিছুই আমরা জ্ঞাত হতে পারি নি। পরের অভিপ্রায় অবগত না হয়ে কার্যারম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত হতে পারে? অতএব যাতে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান করবেন, এইরকম সন্ধির জন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তি আমাদের দূত হয়ে তাঁর কাছে গমন করুন।" তারপর বলদেব তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বললেন—"কৃষ্ণ যা বললেন সেটি যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেমন শ্রেয়স্কর দুর্যোধনের পক্ষেও সেইরূপ। পাণ্ডবগণ অর্ধরাজ্য মাত্র গ্রহণ করে ক্ষান্ত হতে সম্মত আছেন, অতএব দুর্যোধন তাঁদের রাজ্যার্ধ প্রদান করে সুখে কাল যাপন করুন। এইটি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হলে প্রজাগণের কোনও অনিষ্ট ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না। এখন আমারও মত হল একজন উপযুক্ত ব্যক্তি উভয়কুলের শান্তি সাধনের জন্য দুর্যোধনের কাছে গিয়ে এই প্রস্তাবে

তাঁর কি মত সেটা জেনে আসুন।" এরপর তিনি আবার বললেন— "যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ নন, সুহৃদ্‌গণের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দুর্যোধনের সভায় বহু অক্ষবেত্তা ছিলেন, যাঁদের কাউকে তিনি অনায়াসে পরাজিত করতে পারতেন; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তিনি অক্ষপারদর্শী গান্ধাররাজ শকুনিকেই দ্যূতে আহ্বান করলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ এঁর সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রমে ক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে পরাজয়পূর্বক এঁর সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করলেন। এতে শকুনির কিছুমাত্র অপরাধ নেই। এখন উপায় হচ্ছে এই যে একজন বাগ্মী পুরুষ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধি বিষয়ে প্রস্তাব করুন, তাহলে তিনি অবশ্যই সন্ধিবিধানে সম্মত হবেন। কৌরবদের সঙ্গে সংগ্রাম না করে সন্ধি করাই কর্তব্য। সন্ধি-দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হয়ে থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রামের দ্বারা উপার্জিত তা অর্থই নয়।" এই বক্তৃতা শুনে সাত্যকি যৎপরো-নাস্তি ক্ষুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে লাগলেন— "হলধরের বক্তব্যের মধ্যে বাক্যোক্তি গুলি একেবারে অসহ্য যখন অক্ষবিশারদ্‌গণ জেনে শুনে এই দ্যূতানভিজ্ঞ ব্যক্তিটিকে পরাজিত করছেন তখন তাঁদের জয় কোন বিধিতে ধর্মানুগত বলে প্রমাণিত হতে পারে? যদি যুধিষ্ঠির তাঁর নিজের গৃহে ভাইদের সঙ্গে খেলা করবার সময় দুর্যোধন প্রভৃতি সেখানে সমাগত হয়ে তাঁকে পরাজিত করতেন, তাহলে ইনি ধর্মতঃ পরাজিত হতেন। এই দুরাত্মা তা না করে প্রবঞ্চনাক্রমে যখন এঁকে কপট দ্যূতে পরাজিত করেছেন তখন তাঁদের মঙ্গল কোথায়? এখন মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজের প্রতিজ্ঞাপাশ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তবে কেন তিনি পৈত্রিক রাজ্য অধিকারের জন্য আবেদন নিবেদন করতে যাবেন? অত-এব, হয় আজ কৌরবগণ সসম্মানে রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁর পৈত্রিক রাজ্য প্রদান করুন, নইলে তাঁরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যান।" এর পর রাজা দ্রুপদ তাঁর মত প্রকাশ করে বললেন— "সাত্যকির সঙ্গে আমি এক-মত। দুর্যোধন স্বেচ্ছায় কখনই রাজ্য প্রদান করবেননা। এবং পুত্র-বৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকেই অনুমোদন করবেন। আমার মতে বল-

দেবের বাক্য কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি দুর্যোধনের সঙ্গে মৃদুতা অবলম্বন করেন তিনি তাঁকে মৃদু ও অসার বিবেচনা করে থাকেন। অতএব আমাদের এখন তীব্রভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়। আমরা এখন থেকেই সৈন্য সংগ্রহ এবং মিত্রগণের কাছে দূত প্রেরণ করব. কেননা দুর্যোধনও, সর্বত্র দূত পাঠাতে আরম্ভ করবেন এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার সুপণ্ডিত পুরোহিত ব্রাহ্মণকেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রভৃতির কাছে পাঠানো যেতে পারে। তাঁদের কাছে যে সংবাদ প্রদান করতে হবে তা আপনারা এঁকে বলে দিন। এই সঙ্গে তিনি কোন কোন রাজ্যে যুদ্ধের সহযোগিতা প্রার্থনা করে দূত পাঠানো যেতে পারে তারও একটা তালিকা দিলেন। এদের মধ্যে সপুত্র এক-লব্যের উল্লেখ আছে। এই তাঁর সম্বন্ধে দ্বিতীয় উল্লেখ। এতে মনে হয় তিনি তথাকথিত অঙ্গুষ্ঠ ছেদনের পরেও বেঁচে ছিলেন এবং সংগ্রামে অক্ষম ছিলেন না। তিনি কোনও একটি নিষাদরাজ্যের রাজা ছিলেন। এর পরে মৌসল পর্বে একটি উল্লেখে দেখা যায় কৃষ্ণ নিষাদরাজ এক-লব্যকে নিহত করেছিলেন। কিন্তু এই উদ্যোগপর্বেই সঞ্জয়ের প্রতি অর্জুনের উক্তি অনুসারে জানা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু পূর্বেই বাসুদেব কৃষ্ণ নিষাদরাজ একলব্যকে যুদ্ধে নিহত করেন। দ্রোণপর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা আবার জানিয়েছেন। আলোচনার শেষ পর্বে কৃষ্ণ আবার এই বাদানুবাদের জবাব দিতে উঠলেন। তিনি বললেন। "কুরু ও পাণ্ডবের মধ্যে আমাদের তুল্য সম্বন্ধ; তাঁরা কখনও মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমাদের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করেননি। যদি দুর্যোধন ন্যায়ত সন্ধি স্থাপন করেন তাহলে কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাত্র নাশ বা কুলক্ষয় হয়না; কিন্তু যদি তিনি সন্ধি না করেন তাহলে আগে অন্যান্য রাজ্যে দূত পাঠিয়ে পরে আমাদের আহ্বান করবেন।"

এই আলোচনার পর যাদবগণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন এবং পাণ্ডব-দের পক্ষে সংগ্রামের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু, সেই সঙ্গে পাঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে তাঁর প্রজ্ঞাশীল বয়োবৃদ্ধ পুরোহিতকে কৌরবদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে উপদেশ দেওয়া হল যে

তিনি যেন হস্তিনায় গিয়ে ধর্মবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের মন প্রসন্ন করেন অথচ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। প্রত্যেকের সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে হবে যাতে একজনের সঙ্গে আর একজনের মতভেদ ঘটে। প্রধান রাজপুরুষ অর্থাৎ অমাত্যদের অন্তর্ভেদ ঘটলে অথবা সৈনিকেরা বিমুখ হলে তাদের একতা সম্পাদনের জন্য কৌরবদের অনেকটা সময় লেগে যাবে। সেই অবকাশে পাণ্ডবেরা সৈন্যসংগ্রহ এবং আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সেরে নিতে পারবেন।

এদিকে উভয়পক্ষই চারদিকে দূত পাঠাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনের পক্ষ নিলেন এবং কিছু সৈন্যসামন্ত দিয়ে দুর্যোধনের সহায়তা করলেন। এইরকম দ্বিপাক্ষিক সহায়তা রণনীতির অনুমোদিত কিনা সে বিষয়ে সংশয় বর্তমান। কৃষ্ণ নিজে যখন নিরস্ত্র এবং সমরপরাঙ্মুখ হয়ে রইলেন তখন অপরপক্ষকে সৈন্যপ্রদান করাটা নিরপেক্ষতার পরিচায়ক ছিলনা। এটিও কৃষ্ণের একটি কূটনীতি। তিনি এটি না করলেও পারতেন; কিন্তু এতে তিনি তাঁর গোপন মনোভাব কৌরবদের কাছে চাপা থাকবে, এই রকম মনে করেছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণের মধ্যে আর কেউ এই রকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেননি। তার পরেই দুর্যোধন যখন বলদেবের কাছে উপস্থিত হলেন তখন তিনি স্পষ্টই তাঁকে বললেন যে কৃষ্ণের মত দুদিক বজায় রাখবার পক্ষপাতী তিনি নন; কৃষ্ণকে তিনি উভয় পক্ষ থেকে দূরে থাকবার যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটা কৃষ্ণ গ্রাহ্য করেননি তিনি এটাও আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করবার মত রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। অতএব তিনি উভয়পক্ষের কারুর সহায়তা করবেননা। যদুবংশে তখনই কৃষ্ণের বিপক্ষে বেশ কিছু ব্যক্তি ছিলেন। কৃতবর্মা নিজেই দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণগোষ্ঠীর বিপক্ষে যখন দারুণ বিস্ফোরণ ঘটে তখন দেখা গিয়েছিল সাত্যকি এবং কৃতবর্মার দুটি দলই প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যদুবংশের ধ্বংসসাধন করেছিলেন।

মহারাজ শল্য প্রথমটা পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেবেন মনে করে যাত্রা করেছিলেন ; কিন্তু পরে পথে দুর্যোধন যখন তাঁকে সেনাপতি করবেন বলে আশ্বাস দিলেন তখন তিনি মতপরিবর্তন করে কৌরবদের পক্ষেই যোগ দিলেন। যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত শঠতাপূর্ণ। দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেবার অব্যবহিত পরেই তিনি বিরাটনগরে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁকে কথা দিলেন যে কর্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ হবে, তখন তিনি কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করবেন ; তারপর ছলক্রমে পাণ্ডবদের অনুকূলে কর্ণের অহিত ও প্রতিকূলতা সম্পাদনা করবেন যাতে তাঁর তেজ হ্রাস পায়। প্রস্তাবটি যুধিষ্ঠিরই করেছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে তাঁর মাতুল দুর্যোধনের বাক্যে অঙ্গীকার করেছেন তখন তিনি বললেন—"মাতুল আপনি উত্তম কাজই করেছেন, কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে আপনাকে একটি অকার্য সাধন করতে হবে। যখন কর্ণ আর অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হবে তখন আপনি কর্ণের সারথ্য স্বীকার করে আমাদের হিতের জন্য অর্জুনকে রক্ষা এবং কর্ণের তেজ সংহার করবেন। এটি অন্যায় মানছি, তথাপি আমাদের মঙ্গলের জন্য এটি আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।" মদ্ররাজ তখন বললেন—"আমি সত্য করে বলছি কর্ণ যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন তখন আমি তাঁর সারথ্য স্বীকার করে তাঁকে অবশ্যই অহিত ও প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করব। এতে তাঁর চিত্তবিক্ষেপ ঘটবে এবং তোমরা তাঁকে অনায়াসে বধ করতে পারবে।" ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ন্যায়যুদ্ধে এরকম একটি জঘন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে দ্বিধাবোধ হয়নি এবং শল্যরাজও এতবড় বিশ্বাসঘাতকতায় কিছুমাত্র বিমুখ হলেননা।

যথাসময়ে দ্রুপদের পুরোহিত কৌরবদের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তিনি সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করে বললেন—"ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই একজনের সন্তান। পৈতৃক ধনে এঁদের দুজনেরই সমান অধিকার। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ করলেন আর পাণ্ডুপুত্রেরা তা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলেন—এর কারণ

কি ? যদিচ পাণ্ডবেরা কৌরবদের চেয়ে সমধিক বলবান তথাপি তাঁরা যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের রাজ্যাংশ যাতে তাঁরা লোক-হিংসা না করে পান, এইটাই তাঁরা চান। অতএব, আপনারা ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে তাঁদের প্রাপ্যটুকু প্রদান করুন। এখনও এর কাল অতীত হয়ে যায়নি।" এর উত্তরে ভীষ্ম সন্ধিপ্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করলেন; কিন্তু কর্ণ উদ্ধতভাবে বললেন—"যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিজ্ঞা কাল উল্লঙ্ঘন করেছেন এবং তাঁর অরণ্যবাস সম্পূর্ণ করেননি। আগে তিনি প্রতিজ্ঞাকাল অতিবাহিত করুন তারপর রাজ্যলাভের প্রশ্ন উঠবে। আর যদি তাঁরা ধর্মপথ পরিত্যাগ করে নিতান্তই যুদ্ধের বাসনা করে থাকেন তাহলে রণস্থলেই কৌরবদের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করে অনুতপ্ত হতে হবে।" কর্ণের উক্তিতে কোনও যুক্তি ছিলনা এবং তিনি কূট-নীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেননা, এইটাই প্রমাণ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের এই দম্ভোক্তিতে বিরক্তি প্রকাশ করে তাকে থামিয়ে দিলেন। তিনিও মৌখিকভাবে সন্ধির প্রস্তাবে অনুমোদন প্রকাশ করলেন, কিন্তু তিনি আপাততঃ সমস্যার সমাধান যত পেছিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। তিনি সভাকে জানালেন যে তিনি সেইদিনই সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন; কিন্তু কি তার বক্তব্য সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কিছু বললেননা। তারপর তিনি দ্রুপদরাজের পুরোহিতকে শিষ্টাচার প্রদান করে বিদায় দান করলেন। দূত চলে যাবার পর সঞ্জয়কে সভায় আহ্বান করে নিয়ে আসা হল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন শীঘ্র রথ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে যাও। তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করে জানাবে যে তাঁদের সব সংবাদই আমি অবগত আছি এবং তাঁরা যে কত শক্তিশালী তাও আমার অবিদিত নেই। আমি সর্বদাই পাণ্ডব-দের শান্তি কামনা করি। আমার নিজের মত হচ্ছে এই যে যুদ্ধের আগেই তাঁর ন্যায্যভাগ তাঁকে প্রদান করা কর্তব্য। যাতে যুদ্ধের আগুন না জ্বলে ওঠে এবং সবাইকার হিত হয়, তুমি পাণ্ডবদের সেই রকম-ভাবে বোঝাবে। আর কৃষ্ণের সঙ্গেও দেখা করে তাঁকে সম্ভাষণ করে এসো।" ধৃতরাষ্ট্র এখানে বলতে চাইলেন যে, যেহেতু তিনি নিজে রাজা

নন, তিনি সরাসরি রাজ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাবে কোনও আদেশ জ্ঞাপন করতে পারেন না; তিনি তাঁর নিজের মনোভাবপ্রকাশ করতে পারেন মাত্র। কিন্তু পাণ্ডবদের যখন খাণ্ডবপ্রস্থ প্রদান করা হয় তখন সেই আদেশ দিয়েছিলেন তিনিই, দুর্যোধন নন। অবশ্য তখনও দুর্যোধন হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করেননি, কার্যত রাজ্য চালাচ্ছিলেন ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র—এই দুজন। তথাপি তিনি সেই মুহূর্তে যদি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ প্রদান করতে আদেশ দিতেন, তাহলে দুর্যোধন তাঁকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। দুর্যোধন কখনও পিতার আদেশ অমান্য করেননি। যদিও তিনি বারবার লোকসমাজে জানাতেন যে ছেলেরা তাঁর কথা শোনেনা, তথাপি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুর্যোধন পিতার আদেশ লঙ্ঘন করেছেন এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। আসলে ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ইচ্ছা ছিল রাজ্যাংশ প্রদান না করা এবং এই কপটতাই তাঁর সর্বনাশ ডেকে আনল। এই মুহূর্তে মাতা গান্ধারীও নিজের ব্যক্তিত্বকে আরোপ করেননি, তিনিও মৌন হয়েই ছিলেন। এতে মনে হয়, তিনিও নিভৃত অন্তরে দুর্যোধন একলা রাজত্ব করুন এইটাই চাইতেন। গান্ধারীর সত্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে, কিন্তু এই সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্য শাসনে তাঁর দৃঢ় হস্তক্ষেপ প্রশংসনীয় হত, যে ক্ষেত্রে তাঁর স্বামী নিয়ত দোলাচলচিত্ত ও সন্তান-স্নেহে একান্তভাবে অন্ধ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধারী রাজসভায় উপস্থিত হয়ে একাধিকবার দুর্যোধনকে সন্ধির জন্য স্বীকৃত হতে অনুরোধ করেছিলেন বটে, কিন্তু তখন সময় পার হয়ে গেছে এবং দুর্যোধন মনস্থির করে ফেলেছেন।

সঞ্জয় বিরাট নগরে গিয়ে সর্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরের কুশল সংবাদ নিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপরে তিনি প্রকাশ্য সভায় সকলের সামনে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করে বললেন—"রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ বিষয়ে অনুমোদন করছেননা। তিনি সন্ধি-বিষয়টি ত্বরান্বিত করবার জন্যই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনারা সেই বিষয়ে অনুমোদন করুন; আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে

অতিমাত্রায় আশঙ্কিত বোধ করছি। আমি আপনাদের সঙ্গে বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতির শরণাপন্ন হচ্ছি।" যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন—"দেখো সঞ্জয়, আমি তো তোমার কাছে যুদ্ধের অভিলাষ প্রকাশ করিনি তবে তুমি কিসের জন্য যুদ্ধের ভাবনায় ত্রস্ত হচ্ছ? যদি সহজে অর্থ সিদ্ধ হয় তাহলে কি কেউ যুদ্ধ বাসনা করে? আমরা বনবাসে আসবার পর ধৃতরাষ্ট্র আমাদের হিতৈষী বিদুরকে বহিস্কৃত করেছিলেন এবং পুত্রদের সঙ্গে আমাদের অতুল ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করে সেই মহারাজ্যকে নিষ্কণ্টক বিবেচনা করেছিলেন। তিনি এখনও প্রভূত ঐশ্বর্য ভোগ করেও পরিতৃপ্ত হচ্ছেননা এবং আমাদের অর্থ সম্পত্তি নিজের বলে জ্ঞান করেছেন। এই অবস্থায় শান্তি রক্ষিত হতে পারেনা। এখনও যদি দুর্যোধন আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের চিহ্নস্বরূপ ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমি শান্তিপক্ষ অবলম্বন করব;—এটা তোমাকে নিশ্চিতরূপে জানাতে পারি।" সঞ্জয় এর সোজা কোনও উত্তর খুজে পেলেননা; তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন পাণ্ডবেরাই যুদ্ধের জন্য বিনা প্রয়োজনে উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি বললেন—"মহারাজ আপনি ধর্মানুগত, অতএব ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সংহারে প্রবৃত্ত হবেননা; কৌরবগণ তাহলে বিনাযুদ্ধে কখনই আপনাকে রাজ্যপ্রদান করবেননা। আপনি যদি শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞাতিবধের মত পাপানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হন, তাহলে কিসের জন্য এত বৎসর ধরে বনবাসের দারুণ ক্লেশ সহ্য করলেন? বহু রাজা তখনও আপনার বশীভূত ছিল এবং সেই সময়েই আপনি যথেষ্ট সহায় সম্পন্ন হয়ে দুর্যোধনকে পরাস্ত করতে পারতেন। কিন্তু, তা না করে বহু বৎসর বনে কাটিয়ে আপনি অপর পক্ষের বলকে বর্ধিত করবার সুযোগ দিয়েছেন এবং নিজের সহায়বর্গের বল হ্রাস করেছেন। এখন এই অনুপযুক্ত সময়ে আপনি কি ভেবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছেন? আমার অনুরোধ, আপনি জ্ঞাতিদ্রোহের মত পাপানুষ্ঠান করে সজ্জনের পথ কদাচ পরিত্যাগ করবেননা।" যুধিষ্ঠির বললেন—"তুমি আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করতে চাইছ;

কিন্তু আমাকে তিরস্কার করবার পূর্বে তোমার সবিশেষ জানা উচিত, আমি যা আচরণ করছি তা ধর্ম কি অধর্ম। যে লোক বিপদগ্রস্ত না হয়েও আপৎকালের অনুরূপ ব্যবহার করে সে নিন্দনীয় ; কিন্তু বিপন্ন হয়েও যে আপদ্ধর্মকে উপেক্ষা করে সেও সেই পরিমাণেই নিন্দনীয়। কোথায় অধর্ম ধর্মের রূপ ধারণ করে এবং কোথায় ধর্ম অধর্মের মত প্রতীয়মান হয়, তা প্রজ্ঞাবলে নির্ধারণ করা যায়। আমি তা নির্ণয় করেই তোমার সঙ্গে আলোচনা করছি। যাই হোক, কৃষ্ণ এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি কৌরব এবং পাণ্ডব উভয় কুলের হিতৈষী। এখন তিনিই বলুন যে যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহলে নিন্দনীয় হব কিনা ; আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহলে আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয় কিনা। তিনিই বলুন,—এ স্থলে আমার কি কর্তব্য হতে পারে।" কৃষ্ণ কঠোর ভাষায় সঞ্জয়ের বক্রোক্তির সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন- "সঞ্জয়, দেখা যাচ্ছে তুমি সব জেনে শুনেও কৌরবদের হিতসাধনে তৎপর হয়ে পাণ্ডবদের নিগ্রহ চেষ্টা করছ। বোধ হয় তুমি পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ ছেড়ে দিয়েই সন্ধি স্থাপন করতে বলছ। কিন্তু, সেটা কি রকমের সন্ধি হবে ? ক্ষত্রিয়েরা কি এইরকম সন্ধি ধর্মসঙ্গত মনে করেন ? এসব স্থলে ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে ধর্ম রক্ষা হয়, না যুদ্ধ না করলে ধর্ম রক্ষা হয় ? তুমিই বল এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি ? রাজা দুর্যোধন চিরন্তন রাজধর্ম অতিক্রম করে পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর কাজকেও তস্করের কাজ বলেই প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। অতএব, ন্যায্য বিষয়ের জন্য যুদ্ধ করে যদি প্রাণ বিসর্জন করতে হয়, তাও প্রশংসনীয় ; তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার কার্যে বিমুখ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। তোমারই বরঞ্চ কৌরবগণকে প্রকাশ্য সভায় ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করা উচিত এবং বলা উচিত যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছেন।" সঞ্জয় আর কথা বাড়ালেন না। তিনি দূতসুলভ বিনয় প্রদর্শনের পর মার্জনা ভিক্ষা করে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং যুধিষ্ঠির তাঁকে যাবার

অনুজ্ঞা প্রদান করে কৌরবদের সকলকে তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে বললেন। কিন্তু, তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দুর্যোধনকে যেন সঞ্জয় বলেন,—হয় যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদান করুন, না হয় যুদ্ধে অগ্রসর হোন। কথাবার্তা এইখানেই শেষ হয়ে গেল ; কিন্তু পুরাণ তাকে একটু বাড়িয়েছেন। হঠাৎ কি কারণে জানা যায় না, যুধিষ্ঠির কারুর সঙ্গে পরামর্শ না করেই আরও অনেকখানি নরম হয়ে গেলেন। বিদায় দেবার পূর্বমুহূর্তে তিনি সঞ্জয়কে বলে ফেললেন যে তাঁর রাজ্যের একাংশ মাত্র পেলেও তিনি সন্তুষ্ট হবেন। অতএব, দুর্যোধন যদি কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং অন্য আর একটি গ্রাম তাঁদের পাঁচ ভাইকে প্রদান করেন, তাহলেও তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন, আর যুদ্ধে অগ্রসর হবেন না। এইটি যুধিষ্ঠিরের উক্তি বলে সন্দেহ প্রকাশ করবার যথেষ্ট কারণ আছে ; কেননা পূর্বমুহূর্তে এবং সকল সময় যিনি অর্দ্ধরাজ্যের বিষয়ে স্থির থেকেছেন, তিনি সহসা তাঁর মতি পরিবর্তন করে পাঁচটি গ্রাম চেয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন,—এটি বিশ্বাস করা কঠিন। এসব বিষয়ে তিনি তাঁর ভাইদের পরামর্শ না নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেবেন, এরকমও সম্ভব বলে মনে হয় না। এই ধরনের উক্তিগুলি পুরাণকারদের প্রয়োগচাতুর্য ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না।

সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করে বললেন—"মহারাজ, দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে আপনি যুধিষ্ঠিরকে যে রাজ্যার্ধ প্রদান করেছিলেন তিনি সেইটুকুই গ্রহণ করতে অভিলাষ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির আরও বলেছেন যে আপনি পুত্রের বশীভূত হয়ে পাণ্ডবদের ন্যায্য বিষয়সমূহ আত্মসাৎ করবার পরিকল্পনা করেছেন, যা সর্বাংশে আপনার অনুপযুক্ত। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন, দুষ্কুলজাত, নিষ্ঠুর, শত্রুতা-সম্পন্ন, ক্ষত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, বীর্যহীন ও অশিষ্ট সেই ব্যক্তিই এই ধরণের আপদ্ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। এ কাজ আপনার পক্ষে কোনক্রমেই সমুচিত নয়। যদি পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহলে তাঁরা যুদ্ধে কুরুকুলকে ধ্বংস

করতে উদ্যত হবেন।" এই কথা বলে সঞ্জয় বিদায় গ্রহণ করলেন।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে সঞ্জয় যা বলেছেন তা জানালেন এবং তাঁর কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ ধর্মানুগত কথা শুনতে চাইলেন। বাহ্যতঃ বিদুর হিতৈষী মনোভাব প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে পাণ্ডবদের রাজ্যার্ধভাগ প্রদান করবার উপদেশ দিলেন। এই প্রসঙ্গে বিদুর তৎকালীন রাজধর্মের নীতিগুলি তাঁর কাছে অতি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁকে তৎকালে অতি শুদ্ধচিত্ত বলেই মনে হয়েছিল এবং অন্তরের নিভৃতে কি মনোভাব লুকিয়েছিল তা নির্ণয় করা সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র স্বীকার করলেন যে বিদুর তাঁকে সদুপদেশ প্রদান করলেও পুত্র দুর্যোধনকে স্মরণ করলেই তাঁর বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মায়। অতএব, দৈবকে অতিক্রম করা কারুর সাধ্যায়ত্ত নয় এবং দৈবই প্রধান, পুরুষকার নিরর্থক। বিদুর এটি ভাল করেই জানতেন; তাই ধৃতরাষ্ট্রকে হিতকথা শোনাতে তিনি অকৃপণ ছিলেন। বিদুর বরাবরই কুরুবংশ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে রাজ্যার্ধ শাসন করুক, এটাই চাইতেন; এক্ষেত্রে তার অন্যথা হবার মত কোনও উপদেশ তিনি দিলেন না। পরবর্তী রাজসভায় সঞ্জয় আবার একটি বিবৃতি প্রদান করেছিলেন; কিন্তু তার সঙ্গে পূর্বে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে যা বলেছিলেন তার মিল নেই। মহাভারতে এরকম বহু অধ্যায় আছে, যাতে একটির সঙ্গে আর একটির মিল দেখা যায় না।

যাই হোক, এই সভায় সঞ্জয় পাণ্ডবগণ কাদের সহায় করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন, সেসব বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। এসব শুনে ভীত ধৃতরাষ্ট্র আবার দুর্যোধনকে বললেন—"এ যুদ্ধ ঘটলে সমস্ত কুরুকুল নির্মূল হলে যাবে; অতএব তোমাদের কাছে আবার অনুরোধ করি তোমরা সন্ধির জন্য যত্নবান হও।" দুর্যোধন পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—"মহারাজ, ভীত হবেননা এবং আমাদের জন্য শোক করবেননা, আমরা শত্রুদের পরাজয় করতে সমর্থ হব। আমার পক্ষেও বহু ধনশালী নরপতি যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মিলিত শক্তির

কাছে পাণ্ডবেরা কখনই দাঁড়াতে পারবেননা। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।" এরপর দুর্যোধন সঞ্জয়কে বহুবিধ প্রশ্ন করে পাণ্ডবদের বল সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করলেন। কিন্তু তাতে তাঁর চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হলনা; তিনি পিতাকে জানালেন যে জয় সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। তথাপি ধৃতরাষ্ট্র আদৌ উৎসাহিত বোধ করলেন না; তিনি বারবারই সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে সভায় রাজমাতা গান্ধারীকে আহ্বান করে নিয়ে আসা হল। তাঁরা দুজনেই দুর্যোধনকে কৃষ্ণের সঙ্গে সহযোগিতা করে পাণ্ডবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রস্তাব করলেন; কিন্তু দুর্যোধন পিতাকে সম্বোধন করে বললেন,—"যদি কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন করে সমস্ত লোকসংহারের জন্য সমুদ্যত হন তথাপি আমি এখন আর তাঁর শরণাপন্ন হব না।" গান্ধারী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—"তুমি যখন সব হারিয়ে ভীমের হাতে শরীরপাত করবে তখন আমাদের কথা তোমার স্মরণ হবে। তখন কেবল শোক করা ছাড়া আমাদের আর কোনও গতিই থাকবেনা।" গান্ধারীর কথার শেষ অংশটি সত্য হয়েছিল, প্রথমটি হয়নি; কারণ দুর্যোধন অন্যায় যুদ্ধে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল বলে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, অন্য কারণে নয়। এর পরে সভায় আর কোনও কাজ হল না।

পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সঞ্জয় ফিরে আসবার পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন,—"তুমি তো ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় সবই শুনলে; তাঁর আজ্ঞানুসারেই আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেছি এবং চতুর্দশ বর্ষে তিনি আমাদের রাজ্য প্রদান করবেন, এই বিবেচনা করে আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি। এখন তিনি পুত্রের প্ররোচনায় অন্য মতাবলম্বী হয়েছেন। আমি শেষপর্যন্ত পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলুম, যাতে আমরা পাঁচ ভাই কৌরবদের সঙ্গে বিবাদ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ওই কটি স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারি। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় ধৃতরাষ্ট্র এতেও সম্মত নন। এখন এই সমস্যা সমাধান করা আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি

তোমার পরামর্শ প্রার্থনা করি।" কৃষ্ণ তখন বিশেষ বিবেচনা করে বললেন,—"মহারাজ আমি আপনাদের উভয় পক্ষের হিতের জন্য নিজেই কৌরব সভায় গমন করব।" যুধিষ্ঠির তাঁকে নিবৃত্ত করবার অভিপ্রায়ে বললেন,—"সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না, কারণ তুমি অত্যন্ত হিতকর বাক্য বললেও দুর্যোধন সেইভাবে কাজ করবেন না।" কৃষ্ণ বললেন—"মহারাজ, আমি দুর্যোধনকে ভালরকম চিনি ; কিন্তু আমরা যদি আগে সেখানে গিয়ে সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাব করি তাহলে লোকে আমাদের শেষকালে নিন্দা করতে পারবেনা এইটি বিবেচনা করেই আমি কুরুসভায় যাবার বাসনা করেছি।" যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে যাবার অনুমতি প্রদান করলেন। যাবার আগে পাণ্ডবগণ একক্ভাবে কৃষ্ণের কাছে তাঁদের অভিমত প্রদান করলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় ভীমসেন থেকে সহদেব পর্যন্ত সকলেই সন্ধির অনুকূলে মত প্রকাশ করলেন ; অবশ্য যুদ্ধ হলে তাঁরা যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত একথাও জানিয়ে দিলেন। দৌপদী কিন্তু এই মৃদুভাবে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন। তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন—"মহারাজ যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে চুপিচুপি মাত্র পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবার যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন, তা আমি জানি এবং সেটুকু প্রস্তাবও যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাও আমার অবিদিত নেই। তুমি কৌরবসভায় যাবার পর দুর্যোধন যদি সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে তাতে কদাচ সম্মত হবে না। যুদ্ধ যেন নিশ্চয়ই ঘটে। কৃষ্ণ, তুমি ধর্মবিৎ ; তুমি জানো যে পণ্ডিতগণ বলেছেন, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বধ না করলেও সেই পাপই ঘটে থাকে। অতএব, পাণ্ডবেরা যেন ক্ষমার নামে সেই পাপে লিপ্ত না হন, তা তুমি অবশ্যই করবে।" চতুর কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"কৃষ্ণা, তুমি অতি অল্পদিনের মধ্যেই কৌরব মহিলাদের আকুল হয়ে কাঁদতে দেখবে। তুমি এখন যেমন আমার সামনে কাঁদছ, কুরুকুলের মেয়েরাও তাঁদের জ্ঞাতিবান্ধবেরা নিহত হলে সেই ভাবেই কাঁদবেন।"

পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণ রথে উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র স্থাপন করে সাত্যকিকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে শুভ মুহূর্তে হস্তিনার পথে অগ্রসর হলেন। সারাদিন পথে কাটিয়ে সন্ধ্যায় তাঁরা বৃকস্থল বা উপপ্লব্য নামক গ্রামে (এইটি যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত পঞ্চগ্রামের একটি) এসে পৌঁছোলেন। দুর্যোধন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুসারে এখানে কৃষ্ণের বাসের জন্য একটি উত্তম গৃহ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ সেই কৌরব নির্মিত গৃহে অবস্থান করলেননা।

পরের দিন সকালেই কৃষ্ণ হস্তিনায় প্রবেশ করবেন জেনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে মহার্ঘ্য উপহার দেবার বাসনা জানালেন। এই সব উপহার সামগ্রীর মধ্যে বাহ্লীক দেশীয় অষ্ট অশ্ব যোজিত সুবর্ণশোভিত রথ, বিশালকায় হস্তী, চীন দেশীয় অশ্ব, পার্বত্য দেশীয় মেষ প্রভৃতি বহু দুর্লভ প্রাণী ও বস্তু ছিল। এই সব বিবরণ শুনে বিদুর বললেন—"মহারাজ, আপনি কৃষ্ণকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে এই সব দ্রব্য প্রদান করবার অভিলাষ করেছেন এবং কপট আচরণ করে তাঁকে প্রবঞ্চিত করবার পরিকল্পনা করেছেন।" ধৃতরাষ্ট্র এই মন্তব্যে নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছিলেন, কারণ এটি সেকালকার রাজন্যবর্গের শিষ্টাচার। এর মধ্যে কোনও গূঢ় মতলব নিশ্চয়ই ছিল না। বিদুরের এই বাক্যগুলি নিরতিশয় কঠোর বোধ হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, তিনি নিজেই কৌরবদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁদের বৃত্তিভোগী হয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তা জানতেন ; কিন্তু তিনি মুখে তা প্রকাশ করলেন না। দুর্যোধন বললেন,—"বিদুর যেমন নিজে ভাবেন তেমনই বলেছেন ; তবে আমরাও মনে হয় পাণ্ডবদের প্রতি অনুরক্ত কৃষ্ণকে এগুলি দেওয়াও যা না দেওয়াও তা ; এসবে তাঁর প্রীতি সম্পাদিত হবেনা। তার চেয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখলেই ভাল হয় ; পাণ্ডবেরা তাহলে আপনা থেকেই আমাদের বশীভূত হতে পারত।" কিন্তু, ধৃতরাষ্ট্র বললেন,—"দেখ, হৃষিকেশ দূত হয়ে আসছেন ; বিশেষতঃ তিনি আমাদের আত্মীয় এবং কুরুকুলের কোনও অনিষ্ট চেষ্টা তিনি কখনও করেননি ; অতএব তাঁকে আবদ্ধ

করা কোনক্রমেই বিধেয় নয়।" দুর্যোধন অবশ্যই এবম্বিধ কার্যের পরিণাম সম্বন্ধে সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন। তবে, পুরাণকারেরা তাঁর উপর এইসব নিকৃষ্ট অভিসন্ধি আরোপ করেছিলেন তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করবার উদ্দেশ্যে।

পরদিন সকালে কৃষ্ণ বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়ে হস্তিনায় প্রবেশ করলেন। তিনি কৌরবদের সুবিশাল রাজপুরীতে প্রবিষ্ট হয়ে তিনটি কক্ষা অতিক্রম করে ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষে প্রবেশ করলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গাত্রোত্থান করে তাঁকে অত্যন্ত সমাদরে সুবর্ণময় আসনে বসতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ আসনে উপবিষ্ট হলে পুরোহিতগণ তাঁকে ন্যায়ানুসার গো, মধুপর্ক ও পবিত্র জল প্রদান করলেন। কৃষ্ণ এই মনোরম আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুক্ষণ রাজভবনে কাটিয়ে কুরুসভায় উপস্থিত হলেন। সেখানে সকলকার সঙ্গে সমবেত হয়ে কুশল সম্ভাষণাদির পর বিদুরের ভবনে এসে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। বিদুরের গৃহেই কুন্তী অবস্থান করছিলেন;—তিনি অল্প-ক্ষণের মধ্যেই নিজের পিতৃস্বসার কাছে গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। কুন্তী ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে প্রচুর অশ্রুবিসর্জন করে তাঁর সন্তানাদি সকলের সংবাদ গ্রহণ করলেন। কুন্তীর সঙ্গে দেখা করে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। দুর্যোধন তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর গৃহে ভোজন গ্রহণ পূর্বক আতিথ্য স্বীকার করতে অনুরোধ জানালেন; কিন্তু কৃষ্ণ রাজপ্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন,—"দূতগণ কাজ সুসম্পন্ন হলেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে থাকেন; অতএব আমি কৃতকার্য হলে তবেই তোমার পূজা গ্রহণ করব।" দুর্যোধন কিছুটা দুঃখিত হয়েই বললেন,—"অতিথিকে পূজা করা এবং ভোজ্য প্রদান করা আমার ধর্ম; আমি তা থেকে বিচ্যুত হতে পারিনা। আমি প্রীতি-পূর্বক পূজা করলেও তুমি কি কারণে তা গ্রহণ করবেনা, তার যথার্থ কারণ আমার বোধগম্য হচ্ছে না, এইরকমভাবে আমার আতিথ্যকে অস্বীকার করাটা তোমার পক্ষে উচিত হচ্ছে না।" কৃষ্ণ তখন মৃদু

হেসে বললেন—"তুমি প্রীতি সহকারে আমাকে আহার্য প্রদান করতে বাসনা করোনি, আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হইনি, তাহলে কি কারণে তোমার অন্ন ভোজন করব ? যে পাণ্ডবদের দ্বেষ করে সে আমারও বিদ্বেষের পাত্র ; আর যে ব্যক্তি তাঁদের অনুগত সে আমারও অনুগত। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিদের ধর্ম অপহরণ করতে ইচ্ছা করে সে কখনই সেই সম্পত্তি ভোগ করতে পারেনা। আমার স্পষ্টই বোধ হচ্ছে তুমি কোনও দুরভিসন্ধি করে আমাকে ভোজন করতে অনুরোধ করছ, অতএব আমি কখনই তোমার এই সব ভক্ষ্য সামগ্রী গ্রহণ করবনা। কেবল বিদুরের ভবনে ভোজন করাই আমার শ্রেয় বোধ হচ্ছে।" এই বলে কৃষ্ণ রাজভবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এই ব্যবহারে দুর্যোধনের ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কৃষ্ণ কুরুসম্রাটের কাছে দূত হয়ে এসেছিলেন ; তিনি আহার না করলেও বিনীতভাবে সেই অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারতেন ; কিন্তু তা না করে তিনি যেরকম উদ্ধতভাবে একজন মহামান্য ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ করলেন তা অত্যন্ত অপমানজনক। দুর্যোধন যে তাঁর আহারে বিষ প্রয়োগ করে রেখেছিলেন, একথাই বা তিনি বিশ্বাস করলেন কি করে ? কৃষ্ণকে অপরে যেরকম উত্তুঙ্গ স্থানে বসিয়েছিলেন, দুর্যোধন কখনই তা করেননি এবং তিনি কৃষ্ণকে তেমন একটা গুরুত্বও দিতেন না। কিন্তু, কোনও কারণেই ভোজ্যদ্রব্যে বিষপ্রদানের অনুমান কিছুমাত্র সঙ্গত বলে মনে হয়না। যদি দুর্যোধনের মনোভাব এরকমই হত, তাহলে সর্বাগ্রে বিদুরই বিষপ্রদানে নিহত হতেন। যাই হোক, প্রথম আচরণেই কৃষ্ণ দুর্যোধনের মনোভাবকে অত্যন্ত কঠোর করে দিলেন। এর পর থেকে সন্ধির সমস্ত প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, সেবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিলনা। দুর্যোধনের স্বভাবে একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি কারুর উদ্ধতভাব সহ্য করতে পারতেননা এবং একবার ক্রুদ্ধ হলে সে ক্রোধ একটা জাতক্রোধে পর্যবসিত হত।

কৃষ্ণ অতঃপর বিদুরের সঙ্গে তাঁর গৃহে আহারাদি করলেন।

বিদুরও এই সুযোগে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে তাঁকে নিরতিশয় উত্তেজিত করে তুললেন। রাত্রিযাপনের পর সকালে কৃষ্ণ কৌরবদের রাজসভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং কৌরবেরা অগ্রণী হয়ে তাঁকে মহা সমাদরে রাজসভায় পৌঁছে দিলেন। কৃষ্ণ একদিকে বিদুরের এবং অপরদিকে সাত্যকির হাত ধরে সভায় প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। সেখানে সকলেই আর একবার তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। সভাস্থল শান্ত হলে কৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য নিবেদন করলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন—"মহারাজ, আমি কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য এসেছি। আপনি আপনার পুত্রদের শান্ত করুন, আমি পাণ্ডবদের নিরস্ত করব। পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলেছেন যে তাঁরা আপনাকে পিতৃজ্ঞান করে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করে বহু ক্লেশ সহ্য করেছেন। এখন যাতে তাঁরা স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করতে পারেন আপনি সেরূপ করুন। আমি নিজেও পাণ্ডবদের রাজ্যপ্রদান করে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়া আপনাকে অন্য কিছু উপদেশ দিতে পারিনা। আপনিই আপনার পুত্রদের পরামর্শ অনুসারে পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করতে আদেশ করেছিলেন। তাঁরা সেইভাবে সেখানে বাস করে নিজেদের প্রভাবে বহু রাজ্য আপনার অধীন করেছিলেন। তাঁরা আপনার মর্যাদা কখনও অতিক্রম করেননি। কিন্তু, আপনাদের ষড়যন্ত্রেই দ্যূতক্রীড়ায় যোগদান করে তাঁদের রাজ্য ও ধনসম্পত্তি অপহৃত হয়েছে। যাই হোক, পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন;—আপনার যা অভিরুচি হয় করুন।"

কৃষ্ণের বক্তৃতা শেষ হলে উপস্থিত সম্মানিত ব্রাহ্মণগণ দুর্যোধনকে একবাক্যে সন্ধির উপদেশ দিলেন; কিন্তু দুর্যোধন বললেন—"পরমেশ্বর আমাকে যেটুকু বুদ্ধি দিয়েছেন আমি সেই অনুসারে কাজ করছি। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘটবে। আপনাদের অবাঞ্ছিত উপদেশ আমার কাছে প্রলাপের মত মনে হচ্ছে।" ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের উক্তির

প্রত্যুত্তরে বললেন—"কৃষ্ণ, তোমার বাক্য লোকাচারসঙ্গত ও ন্যায়ানু-মোদিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি স্বাধীন নই, সুতরাং আমার মনের মত কাজ হয়না। তুমি দুর্যোধনকে উপদেশ দিতে সচেষ্ট হও।" তখন কৃষ্ণ দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন—"দুর্যোধন, তুমি আমার কাছ থেকে যে বাক্য তোমার এবং তোমার বংশের পক্ষে শান্তিকর তা মনোযোগ পূর্বক শোনো। সন্ধিস্থাপনই তোমার সমুচিত কাজ। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা তোমার পিতার এবং অমাত্য-বর্গের নিতান্ত অভিপ্রেত। এখন সেই প্রস্তাব তোমারও অনুমোদন লাভ করুক। তুমি হীন উপায় অবলম্বন করে একটি বিশাল রাজ্য লাভ করতে উৎসুক হয়েছ এবং সত্যপরায়ণদের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করছ। এই সমস্ত পরিত্যাগ করে সুহৃদগণের বাক্যরক্ষা, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন এবং তাঁদের রাজ্যার্ধ প্রদান করে গৌরব লাভ কর, সেই সঙ্গে মিত্রগণের প্রীতিভাজন হয়ে চিরকাল অবস্থান কর।" কিন্তু, দুর্যোধনকে কৃষ্ণ আগেই অতিমাত্রায় বিদ্বেষ সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। এখন তিনি উত্তর দিলেন—"দেখো কেশব, আমি ভীত হয়ে কারুর কাছে নতি স্বীকার করার মত লোক নই। আমার পিতা আগে যে পাণ্ডবদের রাজ্যের অর্ধাংশ প্রদান করতে অনুজ্ঞা করেছিলেন, আমি জীবিত থাকতে কখনই তা হবে না। যে পর্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকবেন সে পর্যন্ত আমরা বা তারা,—এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ভীক্ষুকের মত জীবন যাপন করতে হবে। আগে আমি পরাধীন এবং বালক ছিলাম; সেই সময়ে অজ্ঞানবশতই হোক বা ভয়ের দারুণই হোক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হয়েছিল। এখন আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবেরা কখনই তা প্রাপ্ত হবেনা। সুতীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগ দিয়ে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ করা যায়, আমি পাণ্ডব-দের সেটুকও প্রদান করবনা।" কৃষ্ণ তখন শেষবারের মত তাঁকে বললেন—"দুর্যোধন, তুমি বন্ধুদের সঙ্গে বীরশয্যা লাভ করতে বাসনা করছ, তা তোমার অবশ্যই ঘটবে। তাহলে স্থির হয়ে শোনো,—শীঘ্রই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হবে। স্পষ্টই বোধ হচ্ছে, শ্রেয়োলাভ তোমার

অদৃষ্টে নেই।" খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই সময় দুঃশাসন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বললেন—"মহারাজ, যদি আপনি নিজের ইচ্ছাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন না করেন তাহলে কৌরবেরা আপনাকে বধ করে যুধিষ্ঠিরের হাতে সমর্পণ করবেন। দেখুন,—এই সভায় সকলেই আপনাকে, আমাকে এবং কর্ণকে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে উৎসুক হয়েছেন।" এই দুঃশাসনই কি প্রকাশ্য সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন? এসব উক্তিতেই প্রমাণিত হয় যে কৌরবসভায় দ্যূতক্রীড়ার সময় এতটা চরম ও নির্মম আচরণ তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়নি। দুর্যোধন কিন্তু এতে আরও রুষ্ট হয়ে হঠাৎ আসন থেকে উঠে সভাস্থল পরিত্যাগ করলেন।

এইখানেই কৃষ্ণের দৌত্যকার্য শেষ হল। পুরাণ অবশ্য ঘটনাকে আরও বাড়িয়েছেন। তাঁরা কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, দুর্যোধনকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা হোক এবং সভাস্থলে গান্ধারীকে এনেও বহু উপদেশ শুনিয়েছেন, কিন্তু এগুলি পুনরুক্তি মাত্র। ফলকথা, দুর্যোধনকে এঁরা কেউ ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন নি। পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস ও অজ্ঞাতবাস অতীত হলে ধৃতরাষ্ট্র নিজেই রাজ্যার্ধ দিয়ে দিতে পারতেন, দুর্যোধন কখনই তাতে বাধা দিতে পারতেননা। তা না করে, এমন সব ঘটনা ঘটানো হল যাতে দুর্যোধনের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে ওঠে। উদ্ধত প্রকৃতির দুর্যোধন যখন দেখলেন সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে গেছেন এবং তাঁকে ঘৃণা করছেন তখন তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উন্মত্তের মত উগ্রভাব ধারণ করলেন। কৃষ্ণকে কৌরবসভায় পাঠানো সবচেয়ে অপ্রীতিকর কাজ হয়েছিল। কারণ, তিনি বিদুরের মতই আন্তরিকভাবে কৌরবের হিতৈষী ছিলেন না। পাণ্ডবগণ যখন হস্তিনা থেকে বনবাস যাত্রা করেছিলেন তখন তাঁদের উচিত ছিল হস্তিনায় ফিরে আসা। স্বীয় বাসভবনে ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কাছে দাঁড়ালে তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরে পেতেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিলনা। আসলে, তাঁরা নিজেরাই যুদ্ধ চাইছিলেন, তাই বাহ্যতঃ একটা ছলক্রমে সন্ধির প্রসঙ্গ তুলে তাকে

ভেঙে দিলেন। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কৌরবদের রাজ্যাংশ লাভ করবার আশায়; সেটা যখন সফল্ হলনা তখন যুদ্ধ-দ্বারা তাকে লাভ করতে সচেষ্ট হলেন। উভয় পক্ষই জানতেন সন্ধিটা লোক দেখানো শান্তির প্রয়াসমাত্র, আর কিছু নয়।

কৃষ্ণকে বন্দী করবার প্রস্তাব কিছুতেই বাস্তব পরিকল্পনা নয়। সেযুগে দূতকে বন্ধন করা কোন ক্রমেই অনুমোদিত হতনা এবং দুর্যোধন কাপুরুষ ছিলেননা। এগুলি সবই কৌরবদের হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। তা ছাড়া, যে কৃষ্ণ এত অলৌকিক কার্যের সাধক, তিনি বিষ উদরস্থ করলেও মৃত্যু মুখে পতিত হবেন, এমন সম্ভাবনাকে পুরাণকারগণ অনায়াসেই তিরোহিত করতে পারতেন।

কৃষ্ণ অতঃপর সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করে সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্বক বিদুরের আবাসে ফিরে এলেন। হস্তিনা ছাড়বার আগে তিনি কুন্তীর সঙ্গে দেখা করে বললেন—"দেবি, আমার সন্ধিস্থাপনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে এবং দুর্যোধনের অনুগত সকলেরই শেষ দৃশ্য সমুপস্থিত হয়েছে বলে মনে হয়। আমার আর কিছুই করবার নেই আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে যাচ্ছি।" কুন্তী তাঁকে বললেন, তিনি যেন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জানান যে তিনি ক্ষত্রিয়, আপদ থেকে পরিত্রাণ করাই তার কর্তব্য। অতএব,—সাম দান, ভেদ, দণ্ড বা নীতিদ্বারা তিনি যেন অপহৃত পৈতৃক অংশ পুনরায় উদ্ধার করেন। কুন্তী নিঃসংশয়ে তাঁর উক্তিতে প্রমাণ করলেন যে তিনি যুদ্ধের পক্ষপাতী। কুন্তীর অবস্থান বরাবরই একটু আশ্চর্য ঠেকে। তিনি কেবলমাত্র দ্রৌপদীর বিবাহ পর্যন্ত পুত্রদের সঙ্গে একত্রে বাস করে-ছিলেন। তারপর থেকেই তিনি একটু আলাদা আলাদা থাকতেন। পাণ্ডবেরা যখন বনে গমন গমন করলেন তখন তিনি বিদুরের কাছে রইলেন এবং কৌরবদের অন্তঃপুরে তাঁর গতিবিধি ছিলনা,—এটাই অনুমান করতে হয়। পাণ্ডবেরা যখন বনবাস সম্পূর্ণ করে ফিরলেন তখনও কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে গেলেননা এবং তাঁরাও

মাকে নিয়ে আসার কোনও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেননা। এই যে এত দৌত্যকার্য হয়ে গেল, এর মধ্যে কুন্তীর কোনও ভূমিকা ছিলনা। তিনি নিজে একবার তাঁর ভাসুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেননা কেন? এতে তো কোনও অসম্মানের ব্যাপার ছিলনা। তিনি যদি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সাক্ষাৎভাবে আবেদন জানাতেন, তাহলে ফল হয়ত হিতকর হতে পারত। তিনি হয় বিদুরের পরামর্শে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছিলেন, নয়তো কর্ণ সংক্রান্ত কোনও জনরব যাতে সোচ্চার না হয়ে ওঠে, সেই কারণেই নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, যুদ্ধে জয়লাভের পরেও আর তিনি পুত্রদের সংশ্রবে আবদ্ধ থাকেননি এবং শেষ পর্যন্ত গান্ধারী আর ধৃতরাষ্ট্রই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সে প্রসঙ্গ পরে উত্থাপন করা হচ্ছে।

কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম জানিয়ে বিদুরভবন পরিত্যাগ করে রথে এসে উঠলেন। সেখানে নাকি তাঁর কর্ণের সঙ্গে দেখা হয় এবং তিনি একান্তে কর্ণকে রথে তুলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন আলোচনা করেন। এই আলোচনাটি কি, তা মহাভারত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কৃষ্ণ নাকি কর্ণকে তাঁর জন্মপরিচয় বিবৃত করে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর মাতার কন্যাবস্থার সন্তান এবং ধর্মতঃ পাণ্ডুর পুত্র; অতএব, পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করা তাঁর নীতিগতভাবে কর্তব্য এবং সেক্ষেত্রে দ্রৌপদীও তাঁকে ষষ্ঠ স্বামীরূপে বরণ করতে পারেন। উত্তরে কর্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে তার জন্মবৃত্তান্ত তিনি অবগত আছেন; কিন্তু কুন্তি তাঁকে তাঁর অমঙ্গলের উদ্দেশ্যেই পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি সূত অধিরথকেই পিতা এবং রাধাকে তাঁর মাতা বলে জানেন। সূতজাতির সঙ্গেই তাঁর বিবাহাদি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারকে এখন তিনি একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে নিক্ষেপ করতে চান না। সবচেয়ে বড় কথা দুর্যোধন তাঁর উপর নির্ভর করেই যুদ্ধ স্থির করেছেন; এই অবস্থায় তিনি তাঁর সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করতে একান্ত অপারগ। কৃষ্ণ সবই শুনলেন; একটু হেসে বললেন—"কর্ণ আমি তোমাকে পৃথিবী প্রদান করেছিলাম, কিন্তু তুমি

তা গ্রহণে অসম্মতি জানালে।" তারপর কর্ণ রথ থেকে অবতরণ করলে, কৃষ্ণ হস্তিনা প্রদেশ অতিক্রম করতে আরম্ভ করলেন।

এই কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না ; কারণ সমস্ত ঘটনাটাই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বিবৃত করেছিলেন। এই একান্ত গোপন আলোচনা সঞ্জয়ের কর্ণগোচর হবার সম্ভাবনা ছিলনা। কর্ণও সভাস্থলে যে ঘটনা ঘটেছিল তার পরে একান্তে কৃষ্ণের সঙ্গে কোনও আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন ; সেটা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়না। আসলে অল্পকাল পরে কুন্তী যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন, সেটাই যথার্থ ঘটনা বলে মনে হয়।

কৃষ্ণ চলে গেলে বিদুর কুন্তীকে বললেন—"দেবি, আমি যুদ্ধের বিপক্ষে। আমি বারবার দুর্যোধনকে সন্ধি স্থাপন করতে অনুরোধ করেছি ; কিন্তু সেই দুরাত্মা আমার কথায় কর্ণপাত করেনা। এখন একটি প্রচণ্ড সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী এবং এই চিন্তায় আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।" কুন্তির উক্তি থেকে আগেই জানা গেছে যে তিনি যুদ্ধের জন্য তেমন বিব্রত বোধ করেননি, কেবল তাঁর পঞ্চ পুত্র যাতে রক্ষা পায় সেইটাই তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কর্ণের প্রতি তাঁর কতটা স্নেহ ছিল বলা শক্ত, তবে কর্ণ যে তাঁর অপর পাঁচ পুত্রকে বিদ্বেষ করেন এইটা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি মনে মনে বললেন "এই বৃথাদৃষ্টি, মোহানুবর্তী, বলসম্পন্ন, দুরাত্মা কর্ণ পাপাত্মা দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের দ্বেষ করে বলে আমার মন সব সময় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।" শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন যে তিনি নিজে কর্ণের কাছে গিয়ে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে পাণ্ডবদের প্রতি তার মন প্রসন্ন করবার চেষ্টা করবেন। তাঁর মনে একবারও এই ভাবনার উদয় হল না যে তাঁর বীর্যসম্পন্ন প্রথম পুত্র কর্ণও এই যুদ্ধে নিহত হতে পারেন। এই পরিত্যক্ত পুত্রের জন্যই তাঁর অন্তর বহু পূর্বে অস্ত্র পরীক্ষার সময় একবার হাহাকার করে উঠেছিল,—সেটা এই সময় স্মরণ করলে আশ্চর্য হতে হয়। এই নারী তাঁর কন্যাবস্থার সন্তানকে শেষ পর্যন্ত পথের কাঁটা বলেই মনে করে এসেছেন এবং সব স্নেহ উজাড় করে দিয়েছেন

তাঁর পরবর্তী পঞ্চ পুত্রের প্রতি। মাদ্রীসন্তানদেরও তিনি নিজ সন্তানের মত দেখতেন, কিন্তু কর্ণ তাঁর কাছে মিথ্যাদর্শী দুরাত্মা ছাড়া আর কিছুই ছিলেননা। তথাপি তাঁর মাতৃহৃদয় আর একবার হাহাকার করে উঠেছিল ; সেটি কর্ণের মৃত্যুর অনেক পরে। অপরাধ বোধ জিনিসটা এমনিই বটে ; প্রথম তার জন্য লজ্জা হয়, তারপর অন্তরটা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু, নিজেকে নিপীড়নেরও একটি সীমা আছে ; একদিন সে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে। কুন্তীর মধ্যে আমরা এই মনোভাবেরই পরিচয় পাই।

অনতিকালের মধ্যে একদিন অপরাহ্ণের কিছু পূর্বে কুন্তী নিভৃতে কর্ণের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কর্ণ নাকি তখন গঙ্গাতীরে পূর্ব মুখে বেদপাঠ করছিলেন। কুন্তীদেবী শেষ মধ্যাহ্ন সূর্যের তাপ সহ্য করতে না পেরে তাঁর পিছনে উত্তরীয়ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর জপের অবসান প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এই বিবরণ আমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়। কর্ণ সুতপুত্র বলে নিজেকে স্বীকার করে এসেছেন। অতএব বেদপাঠে তাঁর অধিকার ছিলনা। ক্ষত্রিয়দের পূজাপদ্ধতি তাঁর অনু-সরণ না করবারই কথা। প্রকৃত ঘটনা এরকম না ঘটাই সম্ভব। কুন্তী কর্ণের গৃহেই তাঁর সঙ্গে নিভৃতে যোগস্থাপন করেছিলেন,—এই অনুমানই সঙ্গত ; অথবা অন্যত্র কোথাও এই সাক্ষাৎ ঘটাও অসম্ভব ছিলনা। যাই হোক, কর্ণ তার প্রতি অভিবাদন জানিয়ে তাঁর আস-বার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কুন্তী প্রথমে তাঁর কাছে তাঁর জন্ম-বৃতান্ত গোচর করে বললেন যে কন্যাবস্থায় তিনি তাঁকে কুন্তীভোজের রাজভবনে প্রসব করেছিলেন। কিন্তু কে তাঁর পিতা সে কথা তিনি ব্যক্ত করলেননা। কর্ণ সূর্যের পুত্র এটি পৌরাণিক কাহিনী ; কুন্তী নিশ্চয়ই এই অলৌকিক কাহিনী বলেননি ; তিনি লজ্জায় তাঁর জন্ম-দাতার নাম উচ্চারণ করতে পারেননি, এইটাই বোধ হয় সত্যগোপনের মূল কারণ। কর্ণ ভাল করেই জানতেন যে তিনি কুন্তীর অবৈধ সন্তান, কেননা ঘটনাচক্রে সেটা তাঁর কাছে গোপন ছিলনা ; কোনও না কোনও সময় তিনি তাঁর নিজমাতাকে যে দেখেননি এমনও হতে পারে

না। তবে বহুকাল অদর্শনের পর তাঁকে হঠাৎ দেখবার পর না চেনাই সম্ভব। তিনি পুঞ্জীভূত ঘৃণায় নিজের আসল পিতৃপরিচয় জানতেও চাইলেননা। অতঃপর কুন্তী তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলতে লাগলেন— "বৎস, তুমি আমার গৃহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে মোহবশতঃ নিজের ভাইদের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন না করে এখন যে দুর্যোধনের সেবা করছ সেটা কি সমুচিত কাজ হচ্ছে? দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবেরা যুধিষ্ঠিরের রাজসম্পত্তি বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়েছে। এখন তুমি তাদের কাছ থেকে এই বিষয় গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আজ কর্ণার্জুনের মিলন সাধিত হোক এবং তোমরা একত্রিত হলে কোন কাজ সম্পন্ন না করতে পার? অতএব, এর পর থেকে তোমার সূত-পুত্র সজ্ঞা তিরোহিত হওয়াই উচিত।" কুন্তী যেভাবে কথাটা বললেন তাতেও স্পষ্টই বোঝা গেল যে কর্ণের কাছে এটি আদৌ গোপন ছিল-না যে তিনি কুন্তীর পুত্র। তিনি অবশ্য একটু বাঁকা পথে এসেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর নিজের ছেলে যদি তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় তাহলে তিনি বিদুরের মাধ্যমে আসল সত্য কৌরব সভার গোচর করবেন। তাই তিনি সর্বাগ্রে কর্ণের কাছেই ছুটে এসেছিলেন তাঁর মনোভাব অবধারণের জন্য। কর্ণ তাঁর গর্ভধারিণীর সবকথা যথোচিত সম্মান সহকারে শুনলেন; তারপর বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে বলতে লাগলেন,--"রাজমাতা,—আপনার বাক্যে আস্থা স্থাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ আপনি যা বলছেন সেরকম করলে আমার ধর্মহানি হবে। দেখুন, আপনার থেকেই আমার জাতিভ্রংশ ঘটেছে। আপনি আমাকে শৈশবে পরিত্যাগ করে নিতান্ত নিন্দনীয় এবং কীর্তিলোপকর কাজ করেছেন। আমি আপনার জন্যই যথার্থ পিতৃপরিচয় লাভ করে সংকার প্রাপ্ত হইনি। অতএব, আর কোন শত্রু আপনার চেয়ে বেশী আমার অপকার করবে? আপনি আগে কখনও মায়ের মত আমার হিতচেষ্টা করেননি; এখন আমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করতে এসেছেন নিজের হিতবাসনায়। আজ যদি আমি পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করি তাহলে লোকে আমাকে ভীতি-

গ্রস্ত বলে নিন্দা করবে। আমি যে পাণ্ডবদের ভাই সেটি জনসমাজে প্রচারিত হয়নি, যদি এই যুদ্ধকালে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিই, তাহলে ক্ষত্রিয়গণই বা আমাকে কি বলবেন? দুর্যোধন আমাকে সব রকম ভোগ্য প্রদান করছেন এবং আমার যথাবিহিত সৎকার করে আসছেন, আজ আমি কি করে সেই প্রযত্নকে বিফল করব? যাঁরা এই আগতপ্রায় যুদ্ধে একমাত্র আমার সহায়তাকেই অবলম্বন করে আছেন, তাঁদের আমি কিভাবে পরিত্যাগ করব? আমাকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। তবে, আমি আপনাকে একটা কথা দিতে পারি। আমি আপনার চারপুত্র,—যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে যুদ্ধে সংহার করবনা; কেবল অর্জুনের সঙ্গেই আমার যুদ্ধ হবে। তাতে হয় আমি তাকে নিহত করব, অথবা নিজে নিহত হয়ে বীরের মৃত্যুকে বরণ করব। অতএব, আপনার পঞ্চ পুত্রই শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকবে, আপনি আজীবন তাদের মাতা হয়ে থাকবেন।" কুন্তী কর্ণের অত্যন্ত ধীর অথচ দৃঢ় বাক্য শুনতে শুনতে দুঃখে লজ্জায় কাঁপতে লাগলেন। তারপরে তিনি পুত্রকে বুকে টেনে নিলেন। কিন্তু যত স্নেহই তিনি প্রকাশ করুননাকেন নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি বললেন,—"বৎস, তুমি যেভাবে কথাগুলি উচ্চারণ করলে তাতে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে যে কৌরবগণই বিনষ্ট হবে। আমার আর করবার কিছু নেই, দৈবই বলবান। কিন্তু, তুমি যে অর্জুন ভিন্ন আর চার ভাইকে মারবেনা, সে কথা যেন তোমার মনে থাকে।" কুন্তীও ধৃতরাষ্ট্রের মতই দৈবের উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে নিজের পলায়নপর মনোবৃত্তির সমর্থন খুঁজতে চাইলেন। তাঁর মাতৃ-হৃদয় এতবড় ঘটনাতেও নিঃস্বার্থ হলনা, কর্ণকে তিনি সেদিনও সর্ব-সমক্ষে নিজের পুত্র বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা বোধ করে ফিরে এলেন। কুন্তীর উক্তি থেকে একটা জিনিস এখানে স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনও নিম্নজাতির লোক তাঁর জন্মদাতা ছিলেননা; কর্ণের পালকপিতা সূত অধিরথের সঙ্গে কুন্তীর কোনও সম্পর্কও ঘটেনি। আসলে কর্ণকে সূত-গৃহে পাঠাবার এইটিই মূল হেতু বলে মনে হয় যে সেক্ষেত্রে কোনও

সন্দেহের উদয় হতনা এবং সূতপুত্র কর্ণকে কেউ কুন্তীর সঙ্গে যুক্ত করতেও পারতেননা। অধিরথ নিজেও যথেষ্ট গোপনতা অবলম্বন করেছিলেন। ইচ্ছে করলে তিনি কর্ণপ্রাপ্তির ঘটনাটি যথেষ্ট প্রচার করতে পারতেন। কিন্তু, এই পিতৃত্ব তিনি মেনে নিয়েছিলেন নেহাৎ অপুত্রতাজনিত স্নেহের বশেই এবং তাঁর পুত্র জন্মদোষে কলঙ্কিত হোক এটা তিনিও চাইতেন না।

পাণ্ডবেরা এতদিনে বিরাটনগর ছাড়াও বৃকস্থল বা উপপ্লব্য নগরে তাঁদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। কৃষ্ণ হস্তিনা থেকে এখানে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা নিবেদন করলেন। তিনি আরও জানালেন যে স্বল্পকাল হস্তিনায় থাকাকালে তিনি কৌরব ও তাঁদের অধীনস্থ রাজন্যবর্গের মধ্যে যাতে ভেদ উৎপাদন হয় তার বিশেষ চেষ্টা করে এসেছেন। এর পর যুদ্ধের আয়োজন ছাড়া আর কোনও পথই খোলা রইলনা। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেসব রাজা সসৈন্যে যোগ দিয়েছিলেন তার হিসাব করা হল। তবে সে যে সাত অক্ষৌহিণী নয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেকালকার ভৌগলিক পরিস্থিতিতে দূরদূরান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমবেত করা অসম্ভব ছিল, আর এত স্থানই বা কোথায়? যুদ্ধ নিশ্চিত ভাবেই কুরুমণ্ডল ও তৎসন্নিহিত দেশগুলির মধ্যেই ঘটেছিল। বাইরে থেকে এসেছিল কিছু যাদব সৈন্য। হয়তো কুরু বা পাণ্ডবদের আত্মীয় রাজগণের মধ্যে কেউ কেউ একাই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। সম্মিলিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একটি অলীক কল্পনা মাত্র। যুদ্ধ অনেক ছোটখাটো হয়েছিল,—যা কুরুক্ষেত্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে ঘিরে হওয়া সম্ভব। তাছাড়া, কৌরবগণ সেকালের তুলনায় বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন বটে, কিন্তু সেই সাম্রাজ্য আজকালকার দিনের মত সার্বিক আধিপত্য নিয়ে অর্জিত ছিলনা। তাঁদের সাক্ষাৎ অধীনস্থ দেশ ছিল মাত্র কয়েকটি; অপর দেশ থেকে তাঁরা কর পেতেন, কিন্তু তাঁদের উপর প্রত্যক্ষ শাসন প্রয়োগের অবসর তাঁদের ছিলনা। তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি স্বাধীন রাজা ছিলেন, কেবল

নামে মাত্র কৌরবদের সার্বভৌমিকত্ব স্বীকার করতেন। এই কারণেই এঁদের কাছে দূত পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবার জন্ম অনুরোধ জানানো হয়েছিল, বলপ্রয়োগের চেষ্টা হয়নি। এই ধরণের সাম্রাজ্য-স্থাপন আমাদের রোমান শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। রোমানরাও একটা বিরাট ভূভাগ অধিকার করেছিলেন, কিন্তু তার অধিকাংশেই স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল।

যুধিষ্ঠির তাঁর সম্মিলিত সেনার সাতজন নায়ক স্থির করেছিলেন। এঁরা হলেন—রাজা যজ্ঞসেন (দ্রুপদ), বিরাটরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও মগধপতি সহদেব। এঁদের মধ্যে প্রধান সেনাপতির ভার গ্রহণ করেছিলেন দ্রুপদ রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। তাঁরা কিছুকালের মধ্যেই সমস্ত সৈন্যদলসহ কুরুক্ষেত্রে এসে সমবেত হলেন। ওদিকে দুর্যোধন নাকি একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত করেছিলেন। এটাও খুবই বাড়ানো সংখ্যা সন্দেহ নেই। পুরাণে প্রকাশ, দুর্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং ভীষ্ম তাতে সম্মতি প্রদান করেছিলেন। এই ব্যাপারটাও সম্ভব বলে মনে হয় না; কারণ ভীষ্মের ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকাটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ঘটনা। শান্তনুর প্রথম সন্তান ভীষ্ম দুই প্রজন্মের পরেও যদিও বা বেঁচে থাকতেন, যুদ্ধের পক্ষে সর্বতোভাবে অনুপযোগী ছিলেন সন্দেহ নেই। ভীষ্ম তাঁর ভাই বিচিত্রবীর্যের চেয়ে বয়সে বেশ কিছু বড় তো ছিলেনই, এমনকি তাঁর বিমাতা সত্যবতীর চেয়ে অধিক বয়স্ক হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তার পরে জন্মালেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু;—তাঁদের ছেলেরা মানুষ হলেন এবং অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সেই তাঁরা তের বৎসর নির্বাসনে কাটিয়ে এলেন। এতদিনে ভীষ্মের বয়স শত বৎসর অতিক্রম করে কত হওয়া উচিত, সেটা আন্দাজের কথা; কিন্তু আর যাই হোক একজন মহাস্থবিরের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব সে বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ ঘটতে পারে না। আসলে ভীষ্মপর্ব,—পুরাণকারদের কল্পনা বলে মনে হয়। এটি তো আগাগোড়া

অলৌকিক বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ, যার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় শরশয্যা নামক উদ্ভট পরিকল্পনায়। ভীষ্ম ঠিক কোন সময় দেহত্যাগ করেন তা বলা সম্ভব নয়, কারণ মহাভারত তাঁকে দিয়ে অলৌকিক কার্যাবলী সাধনের জন্য তাঁর জীবনকে দীর্ঘাতিদীর্ঘ করে গেছেন।

দুর্যোধন সমস্ত সৈন্য একত্র করে কুরুক্ষেত্রে এসে সমবেত হলেন। যুদ্ধের যখন সব প্রস্তুত, উভয়পক্ষ শিবিরে অপেক্ষমান তখন পাণ্ডবদের স্কন্ধাবারে বলদেব এসে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি কৃষ্ণের ভূমিকায় খুশী হননি। সকলের সামনে তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন—"আমি দেখছি প্রচণ্ড লোকক্ষয় অনিবার্য। তবু তুমি অক্ষত শরীরে থাক, এই কামনা করি। আমি তোমাকে বারবার নিভৃতে বলেছি যে তুমি পাণ্ডব এবং কৌরব উভয় পক্ষের সঙ্গে সমান ব্যবহার কর, কারণ তারা দুই পক্ষই আমাদের প্রিয় পাত্র। কিন্তু, তুমি অর্জুনের প্রতি বিশেষ স্নেহের জন্য তাদের দিকে যেমন অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব করেছ তেমনি কৌরবগণের প্রতি একান্ত-ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেছ। আমি কৌরবদের এইভাবে বিনাশ ঘটানো কোনক্রমেই উপেক্ষা করতে পারবনা; অতএব আমি এখন সরস্বতীর তীরবর্তী তীর্থসমূহ পর্যটন করে বেড়াব মনস্থ করেছি; এখানে আর থাকার আমার ইচ্ছে নেই।" বলদেব চলে গেলেন; কিন্তু কেউ তাঁর কথায় বিশেষ কান দিলেন বলে মনে হল না। প্রকৃতপক্ষে বলদেব গোড়া থেকেই যাদব এবং বৃষ্ণিবংশীয় ব্যক্তিগণ এই বাদানুবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, তা পছন্দ করেননি। তাঁর মনোগত ইচ্ছা ছিল তাঁরা সকলে নিরপেক্ষ থাকুন। এই সিদ্ধান্ত খুবই সমীচীন ছিল; কিন্তু কৃষ্ণই তাঁর নিজের দায়িত্বে একটি বিরাট চক্রান্ত গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে ভারতযুদ্ধ সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল এবং পরিণামে কৌরবকুল বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। একমাত্র অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ ছাড়া তাঁদের আর কোনও বংশধর ছিলনা এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যে ক্ষুব্ধভাব যাদবগোষ্ঠির মধ্যে দেখা দিয়েছিল তার পরিণতিস্বরূপ কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র ছাড়া আর

সব পুরুষই ধ্বংস হয়ে গেলেন। এটি কৃষ্ণেরই প্রত্যক্ষ কর্মের ফল।
মহাভারতে অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখে আমরা বলদেবের যে পরিচয় পাই
তা অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। তিনি কোনও পর্যায়েই কৃষ্ণের ষড়যন্ত্র-
প্রবণতায় উৎসাহ প্রদান করেননি এবং অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই যদুবংশকে
কুরুপাণ্ডবের পারিবারিক বিরোধ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন।
কিন্তু, তাঁর প্রভাব কৃষ্ণের রাজনীতিকুশলতায় কিছুমাত্র কার্যকর
হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভগ্নোদ্যম অবস্থায় তিনি তাঁর সমগ্র বংশের ধ্বংস
পর্যবেক্ষণ করে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুকে আত্মোৎসর্গ
বলা চলে, আর কৃষ্ণের মৃত্যু একটি নিধন ছাড়া আর কিছু নয়।

উভয়পক্ষ কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী নদীর নিকট অবস্থান করতে
লাগলেন। দুর্যোধন সবদিক নির্ণয় করে শেষবারের মত শকুনিপুত্র
উলূককে পাণ্ডব শিবিরে পাঠালেন এই সংবাদ দিয়ে যে তাঁরা সর্বতো-
ভাবে প্রস্তুত ; সাহস এবং সামার্থ্য থাকে তো পাণ্ডবেরা এবার রণক্ষেত্রে
তার পরিচয় দিন। উলূক যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণের কাছে দুর্যোধনের
অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তাঁরা তাঁকে বলে দিলেন যে দুর্যোধনের
যেরূপ অভিপ্রায় সেইভাবেই তিনি অগ্রসর হতে পারেন। উলূক
ফিরে এসে দুর্যোধনকে সেইভাবে জানালেন। তখন রাজা দুর্যোধন
সমবেত সৈন্যদের এবং দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে আদেশ দিলেন
যে পরদিন প্রভাতেই তাঁরা যেন সুসজ্জিত হয়ে অবস্থান করেন।
কর্ণ ই এই সময় প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন এবং দূতগণ
কর্ণের আদেশক্রমেই রথে উঠে বা উষ্ট্র এবং ঘোটকে আরোহণ করে
সেনাদের কাছে উপস্থিত হয়ে রাজগণকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই সুসজ্জিত
হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়ে এলেন।

দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্ধে শিবির স্থাপন করেছিলেন এবং
যুধিষ্ঠির তাঁর শিবিরে স্থাপন করেছিলেন সমন্তক তীর্থের বাইরে।
পরদিন সকালবেলা এই সব শিবির থেকে উভয়পক্ষের যোদ্ধারা এসে
কুরুক্ষেত্রের বহুবিস্তৃত মণ্ডলাকার রণক্ষেত্রে সমবেত হলেন। যুদ্ধ
আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বক্ষণে যুধিষ্ঠির ঘোষণা করলেন—"যিনি আমাদের

হিতসাধনে বাসনা করেন তিনি আমাদের পক্ষে চলে আসুন, তাঁকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব।" এই ঘোষণা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র বৈশ্যার গর্ভজাত যুযুৎসু কৌরবপক্ষ পরিত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে এসে যোগ দিলেন। এর পরেই সেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

তথাকথিত ভীষ্ম পর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পাণ্ডবপক্ষে বেশ কিছু ক্ষতিসাধন হয় এবং তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই এই যুদ্ধে বিনষ্ট হন। কৌরবদের পক্ষেও ক্ষতিসাধন কম হয়নি। অবশেষে ভীষ্ম তথাকথিত শরশয্যা গ্রহণ করেন। দশদিনের যুদ্ধের পর এই পর্বের যবনিকাপাত ঘটে।

দ্রোণপর্বও ভীষ্মপর্বেরই অনুরূপ। এর সূচনাতেও কর্ণকে নায়কত্ব গ্রহণ করতে দেখা যায়। যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হলে তিনি রাজন্য-বর্গকে আহ্বান করে বললেন,—"রাজগণ, এখন কুরুসেনাদের পরিপালন করবার ভার আমার উপর পড়েছে, আমি সেই কর্তব্য পালন করব।" দুর্যোধন কর্ণের এই উৎসাহে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, —"সেনাপতি না থাকলে সেনাগণ কর্ণধারহীন নৌকার মত অথবা সারথিহীন রথের মত যথেচ্ছ গমন করে, তুমি এবার যাঁকে সেনাপতিপদের উপযুক্ত বোধ করবে, আমরা সকলে তাঁকেই সেনাপতি নিযুক্ত করব।" কর্ণ তখন বললেন—"সব দিক বিবেচনা করে আচার্য স্থবির দ্রোণকেই সেনাপতি করা কর্তব্য। আপনি তাঁকেই শীঘ্র সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করুন।" অতঃপর দ্রোণাচার্য সেনাপতির ভার গ্রহণ করলেন। এক্ষেত্রেও কর্ণের মহানুভবতা প্রকাশ পেয়েছে। দ্রোণ কিন্তু যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই কর্ণ সম্বন্ধে কটূক্তি করেছেন এবং কর্ণও তাঁকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না; তথাপি সজ্জন-সম্মত রীতি অনুসরণ করে তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের প্রতি সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করলেন না। তবে, দুর্যোধন ও কর্ণ নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন।

এই পর্বে অভিমন্যুবধই প্রধান ঘটনা। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যুধিষ্ঠিরের হঠকারিতায় এই বালকটিকে প্রাণ দিতে হল। যখন পাণ্ডব-

পক্ষীয় বীরগণ অর্জুনের অবর্তমানে কৌরবদের চক্রব্যূহে ভেদ করতে পারলেননা, তখন এত বীর থাকতে হঠাৎ যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর ওপর এই দুর্বহ ভার সমর্পণ করে বললেন,—"বৎস, আমরা কিভাবে চক্রব্যূহ ভেদ করব কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছি না, এখন অর্জুন যাতে এসে আমাদের নিন্দা না করে তুমি সেরকম অনুষ্ঠান কর।" অভিমন্যু জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের আদেশে অকুতোভয়ে চক্রব্যূহ বিদীর্ণ করে অনেকখানি অগ্রসর হলেন। কিন্তু অপরাপর পাণ্ডবগণ তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর কাছে পৌঁছোতেই পারলেননা। তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন জয়দ্রথ। অভিমন্যু একলা পড়ে গেলেন এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করে চললেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মাহুতি দিতে হল। পুরাণ বলছেন তাঁকে সপ্তরথী বেষ্টন করে অন্যায়ভাবে মেরেছিলেন; কিন্তু এর সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অসম সাহসী এক বালক একা শত্রু বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে নিঃসহায় হয়ে গিয়েছিলেন; তাঁর মৃত্যুর জন্য এইটাই যথেষ্ট, সাতজন বীরের সহায়তা আবশ্যক না হবারই কথা। তা ছাড়া ব্যূহের ভিতরে সঙ্কুল যুদ্ধে সাতজন বীরের একত্র সমাবেশ মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা বা অনুচিত সমাবেশ নয়। এর সমস্ত দায়িত্বই যুধিষ্ঠিরের; তাঁর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্যই অভিমন্যুর মত বীর পাণ্ডবসন্তানকে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল। অর্জুন পরে জয়দ্রথকে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু সে কাজটি করতে তাঁকে মর্মান্তিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। এই যুদ্ধে পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের ভূমিকা অতিশয় অকিঞ্চিতকর। তিনি নামেই সেনাপতি ছিলেন; কোনরকম বুদ্ধির পরিচয়ই তিনি সৈন্য পরিচালনায় দিতে পারেননি। অভিমন্যু যখন চক্রব্যূহ ভেদ করেন তখন তাঁর কোনও ভূমিকাই দেখা যায়নি এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও এই বিপদের মুহূর্তে যুদ্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠির যে কেন এগিয়ে এলেন সেটি হৃদয়ঙ্গম করাও দুঃসাধ্য। এই ব্যাপারে অভিমন্যুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, সেটি একেবারেই অবিশ্বাস্য। তথাকথিত দ্রোণের হননকার্যও অতি জঘন্য মিথ্যাচারের নিদর্শন। এখানেও সেই কাপুরুষোচিত

ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিলেন যুধিষ্ঠির এবং সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করা ছাড়া আর কোনও কর্তব্য পালন করেননি। সেনাপতিরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের এই কাজটি একটি নিকৃষ্ট অপকর্মের নিদর্শন। দ্রোণকে তিনি যুদ্ধে বধ করেননি, দস্যুর মত হত্যা করেছিলেন বললেই চলে। দ্রোণাচার্যের তথাকথিত নিধনের পর কৌরব সৈন্যদের বিপর্যয় নিবারণ করতে এগিয়ে এলেন রাজা দুর্যোধন। তিনি বাকি দিনটা বিশেষ পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে সন্ধ্যাকালে অবসর গ্রহণ করলেন।

ছয়

এবারে সর্বসম্মতিক্রমেই কর্ণকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা হল। দ্রোণবধের পরদিন প্রত্যূষে অভিষেক সমাধা হলে কর্ণ মকরব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অপর পক্ষে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে তদীয় সেনাবাহিনীকে শ্রেণীবদ্ধ করবার জন্য আদেশ করলেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে প্রধান সেনানায়ক ধৃষ্টদ্যুম্নের কোনও ভূমিকা নেই। অর্জুন অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ব্যূহের বামভাগে রইলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাঝখানে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন, অপর পৃষ্ঠদেশ রক্ষার ভার নিলেন নকুল ও সহদেব। কুরুক্ষেত্রে যেসব যুদ্ধ হয়েছিল তাতে সঙ্কুল যুদ্ধই বেশী; সম্মুখ সমর সেই তুলনায় কমই হয়েছিল এবং এই সব মিলিত যুদ্ধে কখনও পাণ্ডব কখনও কৌরববাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। কর্ণপর্বেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রবল যুদ্ধের পর একটি দিন অতিবাহিত হল। কর্ণ সঙ্কল্প করলেন যে তাঁর সেনাপতিত্বের দ্বিতীয় দিনে তিনি অবশ্যই অর্জুনকে সংহার করবেন। এ পর্যন্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে যোগ্যতর সারথির অভাবে তিনি তাঁর ক্ষমতার অনুযায়ী যুদ্ধ করতে পারছেন না; অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হলে তাঁকে কৃষ্ণের অনুরূপ সারথ্যকর্মে

অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা লাভ করা দরকার। অতএব, তিনি রাজা দুর্যোধনকে বললেন,—"মহারাজ, আমি আজ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাসনা করি ; কিন্তু মদ্ররাজ শল্যকে আমার সারথি হতে হবে। শল্য অশ্ববিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞ, তিনি আমার সারথি হলে আমার অনেক বেশী সমৃদ্ধি হবে।" দুর্যোধন তখন বিনীতভাবে মহারাজ শল্যের সারথ্য প্রার্থনা করলেন। শল্য প্রথমটা ক্রোধ দেখালেও পরে রাজি হলেন। এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর ষড়যন্ত্র আগে থেকেই পাকা ছিল। এক কথায় রাজি হলে দুর্যোধনের হয়তো সন্দেহ হত ; তাই তিনি একটু অনিচ্ছার ভান করে এমনভাব দেখালেন যেন দুর্যোধনের পীড়াপীড়িতেই তিনি সারথ্যের প্রস্তাবে স্বীকৃত হচ্ছেন। এখানেও সেনাপতির ক্ষমতা সেকালে যে অত্যন্ত সীমিত ছিল, সেটাই ধারণা হয়। কর্ণ সেনাপতি হিসাবে কৌরব সেনামণ্ডলের সর্বাধিনায়করূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন ; শল্যকে তিনি যে আদেশ করবেন সেটাই তাঁর পালন করবার কথা, কারণ কৌরব সেনাপতির সারথ্যকর্ম গাড়োয়ানি নয়। অশ্ববিশেষজ্ঞ হিসাবে সেটা একটা সম্মানজনক নিয়োগ বলে গণ্য করা উচিত ছিল ; কিন্তু কর্ণ তাঁকে এই প্রস্তাব দিতে দ্বিধা করলেন এবং কুরুসম্রাটের ক্ষমতা প্রয়োগ করে দুর্যোধনকে এই প্রস্তাব (তাও আদেশ নয়) করতে হল। এই সব ব্যাপারে বোঝা যায় যুদ্ধের সময় "ডিসিপ্লিন" বলে বস্তুটা তখন ছিল অন্যরকম এবং এই সব কারণেই নানাভাবে বিপর্যয় ঘটত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সেনাপতিদের ক্ষমতার অভাব থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। শল্য দুর্যোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ; কিন্তু তিনি একটি নিয়ম করে নিলেন যে যুদ্ধকালে তাঁর নিজস্ব মতামত তিনি নিঃসংকোচে ব্যক্ত করবেন ; কারণ তিনি মদ্ররাজ, হীন সারথিকুলসম্ভূত নন। তাঁর প্রাপ্য সম্মান, তাঁকে দিতে হবে।

কর্ণ শল্যকে সারথ্যকর্মে নিযুক্ত করে যথোপযুক্ত আয়ুধাদি নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে শল্য প্রথম থেকেই কর্ণের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন। তিনি গোড়াতেই অর্জুনের একদফা প্রশংসা

করে কর্ণকে উত্তেজিত করে তুললেন যাতে যুদ্ধ থেকে তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সেদিন অর্জুন গোড়া থেকেই অপরাপর কৌরববাহিনীর সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাই তাঁকে কর্ণের কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া যচ্ছিলনা। তখন কর্ণ ঘোষণা করলেন,— যিনি মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখিয়ে দিতে পারবেন তাঁকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, কর্ণ ঘোষণা করবার সময় "মহাত্মা ধনঞ্জয়" উচ্চারণ করেছিলেন; কিন্তু পাণ্ডবগণের কেউ হলে তাঁকে "সূতপুত্র কর্ণ" ছাড়া আর কিছু বলে নির্দেশ করতেন না। শল্য তাঁকে উপহাস করেই চললেন এবং তাঁর বাক্যসমূহ অসহনীয় হওয়ায় কর্ণও তাঁকে এবং সমগ্র মদ্রদেশের কুসংস্কারগুলিকে কটুভাষায় নিন্দা করে সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করে লাগলেন। কিন্তু শল্যের ইচ্ছাকৃত কটূক্তিগুলি কর্ণের চিত্তকে যুদ্ধের একাগ্রতা থেকে বিচ্যুত করতে লাগল এবং শল্য কার্যসিদ্ধি হচ্ছে ভেবে উৎসাহিত বোধ করতে লাগলেন।

এই বাদানুবাদ সত্ত্বেও শল্য, রথ চালনা করতে লাগলেন এবং কর্ণ পাণ্ডবদের ব্যূহের সম্মুখীন হলেন। কর্ণ আবার নতুন করে ব্যূহ সাজিয়ে নিলেন। কৌরবদের সৈন্যসমাবেশ দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন,—"তুমি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আমরা অন্যত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছি।" অর্জুন তাঁর আজ্ঞা পালন করে শত্রুব্যূহের দিকে ধাবমান হলেন; কিন্তু সংশপ্তকগণ প্রতিরোধ করে তাঁকে সমাবৃত করে ফেললেন। এদিকে কর্ণ পাণ্ডবপক্ষকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে উৎপীড়িত করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যুধিষ্ঠির শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন; কিন্তু কর্ণ কুন্তীর বাক্য স্মরণ করে তাঁকে হত্যা করলেন না। বস্তুতঃ এই যুদ্ধে কর্ণের হাতে যুধিষ্ঠিরের মত লাঞ্ছিত কেউ হননি; তিনি বারবার পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁকে রক্ষা করতে পাণ্ডব সেনানায়কদের ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল। দিবসের দুইভাগ যখন গত হয়েছে, অপরাহ্ণ প্রায় সমাগত, তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন

যে তিনি যুধিষ্ঠিরের রথের ধ্বজদণ্ড দেখতে পাচ্ছেননা এবং তাঁর জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণ তখন যেদিকে যুধিষ্ঠির ছিলেন সেদিকে রথ চালিয়ে দিলেন। এই সময়ের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের বারবার বিপদ ঘনিয়ে উঠছিল। অবশেষে শল্য কৌশল করে কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি বললেন,—"কর্ণ, আজ তোমাকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে; তাহলে অকারণ ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছ কেন? এতে অনর্থক তোমার পরাক্রম বিনষ্ট হচ্ছে। তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সমস্ত বল সংহত কর।" কর্ণ এই কথা শুনে সেদিক থেকে ক্রমশঃ সরে এলেন। কৃষ্ণ ঠিক একই কৌশল অবলম্বন করলেন। যখন তিনি দেখলেন যে অর্জুন ক্রমেই ঘোরতর যুদ্ধে শ্রান্ত হয়ে পড়ছেন তখন তিনি বললেন,—"পার্থ, রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, তুমি আগে তাঁকে আশ্বাস প্রদান করে এসো, পরে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোয়ো।" কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে খুঁজে পাওয়া সহজ হলনা, কারণ তিনি আদৌ যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেননা। অনেক অন্বেষণের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর স্কন্ধাবারে তাঁর শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখা গেল। যুধিষ্ঠির সেই অসময়ে অর্জুনকে আসতে দেখে মনে করলেন অর্জুন তাঁর প্রবলতম প্রতিপক্ষ কর্ণকে যুদ্ধে নিহত করে সেই শুভ সংবাদ তাঁকে দিতে এসেছেন। এই অনুমানের একটা কারণ ছিল। যুধিষ্ঠিরের স্মরণ ছিল যে তিনি গোড়াতেই অর্জুনকে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হতে আদেশ করে-ছিলেন। তারপর কর্ণের হাতে তাঁর নিজের চূড়ান্ত লাঞ্ছনার সংবাদ পেয়ে অর্জুন তাঁকে বধ করে এসেছেন, এমনি একটা ধারণাই তিনি করে বসলেন। অতএব, যুদ্ধে বারম্বার তাঁর পরাজয়ের উল্লেখ করে কর্ণ কিভাবে নিহত হলেন সেকথা তিনি আগ্রহভরে জানতে চাইলেন। অর্জুনকে তাঁকে জানলেন যে তিনি অন্যত্র নানাভাবে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার সুযোগ পাননি; যুধিষ্ঠির কেমন আছেন, সেটি জানবার জন্যই ছুটে এসেছেন। এখন

যুধিষ্ঠিরকে সুস্থ দেখে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মনস্থ করেছেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে অর্জুনকে প্রচণ্ড তিরস্কার করে বললেন যে তিনি একান্তই অপদার্থ, নতুবা কর্ণকে হত্যা না করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন না। এই তিরস্কার এতই অপ্রত্যাশিত এবং অসঙ্গত যে অর্জুন অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট হয়ে খড়্গ তুলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে উদ্যত হলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি তাঁকে নিবৃত্ত করলেন ; তা নইলে সেদিন এমন একটা কাণ্ড ঘটে যেত যাতে মহাভারতের বিবরণ অন্যরকম দাঁড়িয়ে যেত। কৃষ্ণ তাঁকে অনেক বোঝালেন যে ধর্মরাজ নিরন্তর কর্ণের উৎপীড়নে ক্ষতবিক্ষত হয়েই এরকম উত্তেজনাপূর্ণ কটূবাক্য প্রয়োগ করেছেন। অবস্থাবিপর্যয়ে জেষ্ঠভ্রাতাকে তাঁর ক্ষমা করাই কর্তব্য। অর্জুন তখন খড়্গ নামিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে আরও কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বললেন—"মহারাজ, আমার অন্য ভাইরা, যাঁরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করছেন তাঁরা আমাকে হয়তো কিছু বলতে পারেন, কিন্তু আপনি সর্বদা সুরক্ষিত হয়ে থাকেন ; যুদ্ধ আপনাকে করতে হয়না বললেই চলে। আমি স্ত্রীপুত্র, শরীর এবং জীবন পর্যন্ত পণ রেখে আপনার হিতার্থে যত্নবান রয়েছি আর আপনি আমাকে এমন নৃশংস বাক্যবাণে নিপীড়িত করছেন। আমি আপনার জন্য অপরাজেয় মহারথীদের অতি কষ্টে নিহত করছি আর আপনি দ্রৌপদীর শয্যায় শুয়ে শুয়ে আমাকে অপমান করছেন ; আপনি নিতান্ত নিষ্ঠুর। আপনার কাছে থেকে আমি কোনক্রমেই সুখী হতে পারিনা। আপনার জন্যই আমাদের রাজ্যনাশ ও যারপরনাই দুঃখ উপস্থিত হয়েছে। অতএব, আমি আর কঠোর বাক্যে ব্যথিত হতে চাইনা।" এই বলে রাগে, লজ্জায়, তিনি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁকে আবার নিবৃত্ত করলেন। যুধিষ্ঠির ভীষণ লজ্জিত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন,—"সত্যিই আমার জন্যই তোমাদের এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে। আমি আর রাজ্য চাইনা। ভবিষ্যতে রাজ্য অর্জিত হলে ভীমসেনই তা গ্রহণ করুক। আমি এখনই বনবাসে চলে যাচ্ছি।" তখন কৃষ্ণ তাঁকেও প্রভূত সান্ত্বনা প্রদান করে

বনগমন থেকে নিরস্ত করলেন। অবশেষে অনুতপ্ত যুধিষ্ঠির অর্জুনের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এবং ব্যাপারটা কৃষ্ণের হস্তক্ষেপে মিটে গেল।

এবারে আবার নবোদ্যমে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন হল। কৃষ্ণসারথি দারুক নিজে অর্জুনের রথে অশ্বসমূহ যোজনা করে দিলেন। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রথচালনা করতে আরম্ভ করলেন। এর মধ্যে কর্ণের প্রিয় পুত্র সুষেন যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। শোকটা রণক্লান্ত কর্ণের চিত্তে প্রবলভাব আঘাত করে তাঁকে অনেকখানি দুর্বল করে দিল। এর পরেই ভীমসেন গদার আঘাতে দুঃশাসনকে রথ থেকে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে দিলেন; তারপর তরবারি দিয়ে তাঁর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে হত্যা করলেন। তবে তিনি যে দুঃশাসনের রক্ত পান করেননি, এটা দৃঢ়তার সঙ্গেই অনুমান করা যায়, কারণ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি সবই সন্দেহের ব্যাপার এবং পৌরাণিক কল্পনা হবারই সম্ভবনা, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। পুরাণকার অবশ্য ভীমকর্তৃক দুঃশাসনের এই অমানুষিক রক্তপানের কাহিনী বেশ ফলাও করেই বর্ণনা করেছেন এবং এই কার্যটি অর্জুন ও বাসুদেবের সমক্ষেই ঘটানো হয়েছিল। অতঃপর অর্জুন শরপ্রয়োগে কর্ণের এক পুত্র বৃষসেনকে বধ করলেন। চোখের ওপর দুটি পুত্রের ধ্বংস দেখে কর্ণ যৎপরোনাস্তি কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁর এবার মনে হল, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই বোধ হয় ভাল। তিনি আর অপেক্ষা না করে তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধকে বরণ করবার জন্য অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। অর্জুনও এগিয়ে আসছিলেন। সম্মুখেই তাঁকে দেখতে পেয়ে সদ্য পুত্রশোকাতুর কর্ণ চোখের জল মুছে ফেলে "রোষতাম্র" নেত্রে তাঁকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করলেন। প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। এই সময় কৃষ্ণ কর্ণসারথি শল্যের দিকে চেয়ে কটাক্ষপাত করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য স্পষ্টই বোঝা যায়; সেটি হচ্ছে শল্যকে পূর্বপ্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। শল্য মনের ভাব চেপে রেখে অপর পক্ষের দিকে

কটাক্ষপাত করলেন। কর্ণ সেসব ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলেননা। তিনি শল্যকে বললেন,—"আজ যদি অর্জুন আমাকে বিনষ্ট করেন তাহলে আপনি কি করবেন?" তখন শল্য কপটতা সহকারে উত্তর দিলেন—"তাহলে আমি একলাই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে বিনাশ করব।" বোধ হয় এই আস্ফালন বাক্য অর্জুনের শ্রুতিগোচর হয়েছিল। তিনিও কৃষ্ণকে ঠিক সেইভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন,—"বাসুদেব, আজ যদি কর্ণ আমাকে নিহত করে তাহলে তুমি কি করবে?" কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন,—"কর্ণ তোমাকে বিনাশ করতে পারবেনা; তবু যদি শেষ-পর্যন্ত এনন অভাবনীয় ঘটনা ঘটে, তাহলে আমি কর্ণ আর শল্য, দুই-জনকে শুধু হাতে বিনাশ করব।"

সমগ্র মহাকাব্যে শল্যের বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা মেলা ভার। ইনি আগে থেকেই যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন যে যদি কর্ণ তাঁকে সারথ্যকর্মে নিযুক্ত করেন তাহলে তিনি তাঁর বল হ্রাস করবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হবার আগে স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য শেষবারের মত কর্ণকেও পাণ্ডবের পক্ষে আসতে অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু কর্ণ সেই প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কর্ণের প্রতি অনেকেই ঈর্ষা পোষণ করতেন; কিন্তু শল্যের মত জঘন্য মনোবৃত্তি আর কারুর মধ্যেই ছিলনা। তিনি যেভাবে কর্ণের বিনাশ ঘটিয়ে-ছিলেন তা অতি সাঙ্ঘাতিক নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। মহাভারতের একটি মহাকলঙ্কিত চরিত্র হচ্ছে এই মদ্ররাজ শল্য, অর্থাৎ নকুল-সহদেব, তথা পাণ্ডবদের মাতুল। কেন যে তিনি কর্ণের প্রতি এতখানি বিদ্বেষযুক্ত ছিলেন বলা শক্ত, কারণ কর্ণ কখনও তাঁর কোনও প্রতিকূলতা করেননি। তবে, যত শীঘ্র কর্ণের বধসাধন হবে, তত তাড়াতাড়ি তিনি সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হবেন,—এইরকম একটা ধারণার বশবর্তী তিনি হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু সেনাপতি হবার ফলে নিজের পরিণাম সম্বন্ধে তিনি বোধ হয় ধারণা করতে পারেননি। যদি জানতেন তাহলে বোধ হয় যুধিষ্ঠিরকে এত

প্রশ্রয় দিতেননা।

অর্জুন যখন কর্ণের প্রতি ধাবমান হলেন তখন কৌরবপক্ষ তাঁকে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করল। একক যুদ্ধের সঙ্গে একটা সঙ্কুল যুদ্ধও চলতে লাগল। সর্বনাশের আর দেরি নেই দেখে শেষবারের মত অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বললেন,—"মহারাজ, এখনও ক্ষান্ত হও, আর পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধে প্রয়োজন নেই। যে যুদ্ধে এমনভাবে আত্মীয় স্বজন বিনষ্ট হয়ে যায় সে যুদ্ধকে ধিক্। আমি যদি নিবারণ করি তাহলে অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবে এবং কৃষ্ণও আর বিরোধে অংশ গ্রহণ করবেননা। এখন তুমি যদি স্ব-ইচ্ছায় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর তাহলে প্রজাদের সকলের মঙ্গল হয়। অতএব, আমার অনুরোধ, তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। যদি তুমি আমার কথায় কান না দাও তাহলে আমি নিশ্চয় বলছি যে তুমিও এই যুদ্ধে নিহত হবে। তুমি আমাকে সম্মান প্রদান করে থাক, তাই শেষবারের মত এই প্রার্থনা করছি যে সন্ধিদ্বারা তোমরা সবাই মিলিত হও যাতে হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ বিনষ্ট না হন।" দুর্যোধন ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর অন্তরমথিত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"সখা, আপনার প্রস্তাবে হিতকারী এবিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমি যা বলছি তাও একবার শুনুন। ভীম যেভাবে দুঃশাসনকে নিহত করেছে, তা দুঃস্বপ্নের মত আমার চোখে ভাসছে; আমি কিভাবে তাদের সঙ্গে সন্ধি করব? এতদিন ধরে আমাদের মধ্যে বৈরতা চলে আসছে। সেই সমুদয় স্মরণ করে তারা কখনও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হবেনা। বিশেষতঃ এই সময় কর্ণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা আমাদের কর্তব্য হবেনা। গুরুপুত্র, আমার এখনও বিশ্বাস কর্ণ অর্জুনকে বধ করতে সমর্থ হবেন।" এই কথা বলে তিনি আবার সৈন্যদের যুদ্ধে উৎসাহিত করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা আর কোন কথা বলতে পারলেননা। আশ্চর্যের বিষয়, এই শান্ত স্বভাব এবং শান্তিকামী অশ্বত্থামা মাত্র অল্পদিন পরেই ঘটনাচক্রে মানসিক স্থৈর্য হারিয়েছিলেন এবং যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিলেন দুর্যোধনও তা পরিকল্পনা করতে পারতেননা। স্থান, কাল, পাত্র

হিসাবে সব চরিত্রই দুর্জ্ঞেয়ভাবে পরির্বর্তিত হয়; তাকে রোধ করতে পারা যায়না।

ব্যাপারটা তখন এইরকম দাঁড়ালো যে পাণ্ডবপক্ষের বাছা বাছা সৈন্যেরা সবাই অর্জুনকে রক্ষা করতে লাগল এবং উৎসাহ দিয়ে কর্ণকে বধ করবার জন্য প্ররোচিত করতে লাগল। কৌরবপক্ষেও কর্ণকে ঘিরে এই ঘটনাই ঘটতে লাগল। উভয়েই যে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন তাই নয় কৃষ্ণ এবং শল্যও অক্ষত রইলেননা। এই সময় কর্ণ একটি শর যোজনা করলেন যা নিশ্চিতভাবেই রণক্লান্ত অর্জুনকে বিনাশ করত। বিশ্বাসঘাতক শল্য এই শরযোজনা দেখে কর্ণকে বললেন—"কর্ণ, এই শর অর্জুনের গ্রীবাচ্ছেদনে সমর্থ হবেনা, তুমি আরও উৎকৃষ্টতব অন্য শর যোজনা কর। কর্ণ রুষ্ট হয়ে উত্তর দিলেন—"শল্য, কর্ণ কখনই এক শর সন্ধান করে তা পরিত্যাগ করেনা! আমি কখনই কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইনা।" কর্ণ সেই শরটি নিক্ষেপ করলেন। তখন অর্জুনের আসন্ন মৃত্যু দেখতে পেয়ে সারথি কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ থেকে নেমে পা দিয়ে রথের চাকা এমনভাবে বসিয়ে দিলেন যে অর্জুনের দেহ খানিকটা নেমে গেল এবং কর্ণের বাণ অর্জুনের শিরস্ত্রাণের ওপর পড়ে তাকে চূর্ণ করে ফেলল।

এই ঘটনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে কর্ণ এবং অর্জুন যেখানে যুদ্ধ করছিলেন সেখানকার মাটি খুব নরম ছিল, ইচ্ছে করলেই রথের চাকা মাটিতে প্রোথিত করে দেওয়া যেতে পারত এবং সেটা নির্ভর করত সারথির বুদ্ধিমত্তার ওপর। এটি প্রকারান্তরে শল্যের প্রতি একটা ইঙ্গিত দাঁড়ালো, যাতে তিনি এইভাবে রথচক্র মাটিতে নিমগ্ন করে কর্ণের ক্ষতিসাধন করতে পারেন। এর অব্যবহৃত পরে দেখা গেল কর্ণের রথচক্রও মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে এবং তা এমভাবেই বসে যাচ্ছে যে রথে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কর্ণ মাটিতে নেমে যুদ্ধ করতে পারতেন কিন্তু তাতে প্রবলভাবে যুদ্ধ করা যেতনা। সেকালে যুদ্ধের রথ এমনভাবে প্রস্তুত হত যে রথে দাঁড়িয়ে বাণ নির্বাচন এবং সংযোজন খুব সহজে সম্ভব হত; মাটিতে দাঁড়িয়ে অপর রথীর

সঙ্গে কিছুতেই যুদ্ধ করা যেতনা। কর্ণ এই রথচক্রগ্রাসের কারণ বির্ণয় করতে পারলেননা। তিনি রথ থেকে নেমে দুহাতে চাকা ওঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই তা করতে পারলেননা; কারণ তিনি অতিমাত্রায় পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। পুরাণকার এই সময় শল্যের কোনও উল্লেখই করেননি; অথচ এই কাজটা সারথিরই করা উচিত ছিল। দুর্যোধন হয়তো বা সাময়িকভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন নতুবা তিনি শল্যকে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ জানাতেন। আসলে বিশ্বাসহন্তা শল্য নিজেই এইটি ঘটিয়েছিলেন। তিনি রথচালনা করে তাকে এমন একটা নরম জায়গায় এনেছিলেন যেখানে রথের চাকা প্রোথিত হয়ে গেলে তাকে তোলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তবে, তিনি যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যাতে কর্ণ তাঁর কাজটা আদৌ টের না পান। কৃষ্ণ যে উপায়ে অর্জুনের রথের চাকা বসিয়ে দিয়েছিলেন শল্যও সেই নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। পুরানকার যে ব্রাহ্মণের অভিশাপে রথচক্র ভূমিতে নিমগ্ন হয়েছিল, —এই ধরনের কথা বলেছেন তা একান্তই গল্পকথা; আসলে এটা সমস্তই শল্যের কারসাজি। তাঁর জঘন্য চক্রান্তেই এইটা ঘটেছিল।

অবশেষে কর্ণ অর্জুনকে ডেকে বললেন,—"পার্থ, তুমি মুহূর্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি ভূমিতল থেকে চথচক্র উদ্ধার করছি। দৈববশতঃ আমার রথের চাকা পৃথিবীতে প্রোথিত হয়েছে; এই সময় কাপুরুষোচিতভাবে আমাকে আক্রমণ কোরো না। আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি রথের ওপরে অবস্থান করছ, অতএব যে পর্যন্ত আমি রথচক্র উদ্ধার করতে না পারি সে পর্যন্ত আমাকে বিনাশ করা তোমার কর্তব্য নয়।" অর্জুন হয়ত এই অনুরোধে সম্মত হতেন; কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে কর্ণকে বললেন—"কর্ণ, তুমি এখন ধর্মকথা শোনাচ্ছ, কিন্তু দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে সভায় টেনে নিয়ে এসেছিল তখন তোমার নীতিজ্ঞান কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্যোধন তোমার মতানুযায়ী ভীমসেনকে বিষ প্রদান করেছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবতে জতুগৃহমধ্যে

প্রসুপ্ত অবস্থায় পাণ্ডবদের দগ্ধ করবার জন্য অগ্নি প্রদান করেছিলে তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল; যখন মহারথগণকে সমবেত করে অভিমন্যুকে বিনষ্ট করেছিলে তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এখন সে সবের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে; তোমার আর রক্ষা নেই।" কৃষ্ণের এইসব উক্তির কোনটাই যুক্তি গ্রাহ্য নয় এবং কৃষ্ণও আদৌ এই সব কথা বলেছিলেন কিনা সন্দেহ। এগুলি পুরাণকারদের প্রক্ষেপ বলে মনে হয়। কৃষ্ণ সম্ভবতঃ অর্জুনকে কর্ণের প্রস্তাব উপেক্ষা করে তাঁকে হত্যা করতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণের পক্ষে এই ধরনের উক্তি সন্দেহজনক; কারণ দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর অবমাননা কতখানি সত্য সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অক্ষক্রীড়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধৃতরাষ্ট্র এবং শকুনির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, এতে কর্ণের কোনও প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিলনা। ভীমসেনকে যখন বিষ প্রদান করা হয় তখন কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনদের সহযোগিতা কতটুকু ছিল? আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ। জতুগৃহ দাহের ষড়যন্ত্রও অনেক ওপর মহল থেকে হয়েছিল, কর্ণ তখনও প্রভাবসম্পন্ন হননি। অভিমন্যুর নিধন সম্পূর্ণ যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে হয়েছিল। অভিমন্যু স্ব-ইচ্ছায় ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে সঙ্কুলযুদ্ধ চলেছিল। সকলেই সেই যুদ্ধে রত ছিলেন, এক্ষেত্রে তিনি যদি সম্মিলিতভাবে বাধা পান তাতে অভিযোগ করবার কিছু নেই। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব প্রভৃতি যদি তাঁর পৃষ্ঠরক্ষায় সমর্থ হতেন তাহলে এপ্রশ্ন আদৌ উঠতনা। কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের একক যুদ্ধেও তো দেখা গেল অপরাপর যোদ্ধারাও একযোগে উভয়কে আক্রমণ করে চলেছেন। কর্ণ যখনই দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়েছেন তখনই সম্মুখ যুদ্ধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন; তিনি একা কোনও হীনচক্রের কথা উত্থাপন করেননি। বরঞ্চ এই ধরনের জঘন্য কাজ একাধিকবার অর্জুনের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাণ্ডবদাহনের মত হত্যার বিভীষিকা মহাভারতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি। এই হত্যালীলার একমাত্র নায়ক ছিলেন যাকে আমরা ধনঞ্জয় বলে জানি সেই কৃষ্ণ সহায়

বীরপুরুষ। জরাসন্ধকে হত্যা আর একটি কাপুরুষোচিত কর্মের উদাহরণ এবং কৃষ্ণকর্তৃক অতর্কিতে শিশুপালবধও নিছক হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্ণের জীবনে এইরকম কলঙ্কিত ঘটনা একটিও ঘটেনি। পরন্তু, তিনি কুন্তীকে যে কথা দিয়েছিলেন তাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবকে হাতের কাছে পেয়েও বধ করেননি।

কর্ণ চক্র উদ্ধারের কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর আবেদনের কি বিবেচনা কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে হল তা নির্ণয় করবার অবকাশও পেলেননা। অগত্যা তিনি সেই প্রোথিতচক্র রথে উঠেই আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। এইখানে একটি সহজ উপায় কেন অবলম্বন করা হলনা, সেটি বোঝা যায় না। এইরকম বিপদের ক্ষেত্রে অন্য রথীরা তাঁদের রথ নিয়ে সহায়তায় এগিয়ে আসতেন এবং ভগ্নরথ যোদ্ধা দ্বিতীয় রথে উঠে যুদ্ধ করতেন। এক্ষেত্রে সেটা করবার সুযোগ ছিল; কিন্তু তাহলে কর্ণহত্যাকে ঘটানো যায় না। পুরাণকার সেই কারণেই এরূপ কৌশল উদ্ভাবন থেকে নিরস্ত হয়েছেন। আর একবার তিনি এক সুতীক্ষ্ণ বাণে অর্জুনকে মোহাবিষ্ট করে দ্রুতগতিতে মাটিতে নেমে রথচক্র উদ্ধারের চেষ্টা করলেন। কিন্তু হতভাগ্য কর্ণকে সে সুযোগ দেওয়া আর হলনা। এর মধ্যে অর্জুন সংজ্ঞালাভ করবামাত্র কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—"কর্ণ রথে ওঠবার আগেই ওর মস্তক ছেদন কর।" সম্পূর্ণ নিরস্ত্র কর্ণ যখন দুহাতে রথের চাকা ওঠাতে ব্যস্ত তখন মহাবীর সব্যসাচী আগে তাঁর রথের ধ্বজদণ্ড কেটে রথকে অনুপযুক্ত করে ফেললেন, তারপর একটি শাণিত শর প্রয়োগ করে তাঁর পরম শত্রুর মস্তক ছেদন করে ফেললেন। মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, দানব্রত, পুণ্যচরিত্র, সত্যনিষ্ঠ এবং মহাকর্তব্যনিষ্ঠ এই পুরুষকে কৃষ্ণের প্ররোচনায় এইভাবে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করতে হল। পরোক্ষভাবে এই হত্যা কাণ্ড কৃষ্ণেরই অনুষ্ঠান। কর্ণের আকাঙ্খিত সারথি শল্যের কোনও ভূমিকাই শেষপর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হলনা। ইচ্ছে করলে কর্ণ কিন্তু অর্জুন যখন তাঁর বাণে মোহ-

গ্রস্ত হয়েছিলেন তখন দ্রুতগতিতে অপর এক বাণের আঘাতে তাঁর মস্তক ছেদন করতে পারতেন; কিন্তু সেই ঘৃণ্য অন্যায় যুদ্ধের অননুমোদিত অপকর্ম তিনি করেননি। তিনি নিজেও কল্পনা করেননি যে অর্জুন তাঁকে ন্যায়যুদ্ধের সমস্ত নীতি উপেক্ষা করে ঘৃণ্যভাবে হত্যা করবেন। অর্জুনের যুদ্ধনিষ্ঠার প্রতি এই আস্থাই তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। দুএকদিনের মধ্যেই অর্জুনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভীমসেনও গদাযুদ্ধের নীতিকে এইভাবেই উপেক্ষা করে দুর্যোধনকে নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করেছিলেন। তখনও তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন পুণ্যশ্লোক জনার্দন।

কর্ণের ছিন্নমুণ্ড যখন কর্দমাক্ত ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল তখন সারথিপ্রবর শল্য তাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তিনি একটি চমৎকার শোকের অভিনয় করলেন। তিনি দীনভাবে বারবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং একান্ত "বিমোহিতচিত্ত" দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বললেন—"মহারাজ দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। এতএব, তুমি আর এখন শোকাকুল হোয়োনা। অদৃষ্টে যা আছে তাকে অতিক্রম করা অতিশয় সুকঠিন। তুমি আশ্বস্ত হও, সব সময় আমাদের কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকেনা।" শোকসন্তপ্ত দুর্যোধন এতবড় আঘাত আর জীবনে পাননি তথাপি তিনি দিনের বাকি সময়টুকু যথাসম্ভব সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। অবশেষে যখন সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল তখন ভগ্নহৃদয়, হৃতসর্বস্ব, হতবান্ধব এবং শোকাকুল রাজা দুর্যোধন সেদিনের মত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন।

অতঃপর কর্ণহন্তা কীর্তিমান ধনঞ্জয় মহাগৌরবে শিবিরে ফিরে এলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর স্কন্ধাবারে সুবর্ণময় উত্তমশয্যায় শয়ন করেছিলেন। সেইখানে অর্জুন এসে তাঁর পাদবন্দনা করলেন। বলা বাহুল্য সঙ্গে বাসুদেবও ছিলেন। কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত তিনিই যুধিষ্ঠিরের কাছে আদ্যোপান্ত সবিস্তারে নিবেদন করলেন। সব শুনে যুধিষ্ঠির বললেন,—"হে দেবকীনন্দন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি সারথি হওয়াতেই ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে

নিহত করেছেন। তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সূতপুত্র নিহত হয়েছে। অতএব, এটা আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে করবার কারণ নেই।" তারপর সেই অন্ধকারের মধ্যেই ভয়সঙ্কুল রুধিরকর্দমযুক্ত পথে তিনি সাজসজ্জা করে সুবর্ণমণ্ডিত রথে সমরভূমি দেখবার জন্য যাত্রা করলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরে গ্রথিত হয়ে কেশরে পরিবৃত কদমফুলের মতই রণশয্যায় শয়ন করে আছেন। তার দেহের চারদিকে বহু সুগন্ধ তৈলযুক্ত কাঞ্চনপ্রদীপ উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। তাঁর দুই পুত্রও অদূরে নিহত অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে আছেন। কর্ণের মৃতদেহ বার বার দেখে তিনি তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করলেন এবং প্রচণ্ড আহ্লাদে কৃষ্ণকে বললেন— "গোবিন্দ তুমি সহায় এবং রক্ষক হওয়াতেই আজ আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি বলে উপলব্ধি করলাম। এইবার দুর্যোধনের পালা। আমাদের গত তেরো বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে; একদিনও ঘুম হয়নি। আজ তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করব।" এতবড় এক ব্যক্তিত্বের মহাপতনে যুধিষ্ঠিরের মর্ম থেকে এতটুকু খেদোক্তিও নিঃসারিত হল না। এই হচ্ছেন উদারচরিত অপর পুণ্যশ্লোক অভিধাযুক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির।

ওদিকে কর্ণের মৃত্যুসংবাদ যখন হস্তিনায় পৌঁছালো তখন ধৃতরাষ্ট্র কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন এবং গান্ধারীও প্রাসাদ-কুট্টিমে গাত্রবিক্ষেপ করে তাঁর জন্য বিলাপ করতে লাগলেন। কৌরবপত্নীগণ তাঁকে সযত্নে ভূমিশয্যা থেকে ওঠালেন; বিদুর এসে ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা প্রদান করতে লাগলেন। কেবল নিরন্তর কটুভাষী সঞ্জয় বৃদ্ধ অন্ধরাজকে বললেন, "মহারাজ, আপনার দুর্মন্ত্রণার জন্যই এই মহাক্ষয় সংঘটিত হয়েছে; এখন আর কেন বৃথা অনুশোচনা করছেন?" কিন্তু কর্ণের জননী কুন্তী সেই মুহূর্ত কিভাবে কাটিয়ে-ছিলেন তার কোনও বিবরণ দেওয়া হয়নি।

কর্ণ তিরোহিত হবার পর কৃপাচার্য নাকি দুর্যোধনের কাছে আর একবার সন্ধির কথা উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন শান্তভাবে

সেই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তাঁর কথাগুলি খুবই যুক্তি-পূর্ণ। তিনি বললেন—"পাণ্ডবদের কাছে সন্ধি প্রার্থনা আর বিধেয় হতে পারেনা। এই পৃথিবীতে আমি কীর্তিস্থাপন করে যেতে চাই; কিন্তু তা যুদ্ধ ভিন্ন লাভ করা যায় না। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞাদি সম্পা-দনের পর অরণ্যে অথবা যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করেন তিনিই যথার্থ মহিমা অর্জন করে থাকেন। আর যে ক্ষত্রিয় শোকগ্রস্ত জ্ঞাতিগণের মধ্যে থেকে জরাজীর্ণ হয়ে দীনভাবে বিলাপ করতে করতে মানবলীলা সংবরণ করেন, তিনি কখনই পুরুষ বলে পরিগণিত হননা। অতএব আমি এখন বিষয় উপভোগের বাসনা ছেড়ে যুদ্ধদ্বারা উত্তম মৃত্যুকে বরণ করতে চাই। বহু রাজা ও সৈন্যসমূহ আমারই জন্য যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নিহত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও তাঁদের ঋণজাল থেকে মুক্তিলাভ করতে আমার একান্ত বাসনা হয়েছে। রাজ্যে আমার আর মনোনিবেশ হচ্ছেনা। যদি এখন আমি বন্ধু, ভ্রাতৃগণ এবং অপর সবাইকে মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষেপ করে নিজের জীবন রক্ষা করি, তাহলে লোকে আমার নিন্দা করবে। এখন বন্ধু-বান্ধবহীন হয়ে যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহ ভীক্ষা করে রাজ্যলাভ করলে তা আমার কোনক্রমেই প্রীতিকর হতে পারেনা। অতএব স্বর্গলাভই আমার শ্রেয়। রাজ্যলাভে আমার কোনক্রমেই অভিরুচি হচ্ছেনা।" এই কথার পব সন্ধির প্রস্তাব আর কেউ তাঁর সম্মুখে উত্থাপিত করলেননা।

কৌরবদের পক্ষে মাত্র কয়েকজন যোদ্ধা ছাড়া আর সামান্য সৈন্য-সামন্তই বেঁচে ছিল। দুর্যোধনসহ কয়েকজন রথী কুরুক্ষেত্রের অদূরে হিমালয় প্রস্থে সেই দুঃসহ রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন মদ্ররাজ শল্য সেনাপতিত্বের ভার গ্রহণ করলেন। কৌরবপক্ষে শল্যের অভি-ষেকের শেষ জয়ধ্বনি শুনে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন,—"মহারাজ, মাতুল বলে মদ্ররাজকে দয়া করবার প্রয়োজন নেই। আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বধ করুন। আপনি ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণের মত মহাসমুদ্র

উত্তীর্ণ হয়ে এখন শল্যের মত গোস্পদে নিমগ্ন হবেননা।" অথচ কর্ণ-বধের আগে পর্যন্ত এই শল্যের স্তাবকতা তাঁরা কম করেননি। মাতুল শল্য ভাগিনেয়দের জয়লাভের জন্য অতি হীন বিশ্বাসঘাতকতা করে কর্ণের বধসাধন করেন। আজ তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অতএব গোস্পদের মত এই পঙ্কিল ব্যক্তিকে দয়া করবার কি প্রয়োজন থাকতে পারে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসহন্তা তার পরিসমাপ্তি এইভাবেই ঘটে।

শল্যের সেনাপতিত্বে উভয়পক্ষের অবশিষ্ট সৈন্যগণ সঙ্কুলযুদ্ধে প্রাণ দিতে লাগল। কর্ণের অবশিষ্ট দুই পুত্র চিত্রসেন ও সত্যসেন এই সময়ে প্রাণ দিলেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বেশ কয়েকবার শল্যের যুদ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু তাতে কোনও পক্ষেরই সুবিধা হয়নি। বৃদ্ধ শল্য যুদ্ধে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর শারীরিক সামর্থ্য সেই বয়সে খুব কম থাকবারই কথা। সুযোগ বুঝে যুধিষ্ঠির একবার তাঁর বক্ষস্থলে একটি প্রচণ্ড শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সে আঘাত বৃদ্ধ শল্য সহ্য করতে পারলেননা, তিনি বিষম আহত হয়ে রথ থেকে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় দুহাতে পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে মৃত্যুবরণ করলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রতি স্নেহবশতঃ তিনি যে হীনতম পাপ আচরণ করেছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত এইভাবে হল এবং ধর্মরাজ বোধ করি ধর্মযুদ্ধেই তাঁকে হত্যা করলেন। পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করে, বৃদ্ধ মাতুলের বক্ষে প্রচণ্ড শেল নিক্ষেপ করতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা হলনা। এরপর শল্যের অনুচর যাবতীয় মদ্রক সৈন্যই বিনষ্ট হল। একে একে যত সৈন্য ছিল সবই ধ্বংস হয়ে এলো। দুর্যোধনের ভাইরা সবাই মৃত্যু বরণ করেছিলেন। একমাত্র দুঃশাসনের মৃত্যু ভিন্ন অপর ভাইদের মৃত্যু-শোক তাঁকে ততটা মুহ্যমান করেনি; কিন্তু শেষবারের মত প্রচণ্ড আঘাতে তিনি পেলেন শকুনির মৃত্যুতে। শকুনি প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু সহসা তাঁর পুত্র উলূক সহদেবের নিক্ষিপ্ত ভল্লে ছিন্নমস্তক হয়ে পড়ে গেলেন। পুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যু তিনি সহ্য করতে পারলেননা; ভগ্নোদ্যমে তিনি যে যে অস্ত্র তাঁর কাছে ছিল সবই সহদেবের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করলেন, কিন্তু সেগুলি সব ব্যর্থ

হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সহদেব তাঁর পুত্রকে যেরকম ভল্ল দিয়ে হত্যা করেছিলেন, তাঁকেও সেই একই অস্ত্রে সংহার করলেন।

শকুনির কাজ ফুরিয়েছিল। ভীষ্ম গান্ধাররাজ সুবলকে রাষ্ট্রপতি হবার অনুপযুক্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য করেছিলেন। সেই থেকেই জাতক্রোধ শকুনি সমগ্র কুরুকুল ধ্বংস করবার অভিপ্রায় নিয়ে কৌরব সভায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যদিচ তিনি দুর্যোধনকে বহু বৎসর একচ্ছত্র অধিপতি থাকবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তথাপি তিনি জানতেন যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হবেই। সেই যুদ্ধের শেষ পরিণামে কুরুকুলের ছিন্নভিন্ন অবস্থাও তিনি প্রত্যক্ষ করে আত্মাহুতি দিলেন। শকুনি অন্তিমকাল পর্যন্ত দুর্যোধনের জন্যই বুদ্ধি এবং শরীর দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কেননা ধৃতরাষ্ট্র রাজা না হলেও তার পুত্রকে যতদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখা যায় তা তিনি করেছিলেন। তিনি যে কপটপাশা খেলে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। বরঞ্চ মহাভারতেই বারবার বলা হয়েছে যে অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠির শকুনির অক্ষপাণ্ডিত্যের কাছে নগণ্য ছিলেন। শকুনি কেন অক্ষক্রীড়ার প্রস্তাব করেছিলেন, সেকথা যদি তোলা যায় তাহলে বলতে হবে তিনি রাজনীতির চাল চেলেছিলেন যেমন এপক্ষে কৃষ্ণ বারবারই করে গেছেন। যুধিষ্ঠির নিজে যখন পাশাখেলায় পারদর্শী ছিলেননা তখন রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে তাঁর নিজেরই উচিত ছিল আমন্ত্রণ গ্রহণ না করা। কিন্তু তিনি লোভের বশীভূত হয়েছিলেন। সেই লোভটি হচ্ছে খেলায় জিতলে সমগ্র কৌরবরাজত্ব লাভ। তাঁর আত্মাও নিষ্পাপ ছিলনা। তবে, বুদ্ধিমান হলে তিনিও দুর্যোধনের মত অপর একজন অক্ষবিশারদকেই তাঁর হয়ে খেলতে বলতেন। তাহলে হয়তো শকুনিকে পাশাখেলার কৌশল পালটে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হত।

সাত

এইবার দুর্যোধন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন,—তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ, একা ; অল্প কয়েকজন সহচর ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। তাঁদেরও তিনি কাছেপিঠে খুঁজে পেলেননা। একটা মহাযুদ্ধের এমন শোচনীয় পরিসমাপ্তি এবং একটা বিরাট শূণ্যতা তাঁর চিত্তে কেমন যেন একটা বৈরাগ্যের সঞ্চার করল। চারিদিকে চেয়ে তিনি শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন, পরাজিত. বীরশূন্য শিবিরে পাণ্ডবগণ তাঁর একাকিত্বের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করতে পারেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন কিছুকালের জন্য তাঁর পক্ষে রণক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া প্রয়োজন। অতএব, তিনি সবার অলক্ষ্যে নিজের গদামাত্র সম্বল করে পূর্বদিকে অল্পদূরে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে গিয়ে বসলেন। হ্রদের জলে ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাঁর শোকাভিভূত শ্রান্ত, ক্লান্ত মনে কত শত ঘটনার স্মৃতি অস্ফুটভাবে জেগে উঠতে লাগল কে জানে। তিনি শূন্যমনে সেইখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। এমন সময় সেই যুদ্ধের একমাত্র সাংবাদিক সঞ্জয় তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

সঞ্জয় ঘটনাক্রমে সাত্যকির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন—"সাত্যকি, এই সঞ্জয়কে জীবিত রাখার প্রয়োজন কি ? একে এখনি সংহার কর।" সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা শোনবামাত্র তাঁকে বিনাশ করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁকে বোঝানো হল যে তিনি সংবাদবাহক মাত্র এবং অবধ্য। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু নিজের নিরাপত্তার জন্য তিনি যে বর্ম পরিধান করেছিলেন এবং সঙ্গে যে অস্ত্র রেখেছিলেন, সে সবই সেখানে রেখে আসতে হল। সঞ্জয় হস্তিনার দিকেই চলেছিলেন। রণক্ষেত্র থেকে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এসে তিনি দেখতে পেলেন দুর্যোধন সেখানে একলা বসে আছেন ; তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত ; কেবল

মাত্র তাঁর গদাকে তিনি তখনও ধারণ করে ছিলেন। দুর্যোধন এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে তিনি প্রথমটা তাঁকে দেখতে পাননি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সঞ্জয় তাঁকে সম্ভাষণ করে নিজের অবস্থার কথা জানালেন। তখন দুর্যোধন তাঁকে শেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। সঞ্জয় তাঁকে জানালেন যে তাঁদের পক্ষে সবাই নিহত হয়েছেন, কেবল বেঁচে আছেন,—অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য। রাজা দুর্যোধন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঞ্জয়কে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—"সঞ্জয় তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রকে জানাবে যে আপনার পুত্র ক্ষতবিক্ষত শরীরে এই হ্রদের অঞ্চলে আত্মরক্ষা করছে।" পুরাণকার যে দুর্যোধনের হ্রদে প্রবেশ করে আত্মগোপন করবার কথা বলছেন তা কাহিনীমাত্র। দুর্যোধন যে সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসেছিলেন সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল। এই অবস্থায় এই আচরণই নীতিসঙ্গত নতুবা তাঁর প্রাণ ঘৃণিতভাবে বিনষ্ট হত। অল্পক্ষণ পূর্বেই একাকী অবস্থিত সঞ্জয়ের প্রাণসংশয় হয়েছিল ; কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে কেবলমাত্র সাংবাদিক বলেই বেঁচে যান। সাত্যকি বা ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনকে সেই অবস্থায় দেখলে নিশ্চিতভাবেই দস্যুর মত সর্ববিধ উপায়ে হত্যা করতেন। হনন ছাড়া তখন আর কোনও প্রবৃত্তিই ছিল বলে মনে হয়না।

সঞ্জয় দুর্যোধনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছু দূরে যাবার পরেই অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁরা অশ্বারোহণে আসছিলেন। সঞ্জয়কে দেখে তাঁরা দুর্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জয় তাঁদের বললেন যে রাজা দুর্যোধন নিজের শিবিরে তাঁর নিরাপত্তার অভাব বোধ করে সেই স্থান ছেড়ে এসেছেন এবং বর্তমানে তিনি একা দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে বিষণ্ন মনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁরা তখনই দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা না করে সঞ্জয়কে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে শিবিরে ফিরে এলেন। সেখানে তখন খুবই বিশৃঙ্খল অবস্থা। অধিকাংশ অমাত্য ও রমণীগণ শোকাভিভূত হয়ে নগরের দিকে ফিরে চলেছেন। তখন রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, যিনি যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন,

তিনি দেখলেন যে একমাত্র দুর্যোধন ছাড়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর আর কোনও সন্তানই জীবিত নেই এবং যুদ্ধেও কৌরবদের পরাজয় প্রায় সম্পূর্ণ। অতএব তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৌরবদের সঙ্গে হস্তিনায় ফিরে চললেন।

অনেক রাত্রে শিবির যখন খালি হয়ে গেল তখন এই তিন মহারথী আর সেখানে থাকতে পারলেন না, তাঁরা দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সঙ্গে দুর্যোধনকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। সম্ভবতঃ হ্রদের মধ্যে কোনও আরামগৃহ ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। দুর্যোধন সেখানেই আশ্রয়-গ্রহণ করেছিলেন। অশ্বত্থামা সহচরদের নিয়ে সেখানে এসে মহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন। দুর্যোধন তাঁদের দেখে ভাবলেন তাঁরা বুঝি এই মুহূর্তেই আবার যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছেন; তিনি গভীর রাত্রির দিকে তাকিয়ে বললেন,—"বন্ধুগণ, আজ আমি একেবারে অবসন্ন। আজ রাত্রিটুকু আমাকে বিশ্রাম করতে দিন, কাল আমি আপনাদের নিয়ে বিপক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব—এটা নিশ্চিত।" অশ্বত্থামা বললেন—"মহারাজ, আমি এই রাত্রিতেই তোমার শত্রুদের বিনাশ করব। পাঞ্চালদের সম্পূর্ণ বিনষ্ট না করে আমি আমার দেহ থেকে বর্ম উন্মোচন করবনা।" সঞ্জয়ের প্রতি ধৃষ্টদ্যুম্নের বর্বরোচিত ব্যবহার তাঁকে অত্যন্ত উত্তেজিত করেছিল।

তিনি নিজেকে আর নিবৃত্ত করতে পারছিলেন না। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। তাঁরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছেন তখন কতকগুলি ব্যাধ জলপানের জন্য হ্রদের তীরে এসে উপস্থিত হল। তারা পাণ্ডবদের মাংস সরবারহ করত। তারা দুর্যোধনকে সেই হ্রদের কাছে থাকতে দেখে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদের গিয়ে সেই সংবাদ প্রদান করে প্রচুর পারিতোষিক লাভ করল। পাণ্ডবেরা তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে দ্বৈপায়ন হ্রদের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁদের নিকটবর্তী হতে দেখে অশ্বত্থামা এবং তাঁর সহচরদ্বয় সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন এবং দুর্যোধন আবার হ্রদের গোপন স্থানে

অবস্থান করতে লাগলেন। এই তিন বীর যদি জানতে পারতেন যে দুর্যোধনের অবস্থান পাণ্ডবেরা জেনে ফেলেছেন, তাহলে তাঁরা কদাচ মহারাজকে একা পরিত্যাগ করে যেতেননা।

যুধিষ্ঠির সেই হ্রদের তীরে এসে ক্লান্ত দুর্যোধনকে তাঁর আশ্রয় থেকে বের করে আনলেন। তাঁরা ব্যঙ্গ করতে লাগলেন যে দুর্যোধন পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছেন, কিন্তু দুর্যোধন শান্তভাবে বললেন যে তিনি ভীত হয়ে পালিয়ে আসেননি, অবস্থাবিপর্যয়ে সমরক্ষেত্র থেকে কিছু দূরে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন মাত্র, কেননা এছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিলনা। এর পরের ঘটনা মহাভারত পাঠক মাত্রেরই জানা। অবশেষে দুর্যোধনকে এককভাবে ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তথাকথিত ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের অন্তিম অবস্থার পুরোপুরি সুযোগ নিতে দেখা যায়। তিনি তাঁকে হত্যার জন্য অতি-ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; করুণার লেশমাত্রও তাঁর অন্তরে তখন অবশিষ্ট ছিল বলে মনে হয়না। তিনি দুর্যোধনকে বললেন,—"আমাদের মধ্যে যার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে ইচ্ছা হয় তাকে আহ্বান কর। আমাদের পক্ষের হার হলে রাজত্ব তুমিই পাবে।" দুর্যোধন ভীমকেই গদাযুদ্ধে আহ্বান করলেন, ঠিক যে রকম জরাসন্ধ করেছিলেন। এখানেও তাঁর বীরধর্মের প্রশংসা করতে হয়। ভীম ছাড়া অপর কেউ তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেননা; কিন্তু তিনি দুর্বল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে বীরত্বের অবমাননা করলেননা।

গদাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তখন প্রভাত হয়ে গেছে। দুর্যোধন অতুলনীয় পরাক্রমে যুদ্ধের শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রেখে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীম তাঁর চেয়ে বাহুবলে বলীয়ান ছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধচাতুর্যে দুর্যোধনের সমকক্ষ ছিলেননা। কৃষ্ণ বরাবরই সেই ভয় করছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও সেকথা বলছিলেন। তাই এ যুদ্ধে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিলনা। শেষ পর্যন্ত ঘটতেও যাচ্ছিল তাই, ভীম কোনও কৌশলেই প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে পারছিলেননা। এই অবস্থায় তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করে কৃষ্ণ মনে মনে স্থির করলেন অন্যায় যুদ্ধের

আশ্রয় গ্রহণ করেও দুর্যোধনকে বধ করা উচিত। যুদ্ধে ক্রমশই ভীমসেন অবসন্ন হয়ে পড়ছেন দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন—"সখা, এদুজনের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধকুশল এবং কারই বা গুণপনা অধিকতর?" কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"ওঁরা দুজনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন। ভীমসেন দুর্যোধনের চেয়ে বলবান বটে, কিন্তু তাঁর চেয়ে কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিকতর। যদি ভীমসেন ওঁর সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ চালিয়ে যান তাহলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সঙ্কটে পড়ে যাবেন। দুর্যোধন একে যুদ্ধনিপুণ তাতে আবার একাগ্রচিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। দেখ, দুর্যোধন হতসৈন্য ও পরাজিত হয়ে রাজ্যলাভের আশা পরিত্যাগ করে অরণ্যবাসের সিদ্ধান্ত করেই হ্রদের অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে আবার যুদ্ধের জন্য আহ্বান করাটা খুবই অবিজ্ঞতার কাজ হয়েছে। দুর্যোধন বহুকাল ধরে গদাযুদ্ধের চর্চা করেছেন এবং এখন ভীমকে পরাজিত করবার জন্য নানা দুরূহ রণকৌশল প্রদর্শন করছেন; অতএব যদি ভীমসেন তাঁকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন তাহলে ওই বীর নিশ্চয়ই আমাদের নির্জিত রাজ্য লাভ করে সিংহাসনে আবার অধিষ্ঠিত হবেন। যুধিষ্ঠির যে তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোনও একজনকে নির্বাচন করে নিয়ে তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করলে দুর্যোধনকে রাজ্যের আশ্বাস দিয়েছেন, তার চেয়ে নিবুর্দ্ধিতার নিদর্শন আর কিছুই হতে পারেনা।" অর্জুন এই কথা শুনে, যুদ্ধের ফাঁকে ভীমসেন তাঁর দিকে চাইতেই নিজের বাম উরুতে আঘাত করে সঙ্কেতে জানালেন। ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাঁদের উদ্দেশ্য অবগত হয়ে সেই সঙ্কেত অনুসারে দুর্যোধনকে উরুদেশে আঘাত করবার সঙ্কল্প করলেন। দুর্যোধন স্বপ্নেও এটা ভাবেননি। পাণ্ডবপক্ষের প্ররোচনা না থাকলে ভীমও হয়ত এতটা কাপুরুষ হতেননা। তখন তাঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যে কোনও ছলের আশ্রয় নিয়েও তিনি দুর্যোধনকে নিষ্ক্রিয় করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। লড়াই চলতে লাগল, ভীমও ছল খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে ভীমসেনের একটা প্রহার ব্যর্থ করবার জন্য দুর্যোধন যেই

লাফিয়ে উঠেছেন অমনি তাঁর উরুদ্বয় লক্ষ্য করে ভীম সবেগে গদা নিক্ষেপ করলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে দুর্যোধনের দুটি জানুই চূর্ণ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলেন। আর তাঁর ওঠবার ক্ষমতা রইলনা। অতি বড় কাপুরুষও যে কাজ করতে পারে-না, সেই ঘৃণ্য অন্যায় আঘাতে প্রতিপক্ষকে ভূমিশায়ী করে, ভীম জঘন্য নির্লজ্জতার সঙ্গে আহত কুরুরাজের মাথায় বামপদে আঘাত করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভীমের অন্যায় যুদ্ধকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। ধর্মযুদ্ধে নাভির নীচে গদাঘাত করা নীতিবহির্ভূত। ভীম-সেন এই কুকাজ করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, এর আগে সেরকম কাজ আর কোনও যোদ্ধাকর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়নি। পুরাণকার বলেছেন যে অক্ষক্রীড়ার কালে দুর্যোধন যখন দ্রৌপদীকে উরু দেখিয়ে অব-মাননা করেন তখন ভীমসেন নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি যুদ্ধকালে গদার আঘাতে সেই উরুদ্বয় চূর্ণ করে দেবেন। এর সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভীম যদি এই রকম প্রতিজ্ঞাই করতেন তাহলে দুর্যোধনও সেকথা স্মরণ রাখতেন নিশ্চয়ই; কিন্তু তিনি সে-রকম কিছু জানতেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া, গদাযুদ্ধের নিয়ম সম্বন্ধে ভীম পরিজ্ঞাত ছিলেন। অতএব, স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষত্রিয়-হিসাবে তিনি এইরকম প্রতিজ্ঞা করতেই পারতেন না। আসলে, দুর্যোধনের যুদ্ধকৌশলে শ্রান্ত, ক্লান্ত, পর্যুদস্ত ভীমসেন দুর্যোধনকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যেই এই কাপুরুষোচিত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু, কৌরবসভায় অক্ষক্রীড়ার কালে অবস্থা যত উত্তেজকই হোক না কেন, সেখানে বীরধর্ম থেকে বিচ্যুত হবার মত পরিস্থিতি রচিত হয়নি। যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়েও পাণ্ডবেরা একটা দুষ্কৃতির স্বাক্ষর রেখে গেলেন। আর কৃষ্ণ? যিনি কর্ণের কাছে মৃত্যুকালে তাঁর শঠতার লম্বা অভিযোগ তুলে ধরেছিলেন, তিনি দুদিন বাদেই ন্যায়ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করলেননা। একাজ তথাকথিত পুরুষোত্তমের উপযুক্তই বটে।

আহত দুর্যোধন মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে রইলেন এবং তাঁকে সেই-ভাবেই ফেলে রেখে পাণ্ডবেরা সসৈন্যে কৌরব শিবির লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা কুরুশিবিরে এসে দেখলেন সেখানকার অবস্থা জনশূন্য রঙ্গভূমির মত। সেখানে কিছু বৃদ্ধ অমাত্য ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রয়েছেন। তথাপি যা পড়ে আছে তাও নগণ্য নয়। পাণ্ডবেরা শিবিরে ঢুকে দাসদাসী থেকে আরম্ভ করে সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কম্বল, আজিন প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য যা পেলেন, সবই দখল করে নিলেন। বলা বাহুল্য খুব শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই লুণ্ঠনকার্য সমাধা হয়নি। এখন বোঝা যাবে, কেন দুর্যোধন শিবির থেকে আগেই চলে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, পরাজিত কৌরব-শিবিরে পাণ্ডবেরা হানা দিয়ে চূড়ান্ত অত্যাচার করতে পারেন। কার্যতঃ সেটাই অনুষ্ঠিত হল। এর পরও তাঁরা কৌরবশিবিরের দখল ছাড়লেননা, তবে কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে সেই রাত্রিটা শিবিরের বাইরে কাটালেন; কারণ শত্রুশিবিরের ভিতরে রাত্রিকালে কোনও বিপদ ঘটবার আশঙ্কা স্বাভাবিক। সকালে রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কাছে পাঠালেন, যাতে এর পরেই তাঁদের সাক্ষাৎকারটি অপেক্ষাকৃত সুগম হয়। পরের দিনটা কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হস্তিনায় রয়ে গেলেন; কিন্তু সন্ধ্যাকালে আবার পাণ্ডবদের কাছে ফিরে এলেন, কারণ তাঁর সন্দেহ ছিল অশ্বত্থামা বা কৃতবর্মা তাঁদের বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করতে পারেন। সেই রাত্রিও তাঁরা কৌরব-শিবিরের বাইরেই অতিবাহিত করলেন।

ওদিকে দুর্যোধন ক্রমেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। পাণ্ডবেরা প্রস্থান করলে সঞ্জয় তার কাছে গিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। দুর্যোধন তাঁকে বললেন,—"সঞ্জয় তুমি আমার পিতা-মাতাকে গিয়ে বলবে যে এতকাল আমি উপযুক্তভাবে আমার সাম্রাজ্য শাসন করেছি। সুচারুভাবে কর্তব্য পালন করবার পর ধর্মযুদ্ধে মৃত্যু-বরণ করে আজ আমি কীর্তি স্থাপন করে যাচ্ছি। অধার্মিক ভীমসেন যুদ্ধনীতি উল্লঙ্ঘন করে আমাকে নিপাতিত করেছে। পাপানুষ্ঠান

যদি কেউ করে থাকে তাহলে তা পাণ্ডবেরাই করেছে। তারা এরপর রাজ্য দখল করবে, কিন্তু এই অধর্মানুষ্ঠানকারিদের তোমরা কিছুতেই বিশ্বাস কোরোনা। আমি এই পবিত্র সামন্তকপঞ্চতীর্থে শরীর পরিত্যাগ করে উত্তম লোক প্রাপ্ত হব।" এই সামন্তকপঞ্চতীর্থ আসলে পাঁচটি বিশাল হ্রদ নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। দ্বৈপায়ন হ্রদ সেগুলির অন্যতম। পাণ্ডবেরা এই এলাকার ঠিক বাইরে তাঁদের শিবির স্থাপন করেছিলেন। এই দ্বৈপায়ন হ্রদ নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই হ্রদে একটি দ্বীপ ছিল। দুর্যোধন সেই দ্বীপে কোনও গৃহে শিবির থেকে সরে এসে গোপনে অবস্থান করছিলেন। মহাভারতে কথিত "জলস্তম্ভ" একটি কল্পিত আখ্যায়িকা।

দুর্যোধনের এই অন্তিম অবস্থার কথা অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা জানতেননা। তাঁরা দূতমুখে পাণ্ডবদের অভিযান ও গদাযুদ্ধের কাহিনী শুনে মহারাজের কাছে ছুটে এলেন। তাঁরা এসে দেখলেন রাজা দুর্যোধন হ্রদের ধারে বনাকীর্ণ অঞ্চলে রক্তাক্ত কলেবরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তের সঙ্গে ধূলিজালে ধূসরিত হয়ে গেছে। তাঁদের প্রিয় বন্ধুকে এই অবস্থায় দেখে তাঁরা শোকে দুঃখে একান্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর রথ থেকে নেমে মহারাজের কাছে ভূমিতলে উপবেশন করলেন। দুর্যোধন তাঁদের অত্যন্ত করুণভাবে বলতে লাগলেন—"বীরগণ, আমি আপনাদের সাক্ষাতেই মর্ত্যের ধর্ম অনুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছি। আমি এতদিন ধরে সমগ্র পৃথিবী পালন করে আজ এই রকম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি। যাই হোক, ভাগ্যক্রমে আমি কোনও বিপদেই যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হইনি। পাপাত্মা পাণ্ডবেরা ছলের আশ্রয় নিয়ে আমাকে ধরাশায়ী করেছে। আমার জন্য আপনাদের শোক করবার প্রয়োজন নেই। আপনারা আপন আপন উৎসাহ ও পরাক্রম অনুসারেই কাজ করেছেন, কিন্তু পরিণামে শত্রুদের পরাজয় সাধন করতে পারলেন না,—সেটা আপনাদের দুর্ভাগ্য। কি করবেন? দৈবকে অতিক্রম করা সাধ্যায়ত্ত নয়।" এই পর্যন্ত বলে তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে ক্ষণকাল

বিহ্বল হয়ে রইলেন। অশ্বত্থামা এই করুণ বিলাপ শুনে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"মহারাজ পাণ্ডবদের নৃশংসতায় আজ তোমার যে অবস্থা ঘটেছে তার জন্য আমাদের পরিতাপের অবধি নেই। আমি আজ সমস্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শপথ করছি যে সমস্ত পাঞ্চালদেরই কৃষ্ণের উপস্থিতিতে বিনষ্ট করব। তুমি আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান কর।" এই কথা শুনে দুর্যোধন তাঁকে সেনাপতিত্ব প্রদান করলেন। অশ্বত্থামা অন্তিম পথযাত্রী রাজা দুর্যোধনের ভূলুণ্ঠিত দেহ আলিঙ্গন করে সেখান থেকে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রস্থান করলেন। দুর্যোধন তখনও জীবন ধারণ করে সেইখানেই সারারাত্রি অতিবাহিত করতে লাগলেন। ব্যস্ততার দরুণ অশ্বত্থামা ও কুরুরাজের দেহকে সুরক্ষিত রাখবার কোনও ব্যাবস্থা করে গেলেননা। হয়তো বা সঞ্জয় নিজেই এই দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন।

কৌরব শিবির পাণ্ডবদের দখলে আসবার পর অশ্বত্থামা এবং তাঁর দুজন সহচর অন্যত্র প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা পাণ্ডবদের ভয়ে এক জায়গায় অধিকক্ষণ থাকতে পারছিলেননা, কারণ অনবরতই এদিক ওদিক থেকে তাঁদের জয়ধ্বনি শ্রবণগোচর হচ্ছিল। অগত্যা তাঁরা তিনজন খানিকটা দূরে গিয়ে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে, একটি বটবৃক্ষের কাছে এসে রথ থেকে নেমে পড়লেন। সেখানে অশ্বদের ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বিশ্রাম করতে লাগলেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে রাত গভীর হল। অশ্বত্থামা কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলেন না; কিন্তু তাঁর দুই সহচর শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এক সময় অশ্বত্থামা তাঁদের জাগিয়ে তুলে তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল এবং পাণ্ডবদের হত্যা করবার সংকল্প ব্যক্ত করলেন। তাঁর সহচরদ্বয় এই প্রস্তাবে রাজি হলেননা, তাঁরা বললেন, প্রভাতে তাঁরা ধর্মানুযায়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ভীমের অন্যায় যুদ্ধে এতটা উত্তেজিত হয়েছিলেন যে তিনি বললেন, পরজন্মে কীট বা পতঙ্গযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হলেও তিনি সেই নিষ্ঠুর শত্রুদের সুপ্ত অবস্থায় সংহার করবেন। এই কথা

বলে তিনি রথে অশ্ব সংযোজন করে বিপক্ষ শিবিরের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন তাঁর দুই সহচরও বর্ম ধারণ করে কার্মুক এবং খড়্গ নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন।

অশ্বত্থামার কৌরবশিবিরে প্রবেশ করাটা একেবারে সহজসাধ্য হয়নি, কেননা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহের সামনে অল্পসংখ্যক রক্ষী সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। সম্ভবতঃ অশ্বত্থামা এবং তাঁর সহচরদ্বয় সহসা তাদের আক্রমণ করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেন এবং হত্যা করেন। তথাপি, একটি গোলমাল হবার কথা; কিন্তু মহাভারতের বিবরণ অনুসারে জানা যায় প্রহরী একজনই ছিলেন এবং তিনি নাকি স্বয়ং ভীষণ-দর্শন মহাদেব। অশ্বত্থামা তাঁকে অর্চনায় সন্তুষ্ট করে শিবিরে প্রবেশ করেন। এই আখ্যায়িকা পৌরাণিক। আসলে, অশ্বত্থামা প্রভৃতি তিনজন মিলে প্রহরীদের অতর্কিতে হত্যা করেছিলেন, এইটাই নির্ভরযোগ্য ঘটনা হতে পারে। যে কোন প্রকারেই হোক, অশ্বত্থামা নিঃশঙ্কচিত্তে একা শিবিরে প্রবেশ করলেন। তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে তিনি দেখতে পেলেন যে পাঞ্চালগণ সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু তিনি ঘরে প্রবেশ করবামাত্র তাঁর পদশব্দে ধৃষ্টদ্যুম্ন জেগে উঠলেন। তিনি অশ্বত্থামাকে চিনতেও পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি শয্যা থেকে ওঠবামাত্র অশ্বত্থামা তাঁর কেশগ্রহণ করে তাঁকে মাটিতে ফেলে নিষ্পেষিত করতে লাগলেন। তারপর তিনি পা দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষস্থল চেপে ধরে কণ্ঠদেশ দুই হাতে প্রবলভাবে অবরুদ্ধ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সামান্য বাধা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন মাত্র; তার-পরেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হলেন। অশ্বত্থামা এইভাবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলেন। দুই পুরুষের নির্মম শত্রুতার এইখানে যবনিকাপাত হল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীরা এর মধ্যে জেগে উঠেছিলেন। তাঁরা চিৎকার করে আর্তনাদ করতে আরম্ভ করলেন। অন্ধকারে হত্যাকারীকে তাঁরা ঠিক চিনে উঠতে পারলেন না। তখন শিবিরের অল্প কয়েকজন যোদ্ধা জেগে উঠে অশ্বত্থামাকে

পরিবেষ্টন করে ফেললেন। কিন্তু, অশ্বত্থামা প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন, তিনি খড়্গাঘাতে বাধাপ্রদানকারিদের সবাইকে হত্যা করে ফেললেন। এর মধ্যে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধনবার্তা শুনে অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন; কিন্তু তাঁরাও সকলেই একে একে নিহত হলেন। তাঁদের সঙ্গে শিখণ্ডীও প্রাণ দিলেন। রাত্রির অন্ধকারে সহসা নিদ্রাভঙ্গ অবস্থায় কেউ অশ্বত্থামাকে নিবৃত্ত করতে পারলেননা। কৃপ এবং কৃতবর্মা শিবিরের দ্বারদেশে প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন। অশ্বত্থামা এইভাবে কার্যসাধন করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন; এবং তাঁরা তিনজনেই তৎক্ষণাৎ দুর্যোধনের কাছে এই সংবাদ দেবার জন্য ছুটে এলেন। ততক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেছে। তাঁরা দেখলেন, কুরুরাজের সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, তিনি রক্ত বমন করছেন। তাঁর জীবনের আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। শ্বাপদগণ তাঁর দেহের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং মহারাজ অতিকষ্টে তাদের নিবৃত্ত করছেন। মৃত্যুপথ-যাত্রী দুর্যোধনকে অশ্বত্থামা জানালেন যে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রের প্রাণ সংহার করে এসেছেন। দুর্যোধন শত্রুনিধন হয়েছে জেনে প্রীতিলাভ করলেন; কিন্তু কি উপায়ে এই বধকার্য সম্পন্ন হয়েছে সে বৃত্তান্ত শুনলে আদৌ প্রীত হতেন কিনা সন্দেহ। এর অব্যবহিত পরেই তিনি মৃত্যুর ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করলেন।

পাণ্ডবগণ কৌরব শিবিরের বহির্ভাগে রজনী যাপন করছিলেন। প্রভাতে তাঁদের নিজের শিবিরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির কাছ থেকে সে সংবাদ তাঁরা পেলেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ নকুলকে পাঠিয়ে দিলেন দ্রৌপদীকে তাঁদের কাছে নিয়ে আসবার জন্য। হতভাগিনী দ্রৌপদীর অবস্থা তখন শোচনীয়। তাঁর নিজের বলতে আর কেউ তখন ছিলনা; পাণ্ডবদের কোনও বংশধর অবশিষ্ট রইল না। একমাত্র অর্জুন অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার গর্ভে একটি সন্তান আশা করছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই গর্ভে কন্যা না

জন্মে পুত্র জন্মেছিল নতুবা পাণ্ডবদের কোনও বংশধরের আশা থাকত না। ভীমসেন দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে নিপাত করে সমূলে শত্রু-কুলের উচ্ছেদ হয়েছে ভেবে চরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তার প্রতিশোধ এইভাবে নেওয়া হবে এবং সেটি নেবেন গুরুপুত্র অশ্বত্থামা। এটি আসলে প্রকৃতির প্রতিশোধ, অশ্বত্থামা নিমিত্তমাত্র ছিলেন।

এই অবস্থায় এক অশ্বত্থামার ধ্বংসসাধন ব্যতীত আর কিছুই করবার ছিলনা। দ্রৌপদীর চরিত্রে প্রতিশোধের স্পৃহা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। একমাত্র সেই প্রতিশোধবৃত্তি চরিতার্থ হলেই তাঁর শোকের নিবৃত্তি ঘটত বহুল পরিমাণে। দ্রৌপদী তখন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন,—"মহারাজ, পুত্রগণকে হারিয়ে আপনি আর কি সুখে রাজ্য-সম্ভোগ করবেন; পাপাত্মা অশ্বত্থামা শিবিরে নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করেছেন জেনে আমার হৃদয় শোকের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। সেই পামরের জীবন যদি আপনি সংহার না করেন তাহলে এইখানেই আমি প্রায়োপবেশন করব। আপনি অবিলম্বে দ্রোণপুত্রকে এর সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"যাজ্ঞসেনি শোন, তুমি ধর্মের মর্ম অবগত আছ। তোমার সন্তানগণ এবং অপরাপর বীরেরা যতটুকু যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে, তা ধর্মযুদ্ধ। তাদের জন্য আর অনুতাপ কোরোনা। অশ্বত্থামা এখান থেকে অনেক দূরে দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করেছেন, তাঁকে খুঁজে বের করে বধ করা দুঃসাধ্য।" যুধিষ্ঠির বুঝতে পেরেছিলেন,—এটা অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে বধ করবার সমুচিত প্রতিফল। তিনি অশ্বত্থামাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। অতএব, সন্তানদের বিনাশ ঘটা সত্ত্বেও তিনি আর যুদ্ধ করতে চাইলেননা। কিন্তু ভীম প্রতিশোধ-পরায়ণ ছিলেন। তিনি নকুলকে সারথি করে অশ্বত্থামাকে খুঁজে বের করবার জন্য অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন; যুধিষ্ঠির বাধা দিতে পারলেননা। কৃষ্ণ কিন্তু এই ব্যাপারে বিচলিত হয়ে উঠলেন, কারণ তিনি জানতেন যে অশ্বত্থামাকে পরাজিত করবার ক্ষমতা ভীমসেনের

নেই। ভীমসেনের যুদ্ধযাত্রার আরও একটি কারণ ছিল। দ্রৌপদী ভীমের সম্মুখেই বলেছিলেন—"মহারাজ, দ্রোণপুত্রকে নিপতিত করে তাঁর মাথার সেই মণি যদি আহরণ করে আপনার চরণতলে রক্ষিত হয়, তাহলেই আমি কোনরকমে জীবনধারণ করতে পারব।" ভীম বিশেষ করে সেই কারণেই অশ্বত্থামাকে বধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের ব্যাকুলতা দেখে যুধিষ্ঠিরও ভীষণ ভয় পেলেন। কৃষ্ণ তখন তাঁর রথে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে তুলে নিয়ে ভীমের অনুসরণ করতে লাগলেন। ভীম অনুসন্ধান করে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অশ্বত্থামাকে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে আক্রমণ করলেন। এর মধ্যে কৃষ্ণও রথ নিয়ে সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন। তাঁদের দেখে অশ্বত্থামা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভীম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অবতরণ করবার আগেই অর্জুন যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এলেন; কারণ এঁরা দুজনেই ছিলেন ধনুর্দ্ধর। যুদ্ধে কেউই কাউকে হারাতে পারলেননা। অবশেষে কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় অশ্বত্থামা তাঁর মাথার মণি অর্জুন ও ভীমকে প্রদান করলেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, অশ্বত্থামা বিবেকের দংশনে জর্জ্জরিত হচ্ছিলেন। যুদ্ধ আর তাঁর কাম্য ছিলনা। তাই পুত্রশোকে অতিমাত্রায় কাতর দ্রৌপদীর দুঃখকে স্মরণ করে তিনি নিজের মাথার মণি পাণ্ডবদের প্রদান করতে দ্বিধা করলেননা, যাতে সেই রমণীর প্রতিশোধস্পৃহা নিবৃত্ত হয়।

পুরাণে যা বর্ণিত হয়েছে তা কাহিনীমাত্র। কথিত আছে, অশ্বত্থামা ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র স্থাপন করে "পাণ্ডবংশ বিনষ্ট হোক"—এই কথা বলে সেটি মুক্ত করেছিলেন। ওদিকে অর্জুনও অনুরূপ শক্তিবিশিষ্ট একটি দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করেছিলেন। ফলে, দুটি অস্ত্রই একসঙ্গে বিরাজমান থেকে জগতের ধ্বংসসাধনের কারণ হয়ে উঠেছিল। তখন নারদ এবং ব্যাসদেবের বাক্যে উভয়েই বাণ প্রত্যাহার করে নিতে রাজি হলেন। অর্জুন স্বীয় ব্রহ্মচর্যের প্রভাবে সেই বাণ প্রত্যাহার করলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা কিছুতেই তাঁর নিক্ষিপ্ত শরকে প্রত্যাহার করতে পারলেন না। তখন সেই অস্ত্র তিনি ব্যাসের উপদেশে গর্ভবতী

পাণ্ডবকামিনীদের উপর প্রেরণ করলেন যাতে তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানগণ বিনষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ আগেই উত্তরাকে বর দিয়েছিলেন যে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবেই। ব্রাহ্মণের এই বরের প্রভাবেই উত্তরার গর্ভকে অশ্বত্থমার বাণ বিনষ্ট করতে সমর্থ হল না। বলা বাহুল্য, এই অলৌকিক কাহিনী অল্পমতি পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্যই পরিকল্পিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের সঙ্গে তাদের পিতাদের ও মাতার কতখানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল তা আমাদের মনে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে। জন্মাবধি তাঁদের কাউকেই পিতামাতার সঙ্গে একত্র দেখা যায় না। পাণ্ডবদের দীর্ঘ বনবাসকালে তাঁরা নিঃসন্দেহে পাঞ্চাল-গৃহে ছিলেন এবং তাঁদের যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা পাঞ্চালদের তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল। মহাভারত তাঁদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব বললে অত্যুক্তি হয়না। অভিমন্যুও দ্বারকাতেই মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পিতা ও পিতৃস্থানীয়দের স্নেহধন্য ছিলেন। মহাভারতে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন, কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের উল্লেখমাত্র বর্তমান ; এছাড়া তাঁদের অপর গুণপনা এমনকি অস্তিত্বেরও নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেই কারণেই বোধ করি পাণ্ডবগণকে তেমন শোকাকুল হতে দেখা গেলনা। এমনকি দ্রৌপদীও অর্জুনের কাছ থেকে অশ্বত্থামার মাথার মণিটি পেয়েই শোকপ্রকাশ থেকে ক্ষান্ত হলেন। তাঁর অনুরোধে যুধিষ্ঠির এটি তাঁর উষ্ণীষে ধারণ করেছিলেন। দ্রৌপদীর তথাকথিত পুঞ্চপুত্রের অস্তিত্বই কেমন যেন রহস্যময় ঠেকে।

আট

যুদ্ধ এবারে সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে গেল ; বাকি রইল নিহতদের প্রেত-কর্ম। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা এই সময় আমাদের চিত্তে একটি নিবিড় কারুণ্যের সঞ্চার করে। যে রাষ্ট্রে এতদিন তিনি মহা সমারোহে অধিষ্ঠিত ছিলেন আজ তাঁর সেই পদ তিরোহিত হয়ে যাবে এবং তাঁকে পরের করুণার আশ্রয় গ্রহণ করে বাস করতে হবে। শোকে, দুঃখে, ভবিষ্যতের অনিশ্চিয়তায় তিনি ব্যাকুল এবং আশাঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সহচর ছিলেন দুজন,—সঞ্জয় এবং বিদুর। এঁদের মধ্যে কটূভাষী সঞ্জয়ের বাক্যাদিতে কিছুমাত্র করুণার লক্ষণ প্রকাশ পায়নি, যদিচ তিনি আন্তরিকভাবেই তাঁর হিতৈষী এবং একান্ত অনুগত ছিলেন। এই দীন অবস্থাতেও তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিরতিশয় নিষ্ঠুর বাক্যে সর্বজনসম্মানিত অন্ধরাজকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। এক এক সময় এই দুর্মুখ ব্যক্তিটির ভাষণ পাঠকের আন্তরিক বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। বিদুর অনেক মার্জিত এবং সুবিবেচিত ভাষায় তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করতে লাগলেন, যদিও তিনি কখনই কপটতা থেকে মুক্তি পাননি। তথাপি, ধৃতরাষ্ট্র প্রতিনিয়তই মূর্ছিত হয়ে যেতে লাগলেন, এমনকি আত্মহত্যার চিন্তা থেকেও বিরত ছিলেননা। যাই হোক, নিজেকে সংযত করে, ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলের পুরনারীদের নিয়ে প্রেতকার্য সমাপনের উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে যাত্রা করলেন। পথে অশ্বত্থামার সঙ্গে দেখা হল। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা প্রদান করে বনে তপস্যার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

অল্পকাল পরেই যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ এসে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন। ধৃতরাষ্ট্র শান্তভাবেই পাণ্ডবদের গ্রহণ করলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে তিনি সর্ববিষয়েই তাঁদের বিধান মেনে নেবেন। গান্ধারীর হৃদয়ে পুত্রশোক অত্যন্ত প্রবল হলেও তিনি নিজেকে সংযত করলেন ; কিন্তু ভীমকে যথোচিত তিরস্কার না করে পারলেন

না। তিনি করুণকণ্ঠে বললেন—"তুমি আমাদের এতগুলি সন্তানের মধ্যে একজনকেও কি জীবিত অবস্থায় অবশিষ্ট রাখতে পারলেনা? সেই পুত্রই তো এই অন্ধের যষ্টিস্বরূপ হয়ে থাকত।" নিষ্ঠুর ভীমের অন্তরে হয়ত মাতৃহৃদয়ের এই করুণ উক্তি পুলকেরই সঞ্চার করেছিল, কেননা এতবড় হৃদয়হীন ব্যক্তি পাণ্ডু এবং কুরুকুলে আর কেউ ছিলেন না। এই শোকোচ্ছ্বাসে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ;—রমণীরা সকলেই কৃষ্ণের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন এবং এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাই সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভ করেছে, তাতে তাঁদের এতটুকুও সন্দেহ ছিলনা। তাঁরা শোকাবেগে যা যা বলেছিলেন তার প্রত্যেকটি কৃষ্ণ সম্বন্ধে অতি সত্য কথা।

যুদ্ধে মৃতগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলে কৌরবগণ ভাগীরথীতে স্নানের জন্য সমবেত হলেন। যখন সকলে মৃতগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করছেন তখন হঠাৎ কুন্তী তাঁর পুত্রদের বললেন—"পুত্রগণ যে মহাবীর কর্ণ অর্জুনের হাতে নিহত হয়েছেন, তোমরা তাঁর উদককার্য সম্পন্ন কর। যাঁকে তোমরা রাধাগর্ভজাত সূতপুত্র বলে নির্দেশ করতে তিনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; তিনি আমার পুত্র এবং তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।" এই অপ্রত্যাশিত সংবাদের পাণ্ডবপক্ষে একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কেউ বাহ্যতঃ শোকপ্রকাশ করেননি। এমনকি কেউ কোনও কৌতূহলও প্রকাশ করেননি। কুন্তী কর্ণের পিতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেননি এবং তার জন্য কেউ ঔৎসুক্যও প্রদর্শন করেননি। কর্ণের মৃত্যুর পর রণক্ষেত্রে সূত অধিরথ বা রাধাকেও দেখা যায়নি। সম্ভবতঃ আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। যুধিষ্ঠির মার কাছ থেকে এই সংবাদ শোনবার পর বলেছিলেন যে জনরবের মাধ্যমে তাঁর কানে এসেছিল যে কর্ণ কুন্তীর সন্তান এবং কুন্তী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাহ্ণে কর্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ; কিন্তু মার কাছ থেকে তিনি এসব কথার সত্যতা নির্ধারণ করে দেখেননি। কুন্তীও উপযাচিকা হয়ে তাঁদের কাছে এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করেননি। এতদিন বাদে যুধিষ্ঠির জানালেন যে এই সত্যটি যদি আগে প্রকাশ পেত তাহলে

এতবড় যুদ্ধ হয়ত আদৌ ঘটতনা। কিন্তু এগুলি সবই মৌখিক পরিতাপ মাত্র। যুধিষ্ঠির নিশ্চিতভাবে সব জেনেও জানতে চাননি, কারণ কন্যাবস্থায় মার গর্ভে যে সন্তান জন্মের পরে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন তাঁকে তিনিও অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি, পরন্তু একটা প্রবল ঘৃণার ভাবই তাঁকে কর্ণের কাছ থেকে বিযুক্ত করেছিল। যুধিষ্টির নিজেই কি কর্ণের চেয়ে বেশী কৌলীন্যের অধিকারী ছিলেন? তিনিও কার ঔরসে উৎপন্ন তা জানবার উপায় ছিলনা, তবে অনুমতিক্রমে নিয়োগের দ্বারা তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ;—এইটুকুই মাত্র তাঁর স্বপক্ষে বলা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত কেন যে কুন্তী কর্ণকে তাঁর সন্তান বলে স্বীকার করলেন, সেটা একটা প্রহেলিকার মত ঠেকে। প্রেতকার্যের সময় গান্ধারী কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কুন্তী অশ্রু বিসর্জন করেননি; উদকক্রিয়া তিনি নিজেও নিষ্পন্ন করতে পারতেন, কিন্তু তাও করলেননা; হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ছেলেদের কাছে এই সংবাদটি গোচর করবার কি আবশ্যকতা ঘটল,—তা সত্যই দুর্জ্ঞেয় স্ত্রীচরিত্রের নিদর্শন বলেই মনে হয়। যখন তিনি সত্যকে স্বীকার করলেন তখন কারুর মনের অবস্থা এমন ছিলনা যে কুন্তীকে এবিষয়ে প্রশ্নাদি করেন। মৃত্যুর পর মৃতের পরিচয় সম্বন্ধে আগ্রহ পোষণ করে একজন নারীকে কেউ পর্যুদস্ত করতে চাইবেননা, এইটি বুঝেই শেষ পর্যন্ত কুন্তী তাঁর পুত্রদের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। যাই হোক না কেন, এই মহাকাব্যে তাঁর চেয়ে কুমাতার নিদর্শন আর নেই। যুধিষ্টির মাকে কোনও প্রশ্ন না করলেও কুন্তী তাঁকে নিজে থেকেই বললেন—"বৎস, তুমি যে কর্ণের ভাই সেটা তাকে জানাবার জন্য আমি আগে অনেক চেষ্টা করেছিলুম। তাকে শত্রুতা থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যও অনেক উপদেশ দিয়েছিলুম কিন্তু কিছুতেই আমি কৃতকার্য হতে পারিনি। কর্ণ সেই সময় আমার সঙ্গে মিলিত হবার এতটুকু ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি বরঞ্চ তোমাদের বিরুদ্ধে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠল। আমিও কর্ণকে নিতান্ত অবাধ্য বিবেচনা করে তাকে উপেক্ষা করতে লাগলুম।" এই-

খানেও কুন্তী সত্য কথা বললেননা এবং কর্ণ কি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তাও ব্যক্ত করলেননা। কর্ণ তার অবাধ্য ছিলেন, এর চেয়ে অসত্য উক্তি আর কিছুই হতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে কর্ণ তাঁর কাছে যে বিনয় ও বাধ্যতা দেখিয়ে তাঁর পঞ্চপুত্রের প্রাণ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন, তা তাঁর অপর কোনও পুত্রের কাছ থেকেই তিনি আশা করতে পারতেননা। তার যে সন্তানকে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন সে যদি তাঁর মাতৃপরিচয়কে অস্বীকার করে, তাহলে তাঁর উপর দোষারোপ করা কোনক্রমেই সঙ্গত হতে পারেনা। মুখে যাই বলুন, কুন্তী কর্ণকে আন্তরিকভাবেই শ্রদ্ধা করতেন এবং সেটা প্রকাশ হল তাঁর এই জ্যেষ্ঠপুত্রের মর্মান্তিক নিধনের পরে। অপর পঞ্চপুত্রের তুলনায় তিনি কর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি যে শূন্যতা বোধ করেছিলেন, তা আর কোনভাবেই পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

প্রেতকার্য পরিসমাপ্ত হবার পর যুধিষ্ঠির কিছুটা সাময়িকভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন বটে কিন্তু শীঘ্রই মনোবল ফিরে পেলেন। পুরাণকার তাঁর বৈরাগ্য নিয়ে অনেকগুলি পাতায় বহু সান্ত্বনাবাক্যের অবতারণা করেছেন বটে কিন্তু যুধিষ্ঠির এমন কিছু অভিভূত হয়ে পড়বার মত লোক ছিলেননা। যদি তাই হতেন, তাহলে তিনি হৃতসর্বস্ব দুর্যোধনকে এত নিষ্ঠুরভাবে বধ করতেননা; তাঁকে মুক্তি দিতে পারতেন: কেননা দুর্যোধন বনবাসে যাবার সঙ্কল্প করেই শিবির পরিত্যাগ করেছিলেন। যিনি কর্ণকে নিজের ভাই জেনেও তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পর সোনার রথে চড়ে তাঁর মৃতদেহ দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন এবং রাত্রিতে পরম সুখে নিদ্রা যেতে পারেন, অথবা তাঁর পরম হিতকারী মাতুল শল্যের হৃদয়ে শক্তি নিক্ষেপ করে হত্যা করতে পারেন, তিনি আর যাই হোন, সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করবার লোক ছিলেননা। অতএব, ধৃতরাষ্ট্র যখন সবান্ধবে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি সেইখানেই নীতিগতভাবে অভিষেকটা সেরে নিলেন। হস্তিনায় গমনের সময় যুধিষ্ঠির একটি

শুভ্র রথে অধিষ্ঠিত হলেন; তার ওপর সুদৃশ্য কম্বল বিছানো হল। বন্দিরা তাঁকে ঘিরে পবিত্র মন্ত্র পড়তে লাগলেন, সুলক্ষণ শ্বেতবর্ণ ষোলটি বলীবর্দ তাঁর রথ আকর্ষণ করতে লাগল। ভীমসেন রথরশ্মি গ্রহণ করলেন, অর্জুন তাঁর মাথার ওপর সুশোভিত শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করলেন; নকুল, সহদেব দুটি শ্বেত চামর নিয়ে ব্যজন করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রসন্তান বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু একটি শ্বেতবর্ণের রথে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করতে লাগলেন। তাঁর পরেই বাসুদেব কৃষ্ণ স্বর্ণালঙ্কৃত শুভ্ররথে কৌরবদের অনুবর্তী হলেন, তাঁর সঙ্গে সাত্যকিও ছিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, রাজমাতা গান্ধারীর সঙ্গে মনুষ্যবাহিত যানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আগে আগে গমন করতে লাগলেন। তৎকালে তাঁদের মর্মবেদনা বোধ করি ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীরা বিবিধ যানে বিদুরের অনুগমন করতে লাগলেন। হস্তিনার সমগ্র পথ আগে থেকে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। বাড়িগুলি এবং তোরণসমূহ শ্বেতমাল্যে ও পতাকাদ্বারা সুশোভিত হয়েছিল। সমগ্র রাজমার্গ ধূপ এবং সুগন্ধে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নগরদ্বারে নতুন পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হয়েছিল এবং চারিদিক পুষ্পস্তবকে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। গৌরাঙ্গী কুমারীগণ পুরদ্বারে অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিল। এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর এতদিনের আকাঙ্খিত হস্তিনা নগরে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হয়ে প্রবেশ করলেন। সেই অভ্যর্থনার মধ্যে সহৃদয়তা কতখানি ছিল বলা যায় না, কিন্তু ভয় যে বিপুলমাত্রায় ছিল তা নিঃসংশয়েই অনুমান করা যেতে পারে।

যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজ সিংহাসন অধিকার করবার পর বহু ব্রাহ্মণ তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন; কিন্তু দুর্যোধনের বন্ধু অমাত্য চার্বাক্ তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—"মহারাজ, এই নগরে বহু ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা আপনাকে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিৎ রাজা বলে ধিক্কার প্রদান করছেন। এইভাবে জ্ঞাতিক্ষয় এবং গুরুজনদের বিনাশসাধন করে আপনার কি লাভ হল? এখন আপনার মৃত্যুই

শ্রেয়, আপনার জীবনধারণ করবার আর প্রয়োজন নেই।" এই উক্তিতে যুধিষ্ঠিরের অনুরক্ত এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি উত্তেজনা দেখা দিল। যুধিষ্ঠির চার্বাকের প্রশ্নের সহসা কোনও উত্তর দিতে পারলেননা; ঈষৎ লজ্জিতভাবে তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন,—"হে বিপ্রগণ, আমি প্রণামপূর্বক আপনাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আমার প্রাণধারণের কাল আর বেশীদিন নেই, আপনারা আর আমাকে ধিক্কার প্রদান করবেননা।" তখন তাঁর পক্ষের ব্রাহ্মণগণ বললেন,—"মহারাজ, আমরা আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিনি, আপনার মঙ্গল হোক। কিন্তু, যে ব্যক্তি আপনাকে কটু বাক্য বলেছে সে দুর্যোধনের পরম বন্ধু অমাত্য চার্বাক্। আমরা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবনা, সুতরাং আপনার কিছুমাত্র শঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার ভ্রাতাদের সঙ্গে কল্যাণভাজন হয়ে থাকুন।" তারপর সেই ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হয়ে সেইখানেই চার্বাকের প্রাণনাশ করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই হত্যায় আহ্লাদ প্রকাশ করে তাঁর অনুবর্তী ব্রাহ্মণদের সম্মান দেখাতে লাগলেন।

এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রমাণিত হয় যে দুর্যোধন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ তাঁর শাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যেভাবে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনকে ও অপরাপর কৌরবদের বধ করে-ছিলেন, সেটি তাঁরা আদৌ সমর্থন করেননি। বলতে গেলে পাণ্ডবেরা কখনই হস্তিনার ওপর আধিপত্য করেননি। মহারাজ পাণ্ডু দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটিয়েছিলেন এবং প্রবাসেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেই সময় রাজ্য চালিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। সেই থেকেই তিনি "মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র" আখ্যায় পরিচিত হন। তারপর সিংহাসন অধিকার করেন দুর্যোধন। তিনিও অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন রাজা ছিলেন। মধ্যবর্তীকালে কিছু-দিনের জন্য যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে আবার সমগ্র অঞ্চলের শাসনভার দুর্যোধনের ওপরেই এসে পড়েছিল। অতএব, দীর্ঘকাল ধরে লোকে কৌরব রাজত্বে

সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছিলেন। সহসা একটা যুদ্ধ এসে যে প্রচণ্ড-ভাবে শান্তিভঙ্গ করল এবং অগণিত প্রজার ধ্বংসসাধন হল এটা স্বাভাবিকভাবে দেশবাসীর মনে একটা বড় রকমের বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত একটা রক্ষা হবে, কিন্তু তা হলনা, সমগ্র দেশকে একটা বিরাট বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হতে হল। যুদ্ধ যদিও হয়েছিল কেবলমাত্র কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে কিন্তু তার জন্য যে প্রচণ্ড অর্থব্যয় হয়েছিল, সেটি তো বহন করতে হয়েছিল প্রজাসাধারণকেই। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত হয়েছিল। যুদ্ধ অল্পদিন স্থায়ী হলেও তার আয়োজন সম্পর্কিত ব্যয়ের পরিমাণটা মোটেই অল্প ছিলনা। সাধারণের মধ্যে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে পাণ্ডবেরাই দীর্ঘকাল আড়ালে থেকে হঠাৎ রাজ্যলাভের বাসনায় এই অশান্তির সৃষ্টি করেছিলেন। সঞ্জয় যখন যুধিষ্ঠিরের কাছে দূত হয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি প্রজাদের এই মনোভাবকেই ব্যক্ত করেছিলেন। অতঃপর যুদ্ধকালে পাণ্ডবগণ যেভাবে কৌরবপক্ষের মহামান্য ব্যক্তিদের ধ্বংস-সাধন করেছিলেন সেটাও তাঁরা সমর্থন করেননি। দ্রোণ এবং কর্ণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সর্বোপরি দুর্যোধনের নীতিবিগর্হিত নিষ্ঠুর হত্যা এবং তাঁকে বর্বরভাবে অরণ্যপ্রান্তে অরক্ষিত অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখে ফেলে রাখাকেও তাঁরা পৈশাচিক ব্যবহার বলে গণ্য করেছিলেন। কৌরবসম্রাট দুর্যোধনকে প্রজারা তখনকার আদর্শে দেবতার পর্যায়েই দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। আহত সম্রাটের প্রতি একটা রাজোচিত আচরণ অন্ততঃ তাঁরা আশা করেছিলেন। দুর্যোধন, কর্ণ—এঁরা প্রজাদের আপনজন ছিলেন এবং এঁরাই ছিলেন কুরু-শাসনের প্রতীক। এঁদের তুলনায় যুধিষ্ঠির নিতান্ত স্বল্প পরিচিত ছিলেন এবং প্রজাসাধারণের ওপর তাঁর কোনও প্রভাবই ছিলনা। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের রাজ্য ভাগ দাবী করেছিলেন। দুর্যোধনের মৃত্যুর পর তিনি স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিলেন যে তিনি হস্তিনার উত্তরাধিকারী। যুযুৎসু বৈশ্যাগর্ভে জন্মগ্রহণ

করলেও তিনি ন্যায়তঃ ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান। তাঁর দাবী একেবারে উপেক্ষিত হবার মত ছিলনা। যাই হোক, এসম্বন্ধেও একটা ন্যায়-সঙ্গত আলোচনা তাঁদের ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে করা উচিত ছিল। তাঁরা যদি পূর্ব শর্তের সূত্র ধরে একটা সন্ধি করতেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধ-বাদীরা এতটা সোচ্চার হতে পারতেন না। কিন্তু তাঁরা একান্তভাবে বলপূর্বক কৌরব সিংহাসন দখল করে বসলেন। যুদ্ধের সময় তাঁরা একবারও ভাবেননি যে কৌরবনায়কদের নিধনকে প্রজসাধারণ কি দৃষ্টিতে দেখবেন। তাঁরা প্রজাদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন, শ্রদ্ধার সঞ্চার করেননি এবং সে চেষ্টাও তাঁদের ছিলনা। অপরপক্ষে দুর্যোধন প্রজাদের বাদ দিয়ে কোনও কথা ভাবতেননা; তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রজাপালনের কথা ব্যক্ত করে গেছেন।

এই চার্বাক্ নামক ব্রাহ্মণ যে কে তা আমরা জানিনা, হয়ত তিনি চার্বাক্‌পন্থী দার্শনিক ব্রাহ্মণদের প্রধান ছিলেন। চার্বাক্‌দের মতবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুকূলে ছিলনা এবং যজ্ঞাদির নামে ব্রাহ্মণেরা যে অর্থ সংগ্রহ করতেন তা তাঁরা অনুমোদন করতেননা। এই কারণে অধিকাংশ তথাকথিত ব্রাহ্মণ তাঁদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন সবাইকেই সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি তাঁর বন্ধু অমাত্য চার্বাকের নাম স্মরণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনায় কৃষ্ণ একবারও এগিয়ে আসেননি; কারণ বহু ব্রাহ্মণ তাঁকেও সহ্য করতে পারতেন না।

অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে রাজসভায় অভিষেক সম্পন্ন হল। পুরোহিত ধৌম্য শাস্ত্রানুসারে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত সর্বতোভদ্র আসনে যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণাকে অধিষ্ঠিত করে মন্ত্রাদি উচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতে লাগলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রজাদের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে নিজে শঙ্খধ্বনি করে সেই জলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করলেন। এরপর যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রশাসনের ব্যবস্থা নির্ধারণ করলেন। ভীমসেন যৌবরাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বিদুর মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কাজের ভার নিলেন। সঞ্জয়

কার্যাকার্য পরিজ্ঞান এবং আয়ব্যয় নিরূপণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নকুলকে সৈন্যের পরিমাণ, তাদের বেতন, কার্যপরীক্ষা প্রভৃতির ভার দেওয়া হল। অর্জুন শত্রুসৈন্যের আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা এবং দুষ্টনিগ্রহের জন্য নিযুক্ত হলেন। সহদেব শরীররক্ষা, অর্থাৎ স্বাস্থ্য-বিষয়ক উপদেষ্টা হলেন। ধৌম্যকে ব্রাহ্মণদের বিষয় ও দৈবকার্যাদির অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার দেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে, সূত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কটুভাষণের পুরস্কার স্বরূপ মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু, যিনি ভ্রাতৃপক্ষ পরিত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগদান করেছিলেন, তাঁকে কোনও পদ দেওয়া হলনা। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির তাঁকে আপাততঃ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করলেন না। এই যুযুৎসু সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। মহাভারত কেবল এইটুকুই জানিয়েছেন, যে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বৈশ্যার গর্ভে উৎপাদন করেন। সেই বৈশ্যার বিস্তৃত পরিচয় এবং যুযুৎসুর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের পিতা হিসাবে কতখানি সম্পর্ক ছিল, তাও কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের সময় যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যে যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড-প্রদানের অধিকারী ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল, কারণ ধৃতরাষ্ট্রের অপর কোনও পুত্রই জীবিত ছিলেননা। এটা বেশ বোঝা যায় যে ক্ষত্রিয়ের ঠিক পরবর্তী বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতে তিনি কুরুকুলের আনুকূল্য লাভ করেননি। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে পুত্র বলে স্বীকার করলেও, প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। গান্ধারী স্ত্রীলোকসুলভ স্বভাববশতঃ এই অপেক্ষাকৃত নীচ জাতীয় সন্তানকে পুত্রস্নেহ প্রদান করেননি এবং তাঁর পুত্র দুর্যোধনও নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব প্রদর্শন করেননি। এই সব কারণেই যুযুৎসুর অন্তরে কৌরবদের প্রতি শ্রদ্ধা বা প্রীতি ছিলনা এবং যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ পাবামাত্র তিনি অপরপক্ষে যোগদান করলেন। অবশ্য যুধিষ্ঠিরের প্রতিও যে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল এমন নয়, কেবল তিনি যে অবহেলার জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন, তারই অভিব্যক্তি তাঁর এই

আচরণ প্রকাশ পায়। তিনি যুদ্ধকেও এড়িয়ে গিয়েছিলেন, উভয়-পক্ষের কোনও দিকেই তাঁর যুদ্ধ করবার আগ্রহ ছিলনা; তাই শেষ পর্যন্ত তিনি জীবিত রয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে তাঁর পিতার কাছে যখন তিনি ফিরে গেলেন তখনও যে তিনি পুত্রের উপযুক্ত ব্যবহার পেয়েছিলেন এমন নয়। যুধিষ্ঠির এই সব নানা চিন্তা করেই যুযুৎসুকে কোনও পদ প্রদান করেননি। অবশ্য এ চিন্তাও তাঁর মনে ছিল যে, ধৃতরাষ্ট্রের যে সন্তান দল পরিত্যাগ করতে পারে, সে পরবর্তীকালে তাঁর বিপক্ষেও যেতে পারে। অতএব, শেষ পর্যন্ত তিনি যুযুৎসুকে রাজপদ থেকে বাইরে রাখবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন। তথাপি, মহাপ্রস্থানের পথে যাবার সময় তিনি যুযুৎসুর ওপরেই পরীক্ষিতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন; ততদিনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে যুযুৎসু পাণ্ডবের বিরুদ্ধাচরণ করবেননা। কিন্তু যাতে কোনও গোলযোগ না ওঠে সেই জন্য তিনি পরীক্ষিতের অভিষেকও নিষ্পন্ন করে গিয়েছিলেন। যুযুৎসু তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করছিলেন এবং তাঁর চরিত্রে লোভাতুরতা কোনদিনই প্রকাশ পায়নি। কেবলমাত্র জন্মসূত্রে তিনি যে অবহেলা পেয়ে এসেছিলেন তাঁর আচরণে তিনি সেই ক্ষোভটুকুই প্রকাশ করেছিলেন।

অতঃপর অর্জুন দুঃশাসনের ভবন অধিকার করলেন এবং নকুল, সহদেবও দুর্যোধনের অপর দুই সহোদরের গৃহে অধিষ্ঠিত হলেন। শুধু গৃহই পেলেননা, তাঁদের যে সমস্ত সুন্দরী দাসী ছিল তারাও তাঁদের দখলে এল। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে লাভবান হলেন বিদুর। দাসীপুত্র হওয়াতে তাঁর যে ক্ষোভ ছিল, তার প্রতিশোধ তিনি পাণ্ডব-কৌরবের ভেদনীতিতে পুরোপুরি মিটিয়েছিলেন। অথচ পূর্বেও তিনি যে রকম ছিলেন পরেও সেরকমই রয়ে গেলেন। বিদুর যদি জ্যেষ্ঠা কৌরববধূ অম্বিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত রাজ্য তিনিই পেতেন; কিন্তু কেবলমাত্র রাণীর বিরূপতার এবং প্রবঞ্চিত ব্যাসের প্রবৃত্তিচরিতার্থতায় তাঁকে শূদ্রের ন্যায়

কালাতিপাত করতে হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্রের শত্রুতা গোপন থাকেনি, কিন্তু বিদুর তাঁর পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ নিজের অন্তরে লুকিয়ে রেখে সমগ্র কুরুকুল যাতে বিনষ্ট হয় তার চেষ্টা করেছিলেন। জতুগৃহ দাহ থেকে তিনি পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন কারণ কেবলমাত্র পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হলে অপরপক্ষের কোনও ক্ষতিসাধন তিনি করতে পারতেননা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা অবস্থায় উভয় গোষ্ঠীকে আনা যাতে দুই পক্ষই সমূলে বিনষ্ট হয়। দুই পক্ষের মধ্যে তিনি পাণ্ডবদের প্রতি বেশী অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন কারণ তাঁদের তিনি ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারতেন। দুর্যোধন তাঁর মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ না বুঝলেও তিনি যে একটি অহিতকর উপাদান তা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। অতএব, বিদুর দুর্যোধনকে ভয় পেতেন এবং তাঁর পক্ষে যেতে চাননি। হতভাগ্য অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি এইটুকু জানতেন যে বিদুর পাণ্ডবদের পক্ষপাতী; কিন্তু তিনি যে সমগ্র কৌরবকুলেরই সর্বনাশ চেয়েছিলেন তা বোঝাবার মত সুদূরপ্রসারী বুদ্ধি তাঁর ছিলনা।

পাণ্ডবেরা রাজ্যশাসানে প্রবৃত্ত হবার পর কৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন যে এবার তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন— "মহারাজ, তোমাদের সঙ্গে আমি বহুকাল অতিবাহিত করলাম। এতদিন পর্যন্ত আমার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি; অতএব এবার আমি দ্বারকায় ফিরে যেতে চাই। তুমি আমার দ্বারকা-যাত্রায় অনুমোদন কর"" যুধিষ্ঠির এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন; তবে বলললেন যে তাঁর একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার ইচ্ছা আছে, তখন যেন তিনি আর একবার আসেন। কৃষ্ণ কিছু দিনের মধ্যেই যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেললেন; তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে রথে উঠে বসলেন। রথ আগে থেকেই যুধিষ্ঠিরের দেওয়া বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ ছিল। দারুক রথ চালাতে লাগলেন। পণ্ডবপন্থী অনেকেই কৃষ্ণকে হস্তিনা

থেকে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

এইবার পাণ্ডবপক্ষ থেকে কৃষ্ণের তিরোভাব ঘটল। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের সংসর্গ কি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল তা বোঝা কঠিন। পাণ্ডবমাতা কুন্তী ছিলেন তাঁর নিজের পিসি; সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হয়েছিল। এই দুটি আত্মীয়তার সূত্রে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই আত্মীয়তা এমন নয় যে তিনি তাঁদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে লিপ্ত হতে পারেন। কেউ তাঁকে আহ্বান করেও আনেনি; তিনি নিজে থেকেই তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। যাই হোক, তিনি যে অতিমাত্রায় অনাধিকার চর্চা করেছিলেন সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি কিন্তু কোনদিক দিয়েই ভাল করতে পারেননি অথচ ধ্বংসের দিকে প্রচুর সহায়ক হয়েছিলেন। তাঁর সক্রিয় অবস্থানকালে অভিমন্যু নিহত হল এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চাল-দের হত্যার জন্যও তিনি অনেকখানি দায়ী। তিনি যদি কৌরবশিবিরের বহির্দেশে পাণ্ডবদের অবস্থান করবার উপদেশ না দিতেন তাহলে এটা ঘটতনা। কি কারণে যে তিনি তাঁদের লুণ্ঠিত জনশূন্য শিবিরের বহির্দেশে থাকতে বলেছিলেন তাও বোঝা যায়না। তাঁর প্ররোচনাতেই দুর্যোধন অন্যায় যুদ্ধে হত হন। কর্ণবধে শল্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্রেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল যার জন্য তাঁর চারদিকে একটা বিরাট চক্র গড়ে উঠেছিল। ভয়াবহ চক্রান্ত-কারিতার জন্য তাঁকে সকলেই ভয় পেতেন। মহাভারতে দেখা যায় তিনি যেমন বহু ব্যক্তির শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন সেইরকম বিপুলসংখ্যক লোকের অশ্রদ্ধাও অর্জন করেছেন। প্রত্যেক যুগেই এইরকম এক একটি ব্যক্তি দেখা যায় যিনি লোকের মনে অনন্য সাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন, তারপরে তাঁর পতন ঘটে। কৃষ্ণের জীবনে ঠিক এমনটাই ঘটল। কুরুকুলের ক্ষয় হলে তাঁর নিজের কুলও সমূলে উৎপাটিত হল। কেবল ক্ষয় ও ক্ষতিসাধন ভিন্ন কোনও গঠনমূলক কাজে তাঁর কোনও উৎসাহ দেখা যায়নি। প্রথমে জরাসন্ধ ও শিশুপালকে বধ করে তিনি পাণ্ডবদের বিপক্ষে একদল রাজন্যের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন; পাণ্ডব-

দের দূত হয়ে কুরুসভায় গিয়ে তিনি দুর্যোধনের অবমাননা করে তাঁকে যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে ফিরে এসেছিলেন; সন্ধির বিপক্ষে যতটা পারা যায় ততটাই তিনি করে এসেছিলেন। পাণ্ডবদের জয়লাভে তাঁর নিজের কোনও লাভই হয়নি, বরঞ্চ যাদবদের মনে প্রচুর তিক্ত-তার সঞ্চয় হয়েছিল। তাঁর ভাই বলদেব তার কোনও কাজই অনু-মোদন করেননি। অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধন নিহত হবার ঘটনায় তিনি এতদূর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে ভাইয়ের সঙ্গে আর প্রায় সম্বন্ধই রাখেন নি। যাদবগণ এই যুদ্ধে যোগদান করুক এটা তাঁর একেবারেই অভি-প্রেত ছিলনা এবং কৃষ্ণ যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কাজ করলেন তখন তিনি একেবারে সকলের সংস্রব পরিত্যাগ করে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেলেন। তবে বলদেবের চরিত্র অনেকটা ধৃতরাষ্ট্রের মত ছিল; তিনি জোর করে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে পারেননি, যেটা তাঁর কর্তব্য ছিল। কৃষ্ণকে কুরুপাণ্ডবের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে দেওয়াটা কোনক্রমেই উচিত হয়নি; এটা যাদবদেরই কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাঁরা এতটা দার্পিত ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়েই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং সাত্যকিকে নিবৃত্ত করতে পারলে উভয় পক্ষের এই বিষাদময় পরিসমাপ্তি ঘটত না।

নয়

যুধিষ্ঠির এইবার ব্রাহ্মণদের উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হলেন। সদ্যসদ্যই যাঁর কুলক্ষয় ঘটেছে এবং অধীনস্থ রাজন্যবর্গও বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেক্ষেত্রে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে মেতে ওঠা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগে। কিন্তু, এবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের মনে কোনও দ্বিধা জেগে-ছিল বলে মনে হয় হয়না। পরীক্ষিতের জন্মের পরেই যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হল। যথাকালে তিনি যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত হলেন। যজ্ঞের অশ্ব উন্মোচিত হল এবং অর্জুন তাকে রক্ষা করতে করতে

অগ্রসর হলেন। এই প্রসঙ্গে আর একদফা অর্জুনের দ্বিগজয় কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে যা বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত। যজ্ঞের অশ্ব সেই সুপ্রাচীন যুগে প্রাগজ্যোতিষ দেশে বা মণিপুরে যে যায়নি এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অশ্বমেধের ঘোড়া কখনই খুব দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে সক্ষম হতনা। এটি বীরত্বের প্রতীকসূচক একটি কর্তব্য মাত্র। সুলক্ষণযুক্ত একটি অশ্ব নিকটবর্তী কয়েকটি অঞ্চল ঘুরে যথাস্থানে ফিরে আসত। সমগ্র মহাদেশের বৃহৎ নদী, নালা, অরণ্য-দেশ পেরিয়ে একটি অশ্ব যোজনের পর যোজন পথ অতিক্রম করবে, এটি নেহাৎ রূপকথাতেই সম্ভব হতে পারে।

যুধিষ্ঠির চৈত্রপুর্নিমায় যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। হস্তিনায় এই উদ্দেশ্যে যজ্ঞকার্যের উপযুক্ত স্থান পূর্বেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেই স্থান বিশুদ্ধ কাঞ্চনে মণ্ডিত করা হয়। তারপর স্থপতিগণ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ অনুযায়ী এই ভূমির অন্যান্য স্থানে নানারকম মণি-ময় কুট্টিমযুক্ত প্রাসাদ তৈরি করেন, যেগুলিতে আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। এ ছাড়া বিচিত্র স্তম্ভ, বৃহৎ তোরণ প্রভৃতি তো সর্বত্রই ছিল। বলা বাহুল্য, কোনটিই আত্মীয়বধজনিত যুধিষ্ঠিরের মনোকষ্টের পরিচায়ক নয় এবং এটিও বোধ করি বলা বেশী হবে যে নিমন্ত্রিত রাজগণ আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, নতুবা হৃতসর্বস্ব হয়ে তাঁদের যজ্ঞীয় উৎসবে যোগ দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না। এবারেও যজ্ঞস্থলে কৃষ্ণ এবং যদুবংশীয়েরা ও বৃষ্ণিগণ আধিপত্য বিস্তার করলেন, কেননা তাঁরা ছাড়া পাণ্ডবদের তেমন উৎসাহী বন্ধু আর কেউ ছিলেননা। যজ্ঞ যথারীতি সম্পুর্ণ হল এবং ব্রাহ্মণগণ প্রচুর দান পেয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিতুষ্ট হলেন। আসলে এই কারণেই তাঁরা এই যজ্ঞের উদ্যোক্তা হয়েছিলেন। সমাগত রাজন্যবর্গের যে তেমন উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এমন প্রমাণ পুরাণকারের বর্ণনা সমূহে পাওয়া যায় না।

যুধিষ্ঠির নাকি ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এটা কতখানি ঠিক বলা শক্ত; কারণ তাঁরা যখন মহাপ্রস্থান করেন তখন পরীক্ষিৎ

এত অল্পবয়স্ক ছিলেন যে যুযুৎসুকে তাঁর অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করে যেতে হয়। অতএব কুরুক্ষেত্রের পরবর্তীকালে খুব অধিক দিন যে যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেছিলেন এমন মনে হয়না। যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে অন্ধরাজ ও রাজমাতা গান্ধারীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন কিন্তু ভীমসেনের ব্যবহার ছিল ঠিক তার বিপরীত। তিনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই পরোক্ষে নানাভাবে ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করতেন। একদিন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শুনিয়ে শুনিয়েই তিনি বন্ধুদের বলতে লাগলেন,— "বন্ধুগণ, এই যে দুটি বাহু দেখছ এর কবলে পড়েই দুরাত্মা দুর্যোধন আর তার ভাইরা প্রচুর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। এই দুটো বাহুই আমাকে কৌরবদের শেষ করবার শক্তি জুগিয়েছে।" কথাটা অন্ধরাজ এবং তাঁর মহিষীর বুকে শেলের মত বাজল। তিনি সভায় মান্যব্যক্তিদের এই কথা জানিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, তোমরা সকলেই জান কিভাবে আমার বংশের সকলেই নিহত হয়েছেন। এসম্পর্কে আমার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিনা; কিন্তু পিতা হয়ে আমি পুত্র-স্নেহকে বিসর্জন দিতে পারিনি। আজ সেই পুত্র নেই সর্বহারার যে দুঃখ তা আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে, জীবনে আমার আর কোনও আকর্ষণ নেই, আমি দিনের শেষ প্রহরে অথবা রাত্রে অতি সামান্য আহার করি। প্রতিদিন আমি ভূমিতলে কেবলমাত্র মৃগচর্মের ওপর কুশ বিস্তৃত করে শয়ন করি। সারা রাত আমার জপ করেই অতিবাহিত হয়। তবে, এটা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলব যে যদিও আমার সন্তানেরা সকলেই নিহত হয়েছে, তথাপি তারা ন্যায় যুদ্ধে ক্ষত্রিয়-ধর্মানুসারে মৃত্যুবরণ করছে। তাদের এই বীরোচিত মৃত্যুতে আমি গর্বিত।" তারপরে তিনি যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে বললেন,—"বৎস তোমার মঙ্গল হোক, তুমি আমাদের যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেছ, তার জন্য আমরা পরম কৃতজ্ঞ। তবে, আমার মনে হয় এখন আমার এবং গান্ধারীর পক্ষে বনেগমন করাই কাম্য। তুমি আমাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান কর।" যুধিষ্ঠির এতে খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন, কারণ ধৃতরাষ্ট্র যে এতটা

কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তা তিনি জানতেননা। তবে, ভীমকে তিনি একবারও তিরস্কার করলেননা।

শেষ পর্যন্ত ধৃতররাষ্ট্র এবং গান্ধারী বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তাঁদের সঙ্গে বিদুর এবং সঞ্জয়ও যাবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। যাবার আগে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধে নিহত আত্মীয়বর্গ এবং পুত্রদের শ্রাদ্ধ সম্পাদনের জন্য যুধিষ্ঠিরের কাছে কিছু ধন প্রার্থনা করেন। বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের এই কামনার কথা জ্ঞাপন করলেন। এই কথা শোনবামাত্র যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন প্রার্থিত ধনপ্রাদনে সম্মতি প্রদান করলেন; কিন্তু ভীম কুৎসিৎভাষায় এর বিরুদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করতে লাগলেন। তিনি অর্জুনকে বললেন—"আমার মতে দুর্যোধনের ঊর্ধ্বদৈহিক কাজ করাই বিধেয় নয়। আমাদের শত্রুদের কোনও সন্তোষবিধান করাটাই কর্তব্য নয়। দুর্যোধনের মত যেসব কুলাঙ্গার এই পৃথিবীকে উৎসন্ন করেছে তারা পরলোকেও ঘোরতর ক্লেশ পেতে থাকুক। আমরা যখন বনবাসে যাচ্ছিলুম তখন ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় আত্মগোপন করেছিল? যখন আমরা বর্ণনাতীত কষ্টে দিন যাপন করেছি তখন তাঁর পিতৃস্নেহ কোথায় অবলুপ্ত হয়েছিল? এই দুরাত্মা অন্ধরাজই যে পাশা খেলায় সময়—আমাদের কি লাভ হল, বলে বার বার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তা কি তুমি একেবারে বিস্মৃত হয়েছে? আমরা নিজেরাই এই শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করতে পারি, এর জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।" সর্বতোভাবে পর্যুদস্ত. শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ কৌরবপ্রধানের প্রতি এই নিষ্ঠুর বাক্যগুলি শুনে অর্জুন বললেন—"আপনি আমায় বড় ভাই এবং গুরুজন, তথাপি আমার এইটুকুই বক্তব্য যে ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পূজ্য। সাধু ব্যক্তিরা অন্যের অনুষ্ঠিত অপকার স্মরণ না করে উপকারই স্মরণ করে থাকেন।" যুধিষ্ঠির বিরক্ত হয়ে ভীমকে কোনও উত্তর না দিয়ে বিদুরকে বললেন, —"আপনি আমার আদেশ অনুসারে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলবেন যে তিনি পুত্র ও বান্ধবদের শ্রাদ্ধের জন্য যে পরিমাণ ধন দিতে ইচ্ছা করেন তা আমার কোষ থেকে গ্রহণ করুন; কারুর তাতে বিরক্ত

হবার হেতু নেই।" ভীম অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে দুই ভাই-এর দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন যুধিষ্ঠির আবার বিদুরকে বললেন—"আপনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করবেন, তিনি যেন ভীমের বাক্য শুনে রুষ্ট না হন। অরণ্যবাসের সময় সে যে পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে তা ভুলতে পারছেনা বলেই এই সব কটূক্তি তার মুখ থেকে বেরিয়েছে। আপনি আমার কথামত তাঁকে বলবেন, তাঁর যে যে দ্রব্য যত পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সবটুকুই যেন তিনি আমার ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করেন। ভীমের অহঙ্কার তিনি যেন উপেক্ষা করেন। তাঁর যা ইচ্ছা হয় ব্রাহ্মণদের তা দান ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে তিনি পুত্র ও বান্ধব-দের কাছে ঋণমুক্ত হোন। আমার ধনের কথা দূরে থাকুক আমার শরীরও তাঁরই একান্ত অধীন।" বিদুর এই সব কথাই ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এটা কিছু নতুন মনে হল না। তিনি তখন এসব কটূক্তি সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রাদ্ধ ও দানকার্যাদি সমাপ্ত হলে কার্তিকী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনের জন্য প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পাণ্ডবেরা তাঁর কাছে এসে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। যথোচিত মাঙ্গলিক কার্যাদি শেষ হলে বল্কলাজিন পরিধান করে তিনি গান্ধারীর সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ করলেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন বিদুর এবং সঞ্জয়। এইখানে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। সহসা কুন্তীকেও দেখা গেল, তিনি বনগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীকে পরম স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তখন একদিকে কুন্তী ও অপরদিকে গান্ধারী তাঁর দুই হাত তাঁদের দুই কাঁধে তুলে নিলেন। পৌরজনেরা সকলেই বিশেষ শোকাকুল-চিত্তে এই যাত্রা দেখবার জন্য রাজমার্গে এসে সমবেত হলেন। ক্রমে সুবিস্তীর্ণ রাজপথ শেষ হয়ে গেল। হস্তিনার পুরদ্বার অতিক্রম করে ধৃতরাষ্ট্র অনুগামী ব্যক্তিদের ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। যুধিষ্ঠির কুন্তীকে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য সকাতর অনুরোধ জানালেন; কিন্তু কুন্তী আর ফিরলেননা। তিনি বললেন—"আমার মত অভাগ্যবতী

আর কেউ নেই। কর্ণের এইভাবে মৃত্যুর পরও আমার হৃদয় যখন বিদীর্ণ হচ্ছেনা তখন বুঝলাম আমি পাষাণে পরিণত হয়েছি। আগে যখন তোমাদের কাছে আমি তার পরিচয় প্রদান করিনি তখন তার নিধনের জন্য আমি আমাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করছি। যাই হোক, এখন আর কিছুমাত্র প্রতীকারের সম্ভাবনা নেই। আমি বনে গিয়ে তপোনুষ্ঠান করে তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং মহিষী গান্ধারীর সেবা করব।" যাবার আগে তিনি বার বার যুধিষ্ঠিরকে বলে গেলেন যে মাদ্রীপুত্রদের প্রতি যেন কোনরকম তাচ্ছিল্য না হয়। মর্ম পীড়িতা কুন্তী এইভাবেই তাঁর শেষ প্রায়শ্চিত্তের পথ বেছে নিলেন।

এইখানে আরও দুজনের কার্যধারা একটু আশ্চর্য ঠেকে, একজন বিদুর এবং অপরজন সঞ্জয়। বিদুর তখনও মন্ত্রীপদে বিরাজ করছিলেন; তাঁর উদ্দেশ্যও সাধিত হয়েছিল। অতএব, তাঁর বনগমনের হেতু ছিলনা। কিন্তু, একদা যে পাণ্ডবগণ তাঁর হাতের ক্রীড়নক ছিলেন তাঁরা রাজ্য পাবার পর আর সেরকম ছিলেননা। তিনি নামেই মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর ক্ষমতা সামান্যই ছিল এবং তাঁর আশঙ্কা ছিল একদিন তিনি অপমানিত হয়ে অপসারিত হবেন। এই কারণে তিনি বার্ধক্যে বনগমন শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন। তাছাড়া, তাঁর চক্রান্তের বিষময় ফল দেখে তাঁর নিজের অন্তরেও একটা অনুশোচনার উদয় হয়েছিল। সঞ্জয়ের পাণ্ডবসভা পরিত্যাগের কারণ অন্যরকম। তিনি কোনদিন পাণ্ডবদের স্বপক্ষে কাজ করেননি; এখনও তাঁদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না। বিশেষ করে দুর্যোধনের শেষ উপদেশ তিনি মনে রেখেছিলেন। পাণ্ডবদের নৃশংসতার ফলে দুর্যোধনের করুণ মৃত্যু তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে ভাগীরথীর তীরে কিছুকাল অবস্থান করলেন, তারপর সেখান থেকে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। সেখানে তাঁরা রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। নিরন্তর আত্মপীড়নে তাঁদের শরীর ক্ষয় হয়ে আসতে লাগল; বিশেষ করে বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গেলেন। বিদুর

ততোধিক কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিজেকে তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন।

এদিকে কুরুবৃদ্ধেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার পর যুধিষ্ঠির কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেননা। আসলে শেষ সময়ে দুর্যোধন যা বলে গিয়েছিলেন তাই ঘটেছিল। আত্মীয়স্বজন সকলেই যুদ্ধে নিহত হওয়াতে একটা বিপুল শূন্যতা হস্তিনার বিরাট রাজপুরীতে হাহাকার জাগিয়ে তুলছিল। যুধিষ্ঠির এইবার নিজেকে অপরাধী ভাবতে লাগলেন! হয়ত তাঁরই দোষে এই কুলক্ষয় সংঘটিত হল। কিছুতেই স্বস্তিলাভ করতে না পেরে তিনি একদিন প্রস্তাব করলেন যে প্রব্রজ্যায় প্রস্থিত ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে এলে ভাল হয়। সকলেই তাতে সম্মতি দিলেন। তাঁরা বেশ সমারোহের সঙ্গেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। বনবাসী আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এতটা রাজাড়ম্বরের কোন প্রয়োজন ছিলনা; কিন্তু পাণ্ডবগণ কুরুবৃদ্ধদের কতটা ভালবাসেন সেইটা দেখাবার জন্যই বহু পুরবাসী এবং সৈন্য সামন্ত নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এসে পৌঁছেলেন। সেখান থেকে তাঁরা যমুনা নদী পেরিয়ে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। যখন তাঁরা আশ্রমে প্রবেশ করলেন তখন ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, গান্ধারী এবং কুন্তী যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরেরা সেইখানেই গিয়ে জ্যেষ্ঠদের চরণবন্দণা করলেন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত প্রীত হয়ে পরস্পরকে সম্ভাষণ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁরা সকলেই যথোচিত শিষ্টাচার আদানপ্রদানের পর সেইখানে বিশ্রাম করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁদের সব সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র জানালেন যে বিদুর অনাহারে অতি শীর্ণ হয়ে অন্যত্র ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করছেন। তাঁকে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক এমন সময় বহু জনসমাগম দেখে বিদুর একবার সেই স্থলের অনতিদূরে এসে দাঁড়িয়েই আবার আত্মগোপন করলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। ক্ষণকালের জন্য উভয়ের দেখা হল ; কিন্তু বিদুর কোন কথা বলতে পারলেননা। বস্তুতঃ তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্য এইটুকু পরিশ্রমও সহ্য করতে পারলেন না। যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতিতেই তাঁর মৃত্যু হল। তিনি যতিধর্ম অবলম্বন করেছিলেন বলে তাঁর দেহ দগ্ধ করা হলনা, সেইভাবে তাঁর অস্থিচর্মসার দেহ ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে গেল। এইভাবে তাঁদের একজন চলে গেলেন।

অতঃপর আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। নিভৃত আশ্রমে পুরাতন আত্মীয়স্বজনদের কথা স্মরণ করে সর্বহারা স্ত্রীলোকদের শোক দুর্বার হয়ে উঠল। তাঁদের অনেকেই জীবন অসহ্য বোধ হওয়াতে সেইখানেই নদীতে আত্মবিসর্জন দিয়ে শোকভার থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। রাজা যুধিষ্ঠির আবার জ্যেষ্ঠদের কাছে বিদায় গ্রহণ করে বহু আত্মীয়াকে বিসর্জন দিয়ে শূন্যমনে হস্তিনায় ফিরে এলেন।

তাঁরা প্রত্যাগত হলে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র থেকে গঙ্গাদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা প্রায় প্রয়োপ-বেশনেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললেন। এঁদের মধ্যে সঞ্জয় অতটা ক্লেশসাধ্য তপশ্চারণ করতেননা। তিনি সূতজাতীয় ছিলেন বলেই বোধ হয় এবম্বিধ অনুষ্ঠানে তাঁর অধিকার ছিলনা। একদিন তাঁরা গঙ্গাস্নান সেরে আশ্রমের অভিমুখে গমন করছেন এমন সময় একটা দাবানল প্রচণ্ড আকার ধারণ করে সমস্ত বন দগ্ধ করতে করতে তাঁদের দিকে এগিয়ে এল। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে সেখান থেকে দ্রুতগতিতে নিরাপদ স্থানে যাবার সামর্থ তাঁদের ছিলনা। বাঁচবার আর কোনও আশা নেই দেখে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন,—"সূতনন্দন, তুমি এখান থেকে প্রস্থান করে আত্ম-রক্ষা কর। আমরা এই আগুনেই আত্মাহুতি দেব।" সঞ্জয় বললেন—"এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করলে আপনাদের সদগতিলাভের সম্ভাবনা নেই। অথচ এই আগুন থেকে আপনাদের সরিয়ে নিয়ে যাবারও কোনও উপায় দেখছিনা,—আমি অসহায় এবং বিমূঢ় বোধ করছি।"

ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন—"তুমি আগে এই স্থান পরিত্যাগ করে আত্মরক্ষা কর। আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করে এসেছি। এখন এই দাবানলে প্রাণ দিলে আমাদের অসদ্গতি হবেনা। বিশেষতঃ জল, বায়ু বা অগ্নিতে অথবা প্রায়োপবেশনে আত্মোৎসর্গ করাই তপস্বীদের কর্তব্য। আমাদের তাই হোক।" অগত্যা, সঞ্জয় তখন তাঁদের সেইভাবে রেখেই সেখান থেকে অতি কষ্টে দ্রুত প্রস্থান করে আত্মরক্ষা করলেন। তাঁরা দাবানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। অতঃপর সঞ্জয় গঙ্গাকূলে অন্যান্য ঋষিদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটি জানিয়ে সেখানে আর অপেক্ষা না করে, হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করলেন। যথাকালে এই সংবাদ হস্তিনায় এল। পাণ্ডবগণ এবং পুরবাসিগণ যথেষ্ট শোকতাপ জ্ঞাপন করে ভাগীরথীর তীরে গিয়ে মৃত জ্যেষ্ঠদের তর্পণাদি সম্পন্ন করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত জীবিত একমাত্র পুত্র যুযুৎসু তাঁদের অগ্রগামী হয়েছিলেন। তারপরে যুধিষ্ঠির হস্তিনা থেকে কিছু লোককে গঙ্গাদ্বারে পাঠালেন মৃতব্যক্তিদের অবশিষ্ট পারলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন করবার জন্য। তিনি নিজে একাদশ দিন নগরের বাইরে অবস্থান করলেন। দ্বাদশ দিনে তাঁদের সকলের শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হল। যাঁরা গঙ্গাদ্বারে গিয়েছিলেন তাঁরা তিনজনের অস্থিসমুদয় সংগ্রহ করলেন। অতঃপর সেই পূতাস্থিসমূহ গন্ধমাল্যে অর্চনা করে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে তাঁরা হস্তিনায় ফিরে এসে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী তিন বৎসরকাল অরণ্যে যাপন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়ের কি ঘটল তা জানা যায়না।

দশ

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর কৃষ্ণ আর হস্তিনায় আসেননি, তিনি দ্বারকাতেই ছিলেন। কিন্তু তিনি আদৌ শান্তিতে ছিলেননা। যদুবংশ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকগণ কুরুক্ষেত্র থেকে অধিকংশই অক্ষুণ্ণভাবে ফিরতে পেরেছিলেন। তাঁরা প্রচুর সমৃদ্ধিশালী হয়ে দিনরাত আমোদ আহ্লাদে কাটাতে লাগলেন। মদ্যপান ও ব্যভিচারের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেল। এই সবই নিতান্ত দুর্লক্ষণ বিবেচনা করে কৃষ্ণ অনেক কিছু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই দ্বারকার উচ্ছৃঙ্খলতাকে রোধ করতে পারলেননা। একদিন দ্বারকাবাসিরা প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হয়ে প্রচুর মদ্যমাংস আহার করে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করতে আরম্ভ করলেন। বিরোধের সূত্রপাত করলেন সাত্যকি এবং কৃতবর্মা। সেটা শুরু হল কৃতবর্মাদের সুপ্ত অবস্থায় পাঞ্চালহত্যার বিষয় নিয়ে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে যাদব গোষ্ঠীর নেতারা প্রচুর তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন। যদিও তাঁদের অধিকাংশ পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছিলেন, তথাপি কৃতবর্মা এবং প্রচুর যাদবসেনা কৌরবের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা যখন ফিরে এলেন তখন নিজেদের মধ্যেও একটি চাপা মতবিরোধ চলতে লাগল। এরই মারাত্মক পরিণাম দেখা গেল এই প্রভাস ভ্রমণের অনিয়ন্ত্রিত পটভূমিতে। সুরার প্ররোচনায় বিরোধটা অকস্মাৎ উম্মোচিত হয়ে গেল। সাত্যকি কৃতবর্মাকে তাঁর নীচতার কথা তুলে অপমান করতে লাগলেন এবং কৃতবর্মাও তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর প্রদান করে চললেন, কেননা যুদ্ধে সাত্যকিও নীচতা কম প্রদর্শন করেননি। সাত্যকি স্বভাবতই উগ্রচিত্ত ছিলেন; সুরামত্ত অবস্থায় তাঁর হিতাহিত জ্ঞান রইলনা। তিনি কৃষ্ণের সামনেই কৃতবর্মাকে হত্যা করলেন। এর পর পানাসক্ত আত্মীয়দের মধ্যে এমন এক সশস্ত্র বিরোধ উপস্থিত হল যে তার ফলে কৃষ্ণ এবং বলদেব ছাড়া আর দু একজন মাত্র বেঁচে রইলেন। এই

ভাবে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করেই যদুবংশের ধ্বংস সাধিত হল। বলদেব এই ঘটনার পরে বোধ করি আত্মহত্যাই করেছিলেন। তিনি বহু আগেই এই দুর্দৈব আশঙ্কা করেছিলেন এবং বার বার কৃষ্ণকে পাণ্ডব-কৌরবের বিরোধ থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ তাতে কর্ণপাত করেননি। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার পর কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ দ্বারকায় আসতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি আসবার আগেই কৃষ্ণ এক ব্যাধের হাতে নিহত হন। কৃষ্ণ নিষাদরাজ একলব্যকে হত্যা করেছিলেন। সম্ভবত ক্ষুব্ধ নিষাদগোষ্ঠীর প্ররোচনায় উক্ত সম্প্রদায়ের কেউ সুযোগ বুঝে কৃষ্ণকে হত্যা করেন। কৃষ্ণ বীর শূন্য দ্বারকার উপর দস্যুদের অভিযান আশঙ্কা করেছিলেন এবং নিষাদগণ যদুবংশ ধ্বংস হবার অব্যবহিত পরেই এই সুযোগ খুঁজছিলেন। তবে তাঁরা জোট বাঁধবার আগেই অর্জুন দ্বারকায় এসে পৌঁছোলেন। তিনি দ্বারকায় এসে দেখলেন যে সে দেশ রক্ষা করবার মত যথেষ্ট পুরুষ-শক্তি আর নেই। অতএব কুলকামিনী, বৃদ্ধ এবং বালক,—সকলকে একত্র করে তাদের হস্তিনার কাছাকাছি কোথাও বসবাসের ব্যবস্থা করবার জন্য,—একটা পরিকল্পনা তাঁকে করতে হল। কিন্তু দূরত্ব অনেকখানি এবং এতবড় একটা বিরাট অভিযানও কম বিপদসঙ্কুল ছিলনা। দ্বারকার অধিবাসিরা নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল; বিশেষ করে তাদের স্ত্রীলোকেরা—প্রায় শাসনের বাইরে চলে গিয়েছিল। পথে তারা যদৃচ্ছ আচরণ করে চলল এবং অনেকেই দলত্যাগ করে অন্যদের সঙ্গে চলে গেল। অর্জুন বাধা দিতে পারলেননা, তিনি নিজেও তখন বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীরের সেই বল আর কমই অবশিষ্ট ছিল। সমগ্র দলকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত লোকবল তখন হস্তিনা এবং দ্বারকা, কোনও স্থানেরই ছিলনা। তথাপি দীর্ঘপথের অনেকটাই তিনি অতিক্রম করেছিলেন; কিন্তু পঞ্চনদ, অর্থাৎ হস্তিনার প্রদেশভাগে প্রবেশ করবার পর তিনি এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের সম্মুখীন হলেন। তারা

তাঁকে প্রায় অনায়াসেই পরাজিত করে বহু দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করে নিল এবং যাবার সময় বহু রমণীকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। এর জন্য বলপ্রয়োগ করতে হয়নি, অধিকাংশ স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গ কামনা করেছিল। যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের নিয়ে অর্জুন কোনক্রমে কুরুক্ষেত্রে এসে পৌঁছোলেন। অতঃপর এইসব যাদবগোষ্ঠী ও তাদের আত্মীয়দের মর্তিকাবত, ইন্দ্রপ্রস্থ এবং সরস্বতী,—এই তিনটি জনপদে বসতি প্রদান করা হল। ইন্দ্রপ্রস্থেই বেশী লোক ছিলেন; সেখানকার রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের ওপর সমর্পণ করা হল। রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীদের অনেকে অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করলেন এবং সত্যভামা প্রভৃতি অপর পত্নীরা তপস্যা করবার জন্য হিমালয় অতিক্রম করে কলাপগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এইভাবে একটি বিরাট কর্তব্য অতিকষ্টে সম্পাদন করে অর্জুন হস্তিনায় ফিরে এলেন। এই সময় তাঁর শরীরে আর কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট ছিলনা। তা ছাড়া, তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধু কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি একান্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্তভাবে সব বৃত্তান্ত অর্জুনের কাছ থেকে শুনলেন।। তাঁরা সকলেই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, শরীরের সেই শক্তি বার্ধক্যে বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দস্যুগণের কাছে অর্জুনের পরাজয় নিশ্চয়ই প্রজাদের মধ্যে একটা সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুধিষ্ঠির উপলব্ধি করতে পারলেন যে, অবস্থা যেরকম দাঁড়াচ্ছে তাতে অচিরে শত্রুর আক্রমণ হলে হস্তিনা রক্ষা করাও অসম্ভব হযে পড়বে; রাজ্যভার এইবার তাঁদের ছেড়ে দেওয়াই ভাল। হিতৈষীদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত সেইরকম উপদেশও দিয়েছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে দ্রৌপদীসহ তাঁরা পাঁচ ভাই বনবাসে গিয়ে আত্মোৎসর্গ করবেন।

যুধিষ্ঠির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রথমে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর ওপর রাজ্যপালনের ভার দিয়ে তিনি সুভদ্রাকে বললেন—“ভদ্রে, তোমার

পুত্র অভিমন্যুর সন্তান পরীক্ষিৎই কৌরবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। আমি আগেই কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করেছি। আমরা চলে গেলে এঁরা দুজনেই কৌরব এবং যাদবগণকে প্রতিপালন করবেন। তুমি এই দুটি বালকের প্রতিই সমান দৃষ্টি রেখে এদের সাবধানে রক্ষা করবে।" সুভদ্রা অবশ্য এই কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিলেন, কারণ উত্তরকালে পরীক্ষিৎ একজন প্রতাপশালী সম্রাট হিসাবে পুরাণে স্থান পেয়েছেন।

এর পর যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে বাসুদেব, বলদেব প্রভৃতি এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দের প্রতি জলাঞ্জলি প্রদান ও তাঁদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদন করলেন। পরীক্ষিতের ধনুর্বেদ শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করে গেলেন।

সবশেষে প্রজামণ্ডলকে আহ্বান করে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বনের কথা ঘোষণা করলেন। প্রজারা ভদ্রতার সঙ্গে মৌখিকভাবে তাঁদের রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন বটে, কিন্তু তাতে খুব একটা আন্তরিকতা ছিলনা। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে বৃদ্ধ পাণ্ডবগণ রাজ্যশাসনে আর তেমন সমর্থ নন এবং সাম্প্রতিক দস্যুদলের অভিযান সেটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছিল বলা চলে। তাঁরাও অনুশাসনে একটি পরিবর্তন চাইছিলেন। অতএব যুধিষ্ঠিরের বনগমনের সিদ্ধান্তকে তাঁরা অনুমোদন করলেন, যদিচ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে তাঁরা ক্ষান্ত হননি।

সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে পাণ্ডবগণ তাঁদের দিব্য আভরণ পরিত্যাগ করে বল্কল পরিগ্রহ করলেন। দ্রৌপদীও একই বেশ ধারণ করলেন। তারপর সংসার ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে তাঁরা সংক্ষেপে যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন এবং যজ্ঞসলিলে অগ্নি নির্বাপন করে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পুরাণকার বলছেন যে সেই সময় পুরবাসী ও নগরবাসী বহু ব্যক্তি বহু দূর পর্যন্ত তাঁদের অনুগমন করলেন বটে, কিন্তু,—"মহারাজ প্রতিনিবৃত্ত হোন"—এই কথাটা কারুর মুখ দিয়েই বেরুলোনা।

তাঁরা হস্তিনার পুরদ্বার ছাড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁরা

নাকি অনেক ঘুরে এমনকি দ্বারকা পরিক্রমা করে হিমালয়ে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু, এই বিবরণ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়না কারণ তাঁদের সেই ক্ষমতা আর ছিলনা এবং প্রয়োজনীয়তাও ছিল বলে মনে হয়না। অর্জুন নাকি অনেক দূর পর্যন্ত ধনু এবং তূণীর বহন করে আসছিলেন, কিন্তু এক সময় তাঁকে এগুলিও পরিত্যাগ করতে হল। ক্রমে হিমগিরিতে উপস্থিত হয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে পর্বতারোহন করতে লাগলেন। কিন্তু, এই পর্বতারোহণ এবং পূর্ববর্তী পর্বত পরিক্রমার মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল। তখন তাঁদের দেহে ক্ষমতা ছিল; কিন্তু আজ আর সেসব কিছুই ছিলনা; কেবলমাত্র পবিত্র হিমাচলে দেহ রক্ষার জন্যই তাঁরা বার্ধক্যজীর্ণ শরীর নিয়ে দুর্বল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলেন। এবারে তাঁরা কোন পথে হিমগিরি অতিক্রম করছিলেন জানা যায়না; সম্ভবত সেটা পূর্ব পরিচিত পথ নয়, কেননা গঙ্গাদ্বার, বদারিকাশ্রম প্রভৃতি কেনেও নামই এই প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয়না; কেবল বলা হয়েছে,—তাঁরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন যেখান থেকে সুমেরুপর্বত দৃষ্টিগোচর হয়। এর পরে শীতল দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তাঁদের মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিল তা জানা আদৌ সম্ভব নয়। এঁরা কোনও তুষারঝঞ্ঝা বা শিলাপতনে একসঙ্গে বিনষ্ট হয়েছিলেন অথবা অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেকথা জানবার কোনও উপায় নেই। এই মহাপ্রস্থানে তাঁরা কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাননি, কেউ উপযাচক হয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এমন উল্লেখও পাওয়া যায়না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ পাণ্ডবগণ একাকী দুর্গম হিমগিরির এক স্বল্প পরিচিত পথে আরোহন করে চলেছিলেন। হয়ত তাঁদের ইচ্ছা ছিল কোথাও আশ্রম স্থাপন করে প্রয়োপবেশন বা অন্য কোন ভাবে মৃত্যুবরণ করবেন. কিন্তু তার অবকাশ তাঁরা পাননি। একে একে তাঁদের পতনের বিবৃতি থেকে স্পষ্টই অনুমান হয় যে কোনও দুর্ঘটনায় হিমালয়ের যথেষ্ট উপরে তুষারাবৃত অঞ্চলে তাঁদের মৃত্যু ঘটে। তবে, একসঙ্গে সকলের মৃত্যু না হয়ে আগে পরে সেটা ঘটে থাকতে পারে।

এগারো

এইভাবে পাণ্ডবদের জীবনে পরিসমাপ্তির রেখাপাত হয়েছে। অনেক যত্নের পর তাঁরা রাজ্যলাভে সমর্থ হয়েছিলেন বটে কিন্তু শান্তি বা আনন্দ কোনটাই পাননি। একটা বিরাট শূন্যতা তাঁদের ঘিরে রেখেছিল। পরিশেষে তাঁরা রাজ্যানুশাসনেও ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। যুদ্ধের পূর্বে একটা সমস্যার কথা তাঁরা গণনার মধ্যে আনেননি, সেটা হচ্ছে—এই যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ কিভাবে তাঁদের প্রজাদের সম্মুখীন হতে হবে। কৌরবনিধনে তাঁদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত ছিল যে এমন নিষ্ঠুরতা যেন সম্পাদিত না হয়, যাতে কৌরবপুষ্ট প্রজাদের মনে ক্ষোভ বা বিরুদ্ধভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু, সেটা তাঁরা মনে রাখেননি। তারা যথেচ্ছভাবে কৌরবকুলকে নির্মূল করেছিলেন যা প্রজাদের তাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার বদলে একটা ভীতির সঞ্চার করেছিল। তাঁরা যুদ্ধটাই জানতেন এবং বলপূর্বক অধিকারকেই তাঁরা ক্ষত্রিয়জনোচিত কর্তব্য বলে মনে করতেন; কিন্তু শাসন সম্পর্কে যে রাজনীতির অনুসরণ করতে হয় সে সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা বা ধারণা কোনটাই ছিলনা। দুর্যোধনের চরিত্রে রাজ্যশাসনের যে গুণগুলি ছিল যুধিষ্ঠিরের ভিতর সেগুলি ছিলনা। দুর্যোধনের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং স্বীয় ক্ষমতার প্রতি আস্থা ছিল। তিনি কর্ণ বা শকুনির মত মেনে চলতেন বটে, কিন্তু সেটা কেবল পাণ্ডবদের সম্পর্কে। অপরাপর বিষয়ে তিনি পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কূট চক্রান্তে বা পরামর্শে তিনি প্রভাবিত হতেননা, অথচ তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ ছিলনা। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তৎকালীন প্রতাপসম্পন্ন ব্রাহ্মণ্য নেতারাও বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে যেতেন এবং তাঁকে উপদেশ দিতে সাহসী হতেননা। সেরকম কোনও বাদানুবাদ উপস্থিত হলে দুর্যোধন বলিষ্ঠভাবে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করতেন এবং তাতে সিদ্ধ

না হলে সরাসরি তাঁদের উপেক্ষা করতেন। দুর্যোধনকে বেশ কঠিন এবং কঠোর ব্যক্তি মনে করেই অনেক নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ তাঁকে পরিহার করে চলতেন। কৃষ্ণ যখন দূত হয়ে তাঁর সভায় আসেন তখন তাঁকে কিছুমাত্র প্রভাবন্বিত করতে পারেননি; অথচ দুর্যোধন তাঁর প্রতি যথোচিত ভদ্রতা ও সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর বাল্যকালে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রায় প্রকাশ্যেই তাঁর বিপক্ষতা করেছিলেন; বিদুর শেষ পর্যন্ত উভয়কুলের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে গেছেন;—তিনি সবই সহ্য করেছেন; কিন্তু কেউ তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেন নি। সঞ্জয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুবর্তী ছিলেন; তিনি কদাচ বিশ্বাসঘাকতা করেননি। যদিও তিনি সন্ধির পক্ষে ছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বলতার জন্য তাঁকে কঠোর ভৎর্সনায় জর্জরিত করে-ছিলেন তথাপি কৌরবপক্ষে যখনই তাঁকে যে কাজে পাঠানো হয়েছে তখনই তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তিনি ন্যায়ানুবর্তী ছিলেন এবং স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে কোনও চক্রান্তেই লিপ্ত হননি। শেষ পর্যন্ত তিনি দুর্যোধনের পাশে থেকে, তাঁর আহত দেহ রক্ষা করে, তবে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের অনুবর্তী হয়ে পাণ্ডবরাজত্বে সুখে থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। ধৃতরাষ্ট্রের দুঃসময়ে তিনি তাঁর সঙ্গে বরাবর সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের মৃত্যুর পর যাতে যথোচিত সৎকার ঘটে সেজন্য তিনি গঙ্গাদ্বারে ব্রাহ্মণদের কাছে সংবাদ দিয়েই হিমাচলে প্রস্থান করেছিলেন। পক্ষান্তরে, যুধিষ্ঠির কেবল একজনের ওপরেই নির্ভর করেছিলেন, তিনি বাসুদেব কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে কখনও গঠনমূলক কাজে উৎসাহ বা উপদেশ প্রদান করেননি। তিনি চক্রী ছিলেন; চক্রান্তের অবকাশ যখন রইলনা তখন পাণ্ডব সভা থেকেও তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। যুধিষ্ঠির চার ভ্রাতার কাছেও অনুশাসন বিষয়ে কোনও সহায়তা পাননি। তাঁদের মধ্যে দুজন নেহাৎই যোদ্ধা ছিলেন এবং অপর দুজনের বিশেষ কোনও যোগ্যতা ছিল বলে মনে হয়না। দ্রৌপদী আত্ম-সচেতন জেদী প্রকৃতির মহিলা ছিলেন, সত্যবতীর মত নিঃস্বার্থ মনো-

ভাব এবং সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা তাঁর আদৌ ছিলনা। যে রমণীকে পাঁচজন স্বামীর মনোরঞ্জন করতে হয় তার পক্ষে কোনোদিকে মনোযোগ দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে এবং এই বিবাহ তাঁকে আদৌ সুখী করেছিল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তিনি অর্জুন ভিন্ন আর কারুর সঙ্গে সহবাস কমই করেছেন। ভীমকে তিনি নিজের স্বার্থেই কাজে লাগাতেন এবং বহুবার রাজত্ব হারানোর ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেও তাঁর বাদ প্রতিবাদ হয়েছে; সেটা কিন্তু পরোক্ষভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর অপ্রসন্ন মনোভাবেরই প্রকাশ, কারণ এঁরই জন্য তাঁকে পাঁচটি ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছিল। একমাত্র কৃষ্ণের প্রতিই তাঁর আনুকূল্য ছিল এবং তাঁর ওপর তিনি অর্জুন অপেক্ষাও বেশী নির্ভর করতেন। রাজমাতা কুন্তী শেষপর্যন্ত সন্তানদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। যুধিষ্ঠির রাজা হবার পর তিনি মঙ্গলজনক কিছুই দেখতে পেলেননা। কর্ণের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির এবং অপর চার ভ্রাতা নির্বিকার রয়ে গেলেন অথচ কুন্তী একটি বিরাট পপেবোধের সঙ্গে শোকভার বহন করে চললেন, যা তিনি কিছুতেই লাঘব করতে পারছিলেননা। শেষ জীবনে সমাহিতচিত্তা গান্ধারীকে তাঁর নিজের চেয়ে অনেক বড় বলে মনে হত এবং সহনশীলতার প্রতিমূর্তি শান্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অন্তরে অস্থিরচিত্ত সন্তানদের অপেক্ষা অনেক মহত্তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই, যুধিষ্ঠির রাজা হবার পরও তিনি পাণ্ডব অন্তঃপুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেননি, গান্ধারীরই অনুবর্তী হয়েছিলেন। পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সঙ্গেও বোধ করি কুন্তীর একটা প্রগাঢ় স্নেহের সম্পর্ক ছিলনা এবং উভয়কে খুব কমই একত্রে অবস্থান করতে দেখা গেছে। কুন্তী এবং গান্ধারী, দুজনেই রাজমাতা হওয়া সত্ত্বেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং ঘটনাচক্রে কেউ কারুর সমীপবর্তিনী হতে পারেননি। বহুকাল পরে দুজনে দুজনের দুঃখ অনুভব করে নিঃস্বার্থভাবে মিলিত হলেন। গান্ধারী যুদ্ধ চাননি, কিন্তু কুন্তী চেয়েছিলেন; অথচ, যুদ্ধের পরে উপলব্ধি করলেন কতখানি ভুল তিনি করেছিলেন। এর চেয়ে তিনি যদি সন্ধির ভূমিকায়

অগ্রবর্তিনী হতেন, তাহলে বোধ হয় হিতকর কিছু করতে পারতেন। তিনি যদি সেই সময় কর্ণের জন্মরহস্য ব্যক্ত করতেন তাহলেও ঘটনা-স্রোত অন্যদিকে প্রবহিত হতে পারত। কিন্তু, তিনি সম্পূর্ণভাবে বিদুরের উপদেশ অনুযায়ী চলেছিলেন এবং কর্ণের সঙ্গে তাঁর সহ-যোগিতা বিদুরের অভিপ্রেত ছিলনা। তাঁর ভীতিপ্রবণ চিত্ত নিরন্তর গোপনতার প্রয়াসী হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বিষাদময় পরিণতিতে তাঁকে এমন অবস্থায় এনে স্থাপন করল যেখানে মর্মপীড়ার অবধি ছিলনা এবং মৃত্যু ছাড়া আর তাঁর কিছু কাম্য বলে মনে হয়নি। অবশেষে, ব্যক্তিত্বহীন, বৃথাদর্পী পুত্রদের ছেড়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন এবং এইটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভের পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করে আরও সৈন্য এবং অর্থক্ষয় করলেন। এটা তাঁর কোনক্রমেই কর্তব্য ছিলনা ; এতে প্রজা এবং অবশিষ্ট আত্মীয়গণ আরও বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি অনবরত ব্রাহ্মণদের আদেশক্রমে পরিচালিত হতেন এবং এইসব ব্রাহ্মণ তাঁকে দিকে স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করেননি। যুদ্ধে যদি শক্তিশালী রাজাদের পতন না ঘটত তাহলে তিনি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর রাজ্যকে পরাজয় থেকে বাঁচাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ধৃতরাষ্ট্র যে মর্যাদার সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন তিনি সেই মর্যাদা নিয়ে বানপ্রস্থের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেননি। ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা ছিল তাঁর সন্তানেরা ন্যায়যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন ; এমনকি যে ভীম ব্যভিচারদ্বারা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উরুভঙ্গ করেছিলেন তাঁকেও তিনি ক্ষমা করেছিলেন। কৌরবদের ধ্বংস হয়ে যাবার পরেও তিনি শান্তির উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুবর্তী হয়েছিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত একটা স্থিতাবস্থা না আসে ততদিন পর্যন্ত তিনি পাণ্ডবশাসিত রাজ্যে শান্তভাবে অবস্থান করেছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে প্রজাদের তাঁর ওপর কোনও অভিযোগ না থাকলেও স্বীয় পরিবারে আত্মসম্মান রেখে তিনি বাস করতে পারছেননা, তখনই তিনি সগৌরবে মাথা উঁচু করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন।

পক্ষান্তরে, যুধিষ্ঠির ক্রমাগতই শক্তি ক্ষয় করে আনছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় রাজকোষ ক্রমেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের পূর্ববীর্য আর না থাকায় রাজকোষের পূর্ণতা সম্পাদন হচ্ছিলনা। রাজমাতা কুন্তী যখন তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন তখন প্রজাদের কাছে তাঁর গৌরব বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সামান্য দস্যুদলের হাতে অর্জুনের পরাজয় ঘটাতে প্রজাদের কাছে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। স্পষ্টই তিনি বুঝতে পারলেন, আর বেশীদিন রাজত্ব চালালে তিনি প্রজাদের আস্থা থেকে বিচ্যুত হবেন। অতএব, সময় থাকতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাটাই তাঁর পক্ষে যুক্তি-যুক্ত বলে মনে হয়েছিল। তাঁকে প্রায় পরাজিতের মতই রাজ্যত্যাগ করে যেতে হয়েছিল। পরিশেষে ব্যাসদেবের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। এঁকে অনন্তকাল ধরে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেটা কোনক্রমেই সত্য হতে পারেনা। তিনিও ভীষ্মের মত কোনও এক সময় মৃত্যু বরণ করেছিলেন; কিন্তু পুরাণকারেরা তাঁর প্রাধান্যকে স্বীয় সুবিধার্থেই যতকাল ইচ্ছা ততকাল ধরে বিস্তার করে গেছেন। মহাভরত রচনার মূলে ব্যাসদেবের আত্মচরিত হিসাবে কিছুটা বিবৃতি হয়ত থাকতে পারে; কিন্তু সেটা পাণ্ডগণের পিতৃ-বিয়োগের পর হস্তিনায় আগমনের অল্পকাল পরেই শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। পরবর্তী ইতিবৃত্ত কারা ধরে রেখে গেছেন তা নির্ণয় করবার আর কোনও উপায় নেই।

বারো

মহাভারতকে ইতিহাস অথবা সাহিত্যের দৃষ্টি থেকে এদেশে এবং বিদেশে বিচার যে না করা হয়েছে এমন নয়; কিন্তু সেই আলোচনা কতখানি নিরপেক্ষভাবে করা হয়েছে সেটাই বিচার্য। মহাভারত আশ্চর্য ইতিবৃত্ত এবং এই মহাগ্রন্থ যে একটি সত্য ঘটনার ওপর

প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একে নানাভাবে আখ্যায়িকার রূপ প্রদান করা হয়েছে। আমরা মহাভারতের যে কাহিনী পেয়ে এসেছি আদিতে সেটি সেইরকম ছিল কিনা সন্দেহ; কারণ বৃহৎ পরিবর্তনটা এসেছে কৃষ্ণের ভূমিকা নিয়ে। কৃষ্ণের অনুবর্তী অথবা তথাকথিত বৈষ্ণব পুরাণকারগণ এই গ্রন্থের বিরাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা ও মহিমা প্রচারের জন্য বহু আখ্যায়িকার অবতাবণা করা হয়েছে এবং ঘটনার পুনর্বিন্যাস, প্রক্ষেপ বা সংস্কারসাধনও কম করা হয়নি। ফলে, বর্তমান মহাভারত তার প্রাক্তন ইতিবৃত্তের এমন একটি সংশোধিত রূপ, যার সঙ্গে সুদূর অতীতের মূল কাহিনীর কতটা সম্বন্ধ রয়েছে, সেটার পরিমাপ কারও শক্ত। মহাভারতের অলৌকিক বৃত্তান্ত বা সন্দেহজনক আখ্যায়িকাগুলি বর্জন করে একটি প্রতীতি-যোগ্য প্রতিকৃতি প্রণয়ন করলে একটি বিচিত্র সমাজের চিত্র এবং রাষ্ট্রের রূপ প্রতিভাত হবে।

এই মহাগ্রন্থে যে মহানায়কের চরিত্র অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে, তিনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র। এই বিরাট ব্যক্তিটি কিন্তু একান্তভাবেই ঘটনার ক্রীড়নক। ধৃতরাষ্ট্র আসলে ছিলেন সৎ; কিন্তু সন্তানের স্বার্থ তাঁকে বারবার দুর্বল করে ফেলেছে এবং তিনি যে বিপুল পরিমাণে বঞ্চিত সেটাও তাঁর চিত্তকে নিরন্তর দগ্ধ করেছে। এই যে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মাঝখানে তাঁর চিত্ত দোলায়িত হয়েছে,—এর এমন একটা প্রত্যক্ষরূপ কোনও আধুনিক উপন্যাসেও পওয়া শক্ত। মহাভারতের ঘটাবিন্যাস এত পরিণতভাবে করা হয়েছে যে প্রত্যেকটি চরিত্র স্বীয় বিশেষত্ব নিয়ে ফুটে উঠেছে। মহাভারত যে চরিত্রের গূঢ় সঞ্চরণকে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরেননি, তাকেও ঘটনাবিপর্যয়ে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যে তার মানসিকতাকে অনুধাবন করতে খুব বেশী চিন্তা করতে হয়না। সত্যবতী, সঞ্জয়,—এঁরা পার্শ্বচরিত্র; কিন্তু এঁরা আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছেন কেবলমাত্র চিত্রণবৈশিষ্ট্যে, মহাভারতের বিরাটপর্বে যদিবা নৈপুণ্যের অভাব

পরিলক্ষিত হয়, সেটিকে পূরণ করেছে উদ্যোগপর্ব। রাজনীতির গতি কতখানি ক্রুর হতে পারে, এই অধ্যায়টি তারই পরিচায়ক। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে এমন একটি সূক্ষ্ম কূটনীতির চিত্তাকর্ষক আদান-প্রদান চোখে পড়েনা। আদিপর্ব এবং বনপর্ব এই দুটি অধ্যায়ের মধ্যে অনেক-খানি সাদৃশ্য আছে। দুটিতেই বনবাসের চিত্র এবং বিচিত্র ঘটনার সন্নিবেশ দেখা যায়; কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। বনপর্বে ভারতের নাগরিক, গ্রামীণ এবং আদিবাসী জনপদ,—এই তিনটিরই রূপ অপূর্ব মনোহারিত্বের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। সমগ্র হিমাচল সভ্যতার একটা উজ্জ্বল বিবরণ আমরা এই অধ্যায় থেকে পাই। এই অধ্যায় থেকে বোঝা যায়, এক সময় ভারতের ভৌগলিক সংযোগ কতখানি সুবিস্তৃত ছিল; পার্বত্য প্রদেশ থেকে বনাঞ্চল পর্যন্ত সমগ্রভূভাগে রথচলাচলের জন্য প্রশস্ত পথ এবং বিশ্রামস্থলের কোনও অভাব ছিলনা। মহাভারত পাঠে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই বোঝা যায় একটা বিরাট বিমিশ্র সভ্যতাকে কতখানি বিচিত্র দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং তার বিভিন্ন রূপকে পাঠকের সম্মুখে কত সম্পূর্ণভাবে উদঘাটিত করা হয়েছে। পরবর্তী যুগের যে কোনও নাটক বা মহাকাব্য এর কাছে সমুদ্রের পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্পদের মতই প্রতীয়মান হয়।

চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় বা মনোবিশ্লেষণেও মহাভারত যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বনপর্বে সমগ্র হিমাচলের চিত্র, তার প্রাকৃতিক ভয়ঙ্করতা, অপরদিকে তার অনুপম সৌন্দর্য আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। কুবেরের রাজপুরী অলকার মনোহারিত্ব কালিদাস বহুলাংশে মহাভারত থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের অন্তিম-পর্যায়ে যখন দুর্যোধন গদামাত্র সম্বল করে দ্বৈপয়ান হ্রদের তীরে সম্পূর্ণ একা অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর মর্মপীড়া, অসহায়ত্ব এবং শূন্যতাকে অবর্ণনীয় ভাষায় রূপায়িত করা হয়েছে। দুর্যোধনের তিলে তিলে মৃত্যুর এমন একটি করুণ চিত্র যে কোনও সুপ্রাচীন সাহিত্যেই দুর্লভ।

এই মহাগ্রন্থের পরিসমাপ্তি অতুলনীয়। একটি বিরাট সংগঠনের

ধ্বংসটা খুব অল্পকালের মধ্যে হলেও পুরাণকার ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি এই ধ্বংসকাহিনীর বিবরণ দিয়ে গেছেন ধীর-গতিতে ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। এত সুন্দর, স্বাভাবিক এবং সময়োচিত পরিসমাপ্তি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। প্রকৃতপক্ষে, মহাভারতের শেষভাগই সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। এই পর্যায়ে পাঠকের আগ্রহ সর্বদাই জাগ্রত থাকে এবং এক এক সময় পরবর্তী ঘটনা তাকে দুর্বারভাবে অন্তিমাংশটুকু জানবার জন্য আকর্ষণ করতে থাকে। ঘটনাসংঘাতের যখন অবসান ঘটল তখনও পরিসমাপ্তি আমাদের ধীর, স্থির এবং শান্ত গতিতে পৌঁছে দেয় একেবারে অন্তিম রঙ্গমঞ্চে, যেখানে হিমাচলের উত্তুঙ্গ প্রদেশে তুষারের আবরণে অবশিষ্ট পাঁচটি ক্লান্ত, নিস্পৃহ, অপরিতৃপ্ত জীবনের অতি নিভৃত, অজানিত অবসান ঘটে। এইখানে যে পরিসমাপ্তি ঘটল তা সত্যই সমগ্র ভারতের একটি মহাযুগের পরিসমাপ্তি। তাই, "মহাভারত" নামটি যথার্থ সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

———